প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৬৬

প্রকাশক ঃ
অরূপ সাহা
মডার্ন কলাম
৭ই শীতলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৫

মুদ্রাকর ঃ
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী,
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ কুমারঅজিত

প্রথম খণ্ডের আকর্ষণ ঃ

"প্রেম—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ"

রবার্ট লিণ্ড

"এটা সবিশেষ লক্ষণীয়," মিঃ জি, কে, চেষ্টারটন লিখেছেন, "মানবজাতির ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত নেহাৎ বিরল, যেখানে আমরা দুই মহান নায়ক-নায়িকাকে প্রচণ্ড প্রেমের পর সুখদীপ্ত বিবাহিত জীবনে আবদ্ধ হতে দেখি।"

উক্তিটি তথ্যভিত্তিক। ইতিহাস তথা উপন্যাস এবং কোন মর্মস্পর্শী গাথা কাহিনীতে দুর্দান্ত প্রেমের পরিণতি স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবনে শেষ হ'য়ে যায় না। প্রেম, যদিও কখনো, কখনো তৃণের মত নরম, তীক্ষ্মমুখ কাঁটার মত বেদনাদায়ক এবং ব্যথার নির্যাসেই প্রেমের বিশালতা অনুভূত। ডিডো এবং এনিয়েস, এ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা, পেলো ও ফ্রান্সিসকার, রোমিও এবং জুলিয়েট, দান্তে এবং বিয়াত্রিস—কোথায় সেই মধুরেন সমাপয়েৎ? মিলন সম্ভবও ছিল না; নিছক সুখের সমুদ্রে তাদের নীল করে দেওয়াটা হতো বন্ধ্যা মেধার পরিচায়ক।

এমনকি দেব-দেবীদের বেলাতেও, গ্রীক ও রোমক পৌরাণিক কাহিনীতে তাদের বিচরণ, একেবারে আহ্লাদময় পারিবারিক জীবনের ছিদ্র খুঁজে পাই না। বরং মৃত ফুল বুকে নিয়ে তাঁদের প্রেম, ক্রোধ ও হাহাশ্বাস। একমাত্র রূপকথাগুলিরই অন্তিমে প্রায়শ আমরা উচ্চারিত হতে দেখি সেই অনায়াসলভ্য আপ্ত সমাপ্তি: অতঃপর তাহারা সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করিতে লাগিল।

স্বয়ং জিউস হেরাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিবার পরও এই ঘনিষ্ঠ নারীকে যেন দ্রুত নিজস্ব শুদ্ধতা হারাতে দেখেছেন এবং তার ক্রোধও ক্রমশ: আগুনের মতন জ্বলে উঠেছে। কিন্তু জিউস পাশবিক উল্লাসে হেরাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় স্বর্গ থেকে নিক্ষেপ করেছেন নরকে। অথচ ঐ হেরার প্রতি তাঁর প্রেমে কি কম গভীরতা ছিল? তাঁর মনের কোণে বেজে ওঠা ধ্বনির নির্জন অর্থ তিলে তিলে জন্ম দিয়েছে সন্দেহ ও ক্রোধের।

এডোনিসের জন্য আফ্রোদিতির প্রেম দুঃখপূর্ণ, ডেফিনের জন্য এপেলোর অনুরাগ কেবল সংঘাতপূর্ণ নয়, পরিণতিও জবু থবু, মর্মান্তিক।

যুবরাজগণ এবং প্রতিভাবানদের জীবনেও প্রেম দেব-দেবীদের মতনই এমন করুণ, সংঘাতময় যে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ পৃথিবীতে এক সময় কী দারুণ পচনশীল হয়ে ওঠে !

অথবা, অপেক্ষাকৃত সত্য ভাষণে কবুল করতে হয়, পৃথিবীর মানুষ কোন সরল বা, হাবাগোবা বা, কোন মাতব্বরের অকুটিল প্রেম-পরিণতিকে গ্রহণ করতে নারাজ ; নিছক বাস্তুরে প্রেম তথা মিলনে সার্থকতার চেয়ে বিষাদপূর্ণ ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীই তার মনকে অনেক বেশি নাড়া দিয়ে যায়।

এ বড় আপাতবিরোধী সত্য যে, একজন নবীন সাধারণ প্রেমিক সব সময়ই প্রার্থনা করবে উৎপাদনশীল এই পৃথিবীতে তার প্রেমে যেন কোন বিপর্যয়ের ছোঁয়া না লাগে অর্থাৎ, প্রেম-পরিক্রমান্তে সে যেন নির্বিঘ্নে তার প্রেমিকাকে বধূরূপে লাভ করে তথা তাদের পারিবারিক জীবনেও যেন কোন দৃশ্য বা অদৃশ্য তক্ষকের আবির্ভাব না ঘটে। কিন্তু সাহিত্যের পৃষ্ঠায় ঐ প্রেমিকই খুঁজবে প্রেমের ভিন্নরূপ এবং সে দেখবে ভাগ্যের ছলনা, ভুল বোঝা-বুঝি, হতাশা, সন্দেহ, ঈর্ষা, বিচ্ছিন্নতা এবং মৃত্যু। তাই বাস্তব জীবনে মানুষ প্রেমের যে পরিণতি ও সার্থকতা কামনা করে সেখানে কোন নাটকীয়তা থাকে না এবং থাকে না বলেই তা সাহিত্যের উপাদান হিসেবেও মনোগ্রাহী হয় কদাচিৎ।

বলা হয়ে থাকে, মানুষ কখনো পরিপূর্ণ ত্রুটিহীনতাকে আকর্ষণীয় বলে মনে পড়ে না ; নিজস্ব জীবনে কোন হিম স্মৃতিকে লালন করতে না চাইলেও পৃথিবীটা কোনক্রমেই সরল ফুলের বাগান নয়। তা ছাড়া দুঃখ যতটা মহান, সুখ তার ধারে কাছেও নয়। একটি সহজ বিহাহ, গুটি কয়েক নিঁখুত চরিত্রের সরল রেখায় আনাগোনা, ঝুঁকিহীন পথে তর তরিয়ে এগিয়ে যাওয়া, পারস্পরিক মিষ্টি মিষ্টি আলাপন—ইয়ানীংকালের কোন সাহিত্য পাঠকই বা এসবের ওপর সাগ্রহে ঝুঁকে পড়বে ? উত্তেজনায় থর থর কেঁপে ওঠার মতন ঘটনায় নিবিষ্ট তন্ময়তায় হারিয়ে যেতে ভালোবাসি, যে উত্তেজনা এক জোড়া নিখুঁত চরিত্র প্রেমিক-প্রেমিকার সংঘাতহীন প্রেম পরিক্রমায় খুঁজে পাবো না।

যে কেউ জানেন, নিদ্রা-জাগরণে সুখস্বপ্নে বিভোর থাকা যতখানি

আনন্দদায়ক, সুখের চিত্র আঁকা সাহিত্য পাঠ করা ঠিক ততখানিই বিরক্তিকর।

এই সুখ-চিত্র বা, ইটোপিয়া যখন প্রেমের গল্পকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে, তখন সেই গল্পের জাতটাই মারা পড়ে।

রবার্ট ব্রাউনিং-এর কথাই ধরুন না। ভদ্রলোক তাঁর তারুণ্যদীপ্ত সময়ে সফল প্রেমিক ছিলেন, প্রেমে তাঁর কোন দুঃখ বা, ব্যর্থতা ছিল না অর্থাৎ, তাঁর প্রেম ক্রমে ক্রমে মুকুলিত হয়ে ওঠে পারিবারিক মিলনে, পারিবারিক জীবনেও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি ছিলেন যথার্থ সুখী।

অথচ, প্রেমকে পুঁজি ক'রে যখন তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাঁর লেখায় নিছক সুখ মোহান্ধতা আবিলতা সৃষ্টি করে না। তাঁর সৃষ্ট নায়ক-নায়িকারা প্রেমের কারণে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে গিয়েও মিলনের দ্বারে পৌঁছতে পারে না, গভীর বিষণ্ণতা এবং হাহাকার হয় তাদের অবশিষ্ট কালের পাথেয়। এই অনিবার্য স্মৃতি, বিষাদ ও দূরত্ব নিয়ে তাঁর রচনাগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট।

ব্রাউনিং-এর সমধিক খ্যাতি "The Ring and the Book" নির্মম হাতে রচিত, ভালোবাসার পরিণতি এখানে এমন দুঃপূর্ণ যে পাঠক/পাঠিকারা নিজেদের লবণাক্ত অনুভব করেন। কুটিল দৈবের অঙ্গুলিহেলনে ট্রাজেডি এখানে যেন "ওথেলো" এবং "রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট" কে মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাব্যটি পাঠের পর স্পর্শকাতরতা যে কোন পর্যায়ে ওঠে, তার বিরাট সবুদ রেখেছেন স্ব-কালের গুরু-গম্ভীর জ্ঞানী ব্যক্তি স্বয়ং মহামতি কার্লাইল। কাব্য নাট্যটি পাঠের পর তাঁর অনুভূতি এমন টান টান রূপ নেয় যে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে ব্রাউনিং এর বাড়িতে উপস্থিত হন কবিকে অভিনন্দন জানাতে।

"এ এক অদ্ভুত সাহিত্যকর্ম," কার্লাইল বললেন, "সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম; আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি। কিন্তু কবি তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন ওল্ড বেইলির গল্প থেকে, যাকে মাত্র দশ লাইনের মধ্যে বেঁধে রাখা যায়। অবিশ্যি দশ লাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখলে আমরাও চটপট ভুলে যেতাম এর প্রভাব।"

কার্লাইলের এই বক্তব্য কিন্তু আমাদের কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হয়। কাব্যনাট্যের ব্যাপক প্রভাব অনুভব করলেও "ওল্ড বেইলি" থেকে-নেওয়া

বিষয় বস্তু সম্পর্কে তিনি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ করেছেন। মনে হয়, কার্লাইল এর তাৎপর্য ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি।

ওল্ড বেইলির অনুপ্রবেশ না ঘটলে পম্পিলা নারী চরিত্রটি অতখানি অসাধারণত্ব লাভ করতো না। যদি পম্পিলা ও কাউন্ট গুইডো বিবাহিত জীবনে প্রবেশ ক'রে নিছক সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে থাকতেন, আমরা আর পাঁচটা নারী-চরিত্রের সঙ্গে পম্পিলার কোন প্রভেদই খুঁজে পেতাম না; এমন কি, শক্তিশালী কবি যে সব আশ্চর্য রূপকল্প ও প্রতীকের ব্যবহার করেছেন, সেগুলিকেও দ্রুত ভুলে যেতাম।

সাংবাদিকতা যেমন সাধারণ মানুষের বৈচিত্রহীন জীবন-যাত্রার বর্ণনা দিতে দিতেই নিজের শক্তি ক্ষয় করে না, বরং ঘুঁজে বের করে ইতিউতি সংঘটিত নানা বিচিত্র ঘটনা, চিত্রিত করে দাবদাহে দগ্ধ অথর্ব পৃথিবীর নানা অনাচার, ভূমিকম্প, বন্যা, খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, সাহিত্যও তেমনি জটিলতাকে অবলম্বন করেই মহৎ হয়ে ওঠে।

সোজা কথায় বলতে হয়, সাহিত্যের বিষয়বস্তু হলো মানুষের মন, যা কখনো আঙ্কিক ও যান্ত্রিক নিয়মে নিছক নির্মল হয় না, জটিলতা যার স্বাভাবিক ধর্ম। সাহিত্যের যুগপৎ দ্রুত ও স্থবির উচ্চারণে এই জটিলতাগুলি ফুটে ওঠে বলে আমরা সাগ্রহে পাঠ করি এবং অনুভূতিপ্রবণ হই।

এমনকি আমাদের শিশুকালে আমরা যে সমস্ত রূপকথা পড়েছি বা, শুনেছি, তাদের মধ্যে যেগুলিতে দুঃখ ও বিচ্ছেদ প্রাধান্য লাভ করেছে, আজো আমাদের স্মৃতিতে রীতিমতন উজ্জ্বল। স্মৃতির বিশীর্ণ প্রান্তর হাতিয়ে আমরা ওদেরই বার বার খুঁজে আনি। কিন্তু সেই শিশুবয়সে আমরা অবশ্যই চাইতুম, সিওরালা, বিউটি এবং অন্যান্য নায়িকারা সারাটা জীবন দুঃখ ও খেদহীন শান্তিতে থাকুন; কিন্তু যদি সত্যি তারা সুখে-শান্তিতে থাকতো, তবে কি দ্বিতীয়বার ঐ রূপকথার পৃষ্ঠা আমরা উল্টে দেখতুম?

পরবর্তীকালে প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক হিসাবে আমরা সেই সমস্ত প্রেমের গল্পকেই মাথায় তুলে রেখেছি, যেখানে উদয়াস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই চালিয়েও প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে সুখী মিলনের উপকূলে পৌঁছতে ব্যর্থ হলো; এমনকি, জীবনের সত্ত্ব বিক্রী করেও তারা পেল না অনাবিল শান্তির সংসার। সেই উপন্যাসগুলি আরো স্মরণীয় হয়ে উঠেছে, যেখানে

প্রাক বিবাহিত জীবনের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা জয় করবার পরও নায়ক-নায়িকার বিবাহিত জীবন যথার্থ সুখের হলো না—তাদের জীবনে থাবা বসালো অজ্ঞের বিবেক, কুটিল সন্দেহ, ভয়ঙ্কর ক্রোধ, স্নায়ু ঈর্ষা, অবুঝ কাম। এই সমস্ত কুৎসিৎ উপাদানরা হৃদয়ের ধারাপাতকে কালো ক'রে দেয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা এমন কথা কখনোই বলতে পারি না যে, দীর্ঘ প্রেমের পর বিবাহিত জীবনে নর-নারী সুখী হয় না। বরং, সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে আমরা ঠিক এর উল্টোটাই দেখতে পাবো।

গ্রীক সাহিত্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপবাদ হলো, এখানে সর্বোপরি সুখ-সমাপ্তির স্থান। কিন্তু আমরা গ্রীক সাহিত্য মন্থন ক'রে একাধিক ট্র্যাজেডির সন্ধান পাই, যা বিশ্বসাহিত্যের নানা কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্যারিস ও হেলেন, এগিসথিয়াস ও ক্লিটেমনেসট্রা, ফ্রেইডা ও টিপোলিটাস, মিডিয়া ও জেসন—এঁরা সকলেই গ্রীক-ট্র্যাজেডির বিখ্যাত নায়ক-নায়িকা।

যদি ট্রোজানরা গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে শেষাবধি বিজয়ী হতো, ফলতঃ প্যারিসের সঙ্গে হেলেনের বন্ধন নিশ্চিত রূপ নিতো, যদি হেক্টর এবং এ্যাণ্ড্রোম্যাকি সুদীর্ঘ সুখী পারিবারিক জীবন যাপন করতে পারতেন, আমরা কি হোমারের মহাকাব্যকে তেমন হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারতুম? প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্যেও মহান কবিদের রচনাতে অনুরূপ বিষাদ-চিত্র আমরা লাভ করি। রাম সীতাকে উদ্ধার করলেও অনাবিল সুখের সংসারে প্রবেশ করতে পারলেন না। রাজধর্মের কাছে বলি দেওয়া হলো সংসারধর্মকে।...

একজন সম্পাদকের পক্ষে বিশ্বের সর্বদেশের তাবৎ শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প/উপন্যাসগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলা বেশ কষ্টকর, নিখুঁত তো নয়ই। কারণ, কোন গল্প বা উপন্যাসই তো নিছক প্রেমের গল্প বা উপন্যাস হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ লর্ড ওয়ার্ড বুল ওয়ার লীটনের "Last Days of Pompeii" এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে প্রেমের ভূমিকা অসাধারণ হলেও ঐতিহাসিক এবং সামাজিক স্পর্শকাতরতাও প্রবল। আবার প্রেমকে সরিয়ে রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও অতি বিরল।

গত দুই শতাব্দী ধরে বিশ্বসাহিত্যে বহু উল্লেখযোগ্য প্রেম-নির্ভর সাহিত্য রচিত হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই উপন্যাস। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নায়ক-নায়িকার মানসিক জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবাহিত জীবনেও ধ্বস্ নামছে অনেক ব্যাপক হারে। এই পার্থক্যই আমরা দেখতে পাই মপাসাঁর "জোয়েত"-এর সঙ্গে লরেন্সের "দি ফক্স"-এ।

সাধ্যানুসার সতর্কতা সত্বেও নির্বাচন যে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারছে না, এ অনুভূতি আমার অন্তরে প্রবল। আমি জানি, এ রকম আরো কয়েক ডজন সংকলন হতে পারে এবং কোন ক্ষেত্রেই কোন একজন সম্পাদক চূড়ান্ত সফল হিসেবে নিজেকে গণ্য করতে পারেন না।

[বঙ্গানুসরণ ঃ শেখর সেনগুপ্ত]

রিচার্ড হুগস

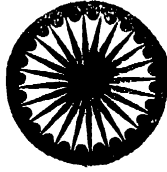
মিটার লোচিন ভেরোভিক

[ওয়েলস]



ভাষান্তর ঃ

শেখর সেনগুপ্ত



বলকানের পাহাড়ী অঞ্চল শূন্যবেদী, সপ্তাহ কয়েক ধরে যেখানে সোনার সময় শরৎ গুটি গুটি অধিকার অর্জনের মতলবে, যদিও আদ্রিয়াটিক ঢালু এলাকায় যাই যাই করেও এখনো গ্রীষ্ম অবিচল রূপসী।

এমনকি, এই শহর ত্রিয়েশতিতে আজো গ্রীষ্মের উপস্থিতি দিব্যি টের পাওয়া যায়। মাথার ওপর সূর্য জ্বলে। অর্ধবিস্মৃত—সম্পূর্ণ বিস্মৃত পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলি সেই উত্তাপ শুষে নেয়।

এই শহরটা আমার কাছে চিরদিনই বিষণ্ণ।

কবে যে কোন আলোরপথিক এর বুকে সহর্ষ স্পন্দন তুলবেন!

উত্তরে ধাপে ধাপে আকাশ ছোঁবার বাসনায় গুলিয়ান আলপস্‌শ্রেণী, ভয়ঙ্কর শীত যেখানে চিরায়ত। বরফখচিত তরঙ্গায়িত শীর্ষমুখগুলি রাজসিক। শীতাতঙ্কে ম্রিয়মান পাহাড়ী যুবতী কখনোই তার ভরাট স্তন খুলে দেখাতে পারলো না।

সমুজ্জ্বল রৌদ্র অথবা, মায়াবী চাঁদের আলোকে বিবর্ণ ক'রে খর খর বাতাস যখন আছাড়ি-পিছাড়ি পাহাড়তলীর খরস্রোতায় ছলাৎকার ওঠে।

তখন পার্কের পাতাভরা ছায়াচ্ছন্ন মোটা গাছটা ক্রমশই থর থর: শীতকে ঠেকানো গেল না! শীত এলো বলে!

শীতকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না।

তবু প্রতিবার ত্রিয়েশতিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যয় জন্মে, হয়তো এবার শীত আসবে না।

না, মশাই, প্রকৃতি নিয়ে কাব্যি করা আমার লক্ষ না।

এমনকি, আমি একথাও বলবো না, কেন আমি আবার ঘুরে ফিরে সেই ত্রিয়েশতি শহরে। আমি আপনাদের একটি প্রেমের গল্প শোনাবো। গল্প নয়, ঘটনা—নিজের দৃষ্টির সামনে যা ঘটেছিল।

আমার পক্ষে তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হতো না, যদি না সে সময় আমি এক হা-ভাত ভবঘুরেটি হয়ে ত্রিয়েশতির পথ-ঘাট, নদী-নালা লোলুপ জিহ্বায় চেটে চেটে বেড়াতাম !

এক এজমালি বাড়ির নড়বড়ে ঘরে বিছানা পেতেছি। একা নই, চারপাশে ওরকম আরো অনেকে পরিশ্রান্ত মুটেদের মতন হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে। কখনো কাৎ হ'য়ে এমন সব গপ্প-গুজব করি, যা বাস্তব জ্ঞানগম্মির বাইরে। আর শয়ন যখন হট্টমন্দিরে, ভোজন যত্রতত্র। খুঁজে পেতে এমন দোকানে ঢুঁ মারি, যেখানে বেশ শস্তায় বাসি খাবার পাওয়া যায়। খদ্দেরও প্রচুর। মিট মিটে আলোয় খাবারের থালায় বহু নিমজ্জমান ব্যক্তির হাত উঠছে-নামছে।···যতটা রাত সম্ভব বাইরে ধানাই-পানাই ক'রে পা টেনে টেনে ফিরে এসে চিট চিটে বিছানায় ধপাস। জামা প্যাণ্টের অবস্থা প্রায়দিনই কহতব্য নয়। সাবান ধার নেবো বলে মুদিদোকানীকে মিষ্টিকথায় তুষ্ট করতে চাই; কিন্তু ভবী ভোলার নয়। ফলে পয়সা খসে।···নাকের ডগায় উড়ুক্কু সুন্দরীদের দেখে উসখুস করি, কিন্তু ওরা দ্বিগুণ উশুল করে নেবে ভাবলেই মস্তিষ্কের উত্তাপ বাষ্প হ'য়ে যায়।···

সেই সব ঘন ঘোর দিনগুলিতে আমার জিগরী দোস্ত ছিল মিটার লোচিন ভেরোভিক্। আমরা যেন কোন কাল্পনিক যুদ্ধের দুই পলাতক সৈনিক, ললাট যাদের একই কালিতে আঁকা। ছেলে-বুড়ো-জোয়ান-মদ্দ সকলেই জানতো, এরা দুটিতে মাণিকজোড়। মিটার লোচিন যথার্থ বুদ্ধিমান, তার দৃষ্টি প্রখর এবং ঠোঁটের কোনে চাপা হাসি। কিন্তু আমার বড় ভয় তার স্বাস্থ্য নিয়ে—দিনকে দিন কেমন ক্ষয়ে যাচ্ছে সে। জীবনযাত্রার ধারা যদি না বদলায়, খুব শীঘ্র কুপকাৎ সে হবে-ই। পয়সা

ও পুষ্টিকর খাদ্যের লেজুড় হওয়াটা তার আশু প্রয়োজন। এক এক সময় তো আমার মনে হয়, লোচিন বুঝি মারাই গেছে।

ধূমপানে তার কোন আগ্রহ নেই। যদি আমি কখনো তাকে সিগারেট অফার করি সে বিরক্তি বা উষ্মা প্রকাশ করে না সত্যি কিন্তু সিগারেটটাকে দাঁতে ছিড়ে তামাকের গুড়িগুলিকে চিবুতে থাকে। বছরের পর বছর তার হার্টের অবস্থা ভালো নয়, হাসি মস্করায় তাল দিতে গিয়ে কখনো কখনো তার বুকের ধুকপুকানি খুব বেড়ে যায়। অথচ, একজন পাড়মাতালও তার মালটানার তারিফদার হতে বাধ্য। মদে পেট টইটম্বুর না হওয়া অব্দি মাল টানায় সে ক্ষান্তি দেয় না। গলায় তরল আগুন ঢালে, উত্তেজিত হয়, শ্লেষ ঠাট্টায় সে পরিপূর্ণ জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আমার ঠিক পাশের বিছানাতেই লোচিন। একে তাকে জড়িয়ে ঘ্যাঁট পাকাতে ওস্তাদ। কেউ মাথা গরম করলে সে পেঁয়াজ পয়জার হাসিমুখে কবুল করে।

আমার বিছানার আর এক ধারে খাট পেতেছে এক বিকটদর্শন নিগ্রো যুবক, যে সব সময়ই বুঝি সামাজিক কর্তব্যের দায়ে টাল মাটাল মাতাল হ'য়ে আছে।

মিটার লোচিন কৃপণের মানসিকতায় এক মহামূল্যবান বস্তুকে সব সময় কাগজে মুড়ে বিছানার নীচে রেখে দিতো। করিডোর পার হতে হতেও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতো তার বিছানার তলার ঐ জায়গাটা ঠিক ফুলে আছে কিনা! সাধারণভাবে রেখে যেতো বলেই ওটির প্রতি প্রতিবেশী কারুর লোভ বা প্ররোচনা আমি লক্ষ্য করিনি।

ফরাসী সম্রাট প্রথম নেপোনিয়নের ভ্রমণসঙ্গী একটি কারুকার্যখচিত স্টিক। এই সেই লাঠি, যা হাতে দোলাতে দোলাতে ছোটখাটো চেহারার স্বভাবগম্ভীর মহামান্য নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ভোরে প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করতেন ; হয়তো তখন তাঁর রূপসী ছোটবোন

ছুটে এসে বিবিধ উদ্ভট আব্দার ও প্রশ্ন তুলতেন সম্রাটের কানের কাছে।

আপাতদৃষ্টে ওটা একটা লাঠিই; কিন্তু অভিজ্ঞজনরা জানেন, কী প্রচণ্ড মূল্যবান। কেবল তো স্টিক নয়, স্টিকের সঙ্গে ছিল স্বয়ং সম্রাটের লেখা একটি চিঠি। জনৈকা মন্টেগরিয়ান মহিলাকে স্টিকখানি উপহার দিচ্ছেন দু' ছত্র সাদর সম্ভাষণ সহ।

এই চিঠি ও লাঠি দেখলে যে কোন অভিমানী ফরাসীর আঁতে ঘা লাগতে পারে।

কিন্তু মিটার লোচিনের মতন অপ্রত্নতাত্ত্বিক লোকের কব্জায় এরা এলো কিভাবে? জিজ্ঞেস ক'রে জবাব পাই নি। লোচিন ঠোঁট কাঁপিয়ে হয় থোরাই কেয়ার হাসি হেসেছে, নয়তো গাম্ভীর্যের আবরণে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়েছে···ভেনিস·· লণ্ডন·· মাদ্রিদ···রাগুসা রিপ্লাবিকের সেই গৌরবান্বিত শত্রুর স্মৃতি দুটি কিভাবে—কোন সূত্রে যে লোচিন···

আমার সময় সময় মনে হতো, তুরুপের এই তাস দুটো আছে বলেই রুগ্ন লোচিন স্বয়ং এতটা বিশিষ্ট ও আকর্ষক।

লোচিনের ওয়েস্ট কোটের এক পকেটে নেপোলিয়নের চিঠি, অন্য পকেটে গুটিকয়েক গ্রীক ও রোমক মুদ্রা। এই মুদ্রা-রহস্যও বিন্দু বিসর্গ আমার জানা নেই, স্বভাবসুলভ ভঙ্গীমায় সে নিরুচ্চার। ওয়েস্ট কোটটা পরেই সে অশ্বমেধের ঘোড়া—যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, মালের আসরে রাজা সাজে, প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে হৃদয় খুলে দেখায়। তার কি একবারও ভয় হয় না, আমি বা আমরা একক বা সমবেতভাবে তার ঐ প্রাণের বস্তুনিচয় বাজেয়াপ্ত করতে পারি! আমি না হয় তার হিতাকাংক্ষী, কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী নিগ্রোটা?

অবিশ্যি এটা আমি জানি, ছোটবেলায় গুণ্ডামি ও রাহাজানিতে মিটার লোচিন বেশ কিছু এলাকা জুড়ে যুগপৎ ত্রাহি ত্রাহি ও সাবাস

সাবাস রব তুলেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমার প্রত্যয় যে, পুরো পাকা ঐতিহাসিক জিনিসগুলি সে পরবর্তীকালেই হাতিয়েছে।

আদতে কোন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেই লোচিন ঠিক ঝেড়ে কাশে না [সিক্রেট এজেন্টদের প্রধান বৈশিষ্ট্য], বন্ধু হয়েও প্রায়শই আমি নিস্ফল সন্ধানে। বালক বয়সে সে যে-সব গুণ্ডামি বদমাইশি করেছে, সে-গুলিও খুব বিস্তৃতভাবে সে আমাদের শোনায় নি। আর পরবর্তীকালে—অর্থাৎ এখন—কেন যে সে এমন যথেষ্ট স্বচ্ছলতা সত্বেও কথঞ্চিৎ মালপত্র নিয়ে হট্টমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে, কেন যে অসুস্থ শরীর নিয়ে ভালোমন্দ না খেয়ে নিজের বারোটা বাজাচ্ছে, আমার বোধগম্য নয়।

এত চাপাচাপি সত্বেও আমরা বন্ধু, আমাদের ঘনিষ্ঠতাকে এ ঘরের অনেকেই সেলাম করে। পদ্মাসীন হ'য়ে মুখোমুখি আমরা রসালাপ করি। মালের আসরে বে-আদবী কাণ্ডকারখানায় মেতে উঠি। বাতাস থেকে সুন্দরীদের নির্যাস গ্রহণ করি। নিগ্রো প্রতিবেশীর কতখানি তাগত, মনে মনে পরিমাপ করি। পথে চলতে চলতে পার্কে প্রেমিক-প্রেমিকার ব্রীড়াভরা ব্যবহার সকৌতুকে পরখ করি।—

এইসব কথা সোচ্চারে বলবার পরও আমি নিরুচ্চারে আপনাদের কাছে কবুল করছি, আমি স্যার জানি, মিটার লোচিন লোকটা আদতে কি? জানি, কি তার গোপন কার্যকলাপ! হ্যাঁ, এই মাত্র বছর কয়েক আগেও সে ছিল তুর্কী গুপ্তচর সংস্থার কর্মী। এথেন্সে ঢুকে পরামানন্দে কাজকর্ম চালাচ্ছিলো। হেলায়-ফেলায় গ্রীকদের ধোকা দিয়ে কখনো কখনো তার আঠাশ ইঞ্চি বুক ছত্রিশ হ'য়ে উঠতো। কিন্তু আড্ডাবাজ মাতালদের জন্য গাড্ডা পাতা থাকে যত্রতত্র। গাড্ডায় পড়লো সে। এক পুলিশী দপ্তরে ঢুকে পুশিং ফ্লার্ট করতে গিয়ে আসল পরিচয় আর চেপে রাখতে পারেনি। সম্ভবত, পেটে তার তখন গ্যালনখানিক লালপানি টলটল করছিল, পর্যবেক্ষণে ভ্রান্তি ঘটেছিল, প্রলাপ বকাও আশ্চর্যের নয়। কথায় বলে, বিপদে পড়লে শয়তানকে

মাছি ধরে খায়। জঙ্গী বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে মিটার লোচিনও কাকুতি-মিনতি কম করেনি। স্পেশাল আদালত গুতে টলে না। কারাবাস তথা অত্যাচার তথা খানাপিনার অনটন চললো একটানা কয়েক বছর।

মুক্তি যখন এলো, পৃথিবীর আকাশে তখন মহাসমরের কালো মেঘ। গাঁঠের কড়ি খর্চা করে কিছুদিন দুনিয়াময় ঘুর ঘুর করলো লোচিন। এবং তারপরই কী আশ্চর্য—খুদ মার্কিন সরকারের রিলিফ ফাণ্ডের একজন অফিসার হিসেবে সে বলকান এলাকায়!!

এইরকম আকস্মিক নির্ঘণ্ট পরিবর্তনগুলি সেরে মিটার লোচিন যখন আমার সঙ্গী, তখন সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছে। বর্তমানে সে আর সিক্রেট সার্ভিসের লোক না হলেও একজন স্মাগলার। অ্যামেরিকায় আফিম চালানের প্রশস্ততম স্থান, মর্যদা, ক্ষমতা—সবকিছুই তার রোগা রোগা শয়তানী হাতের নাগালে। খুবই নির্বিবাদে এ-দেশে চোরাচালানিতে মনোনিবেশ করা যায়, অহেতুক যাদুকরের মতন ভেল্কি দেখবার দরকার নেই, আবার কয়েদখানায় ফিরে যাবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। একমাত্র অসুবিধে, মার্কিনী ক্রেতাদের কাছ থেকে পাওনা আদায়। এই অন্ধ ব্যবসায়ের নিয়মানুযায়ী ক্রেতা ও বিক্রেতা কখনো পরস্পরকে ঠাহর ও হদিস করতে পারে না। এক্ষেত্রে স্মাগলার লোচিনের সুতো হলো রিলিফ ফাণ্ডের কতিপয় দুর্নীতিপরায়ন অফিসার, যাদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রীতিমতন ব্ল্যাকমেলিং করতো লোচিন। এরা রিলিফ ফাণ্ডের বিবিধ কাজের অছিলায় অ্যামেরিকায় গিয়ে লোচিনের স্বার্থ হাসিল করতো। নির্বিবাদে যেন ধ্বনি ও টেলিপ্যাথির সাহায্যে লোচিন বাবাজী তার পাপ ব্যবসায়ে রীতিমতন শাহজাহান।

কিন্তু চোরাগোপ্তার কিং হয়েও মিটার লোচিন কেন যে ত্রিয়েশতি

শহরে অমন সর্বনাশা কৃচ্ছ্রতায় নিজেকে ফতুর করে দিচ্ছে, বুঝি না। সে তো অনায়াসে সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত এলাকায় ভুঁইফোড় হয়ে উঠতে পারতো, রজতচক্রের চাকচিক্যে ক্লাবে ঢুকে বনেদী মহিলার কোমর ধরে নাচতে পারতো।

ঠিক এই কারণেই আমি আশা করছি, যে কোনদিন সে অভিজাত পাখি হ'য়ে উড়ান দেবে। যতদিন সে নগণ্য, আমি তার পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে একটি নেহাৎ শস্তা পরিচিত মদের দোকানের চৌকাঠ আমরা রোজ পার হই। এমন কালি-ঝুলি ঘুম-ঘুম দুর্গন্ধময় দোকানে ঢুকলে যেকোন ইমানদার ভিরমি খাবেন। আমাদের কোনরকম বাছবিচার করলে চলে না, সেই স্বর্গে আমাদের নরক-গুলজার।

মদের নামে পেয়ালাভর্তি যে বস্তুটি সার্ভ করা হতো, তার কালিগোলাবর্ণ এবং আঁশটে গন্ধ অভাবনীয়। নিঃসন্দেহে ভীষণ অস্বাস্থ্যকর এবং অতিদ্রুত সকল মনস্তাপ মুছে দিতে সক্ষম। ত্রিয়েশতি শহরে ঐ অনার্য সোমরসের নাম 'ভিনো নীরো'। ভিনো নীরোর জিম্মেদারী হ'য়ে মিটার লোচিন ও আমি বহুক্ষণ বুঁদ।

দোকানটার অবস্থান যেন একেবারে প্রকৃতির গর্ভে। দু'চারটে খানা খন্দ দোকানটার অবস্থান যেন একেবারে প্রকৃতির গর্ভে। দু'চারটে খনো-খন্দ পার হলেই অবারিত মাঠ ও সারিবদ্ধ পাইন। বাতাসের হিল্লোলে আরো অনেক রকম ছোট ছোট গাছ একে অপরের দিকে ছোঁক ছোঁক। একটু পরেই চাঁদ উঠবে, তারই আভাস লেগেছে পাইনের মাথায় মাথায়। ভিননীরো গলায় ঢালবার পর ঐ দৃশ্য যখন চোখের লেন্সে স্থিরবদ্ধ, আমাদের বুদ্ধি ও স্পর্শকাতরতা দুই-ই তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে। এবং তখনই, প্রায় সন্ধ্যাতেই মাতাল লোচিন তার ওয়েস্টকোট হাতিয়ে একটি বড় ঐতিহাসিক মুদ্রা বের করে আনে এবং তার হাতের রেখাময় চেটোয় সেটি আপন মহিমায় চকচক করতে থাকে। মুহূর্তে মৃত সাম্রাজ্যের অতীত গরিমা বিচ্ছুরিত। বিচিত্র সব সত্য-মিথ্যা কাহিনী শোনায় তখন লোচিন।

বিশেষত, রাজা প্রথম ডুকলজন সম্পর্কে এমন সব তথ্য পরিবেশন করে, যা মামুলী মিথ্যারও উর্ধে! কল্পনা সেখানে উর্বর, ফ্যাশানমাফিক চিত্তাকর্ষক। সেই রাজা সর্বগ্রাসী স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রথম ধ্বজাধারী, যিনি বর্শা ফলকে জ্যান্ত সিংহকে বিদ্ধ ক'রে বাতাসের বেগে ঘোড়া ছোটাতেন। এই সব আষাঢ়ে গল্পেও আমার আগ্রহ দেখে লোচিন মধুর হাসতো। তার গল্প বড় হতে হতে আদপেই আর সীমার মধ্যে থাকে না। গ্রীসে গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে ফায়ারিংস্কোয়াডে সে একঝাঁক তরুণকে নিহত হতে দেখেছে। ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে বালিকাকে যখন এক শা-জোয়ান বীভৎস ও উৎকট পদ্ধতিতে ধর্ষন করছে, লোচিন তার বাঁশপাতামুখ নামিয়ে দৃশ্যটাকে বুকের মধ্যে গেঁথে রেখেছে। সম্মোহনক্ষমতার অধিকারী এক চোরের সঙ্গে লোচিনের খুব গলায় গলায় পীরিত জমেছিল, যদিও চোর তার বিদ্যা লোচিনকে শেখায় নি। অথবা, সে প্রত্যক্ষ করেছে, ম্যাসিডোনিয়ান কায়দায় নিরীহ মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ হতে ড্রুম—ড্রুম ড্রুম বাজনা বাজাতে বাজাতে বহু জমকালো বাদক গোল হ'য়ে ঘুরছে—ঘুরছে এবং তখন ভয়ঙ্কর শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে ক্রুশবিদ্ধ মানুষের জ্যোতিঃশক্তির অভিপ্রকাশ দেখা গেছে। কয়েদখানায় লোচিনের বুকে রোজ প্রহরী এসে ছুটো ক'রে লাথি কষাতো। তার পাঁজরে আজো সেই লাথি ঝন্ ঝন্ ক'রে বাজে। প্রতি অমাবশ্যায়/পূর্ণিমায় যমাকৃত প্রহরীদের অদৃশ্য ডিমনস্ট্রেশন যেন দ্বিগুণ/তিনগুণ হয়ে ওঠে।

এমনি সব কঠোর-কঠিন উল্টো-পাল্টা গল্প শোনাতে শোনাতে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ তার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর স্মৃতিচিহ্নকে আমার দৃষ্টির সামনে মেলে ধরলো। মিটার লোচিন যেন সেই লোক, যার প্যাঁটরায় বহু সম্পদ, কিন্তু জানে না, প্যাঁটরাটা ঠিক কোথায়।

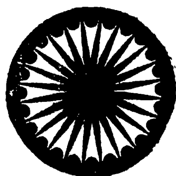
যেন খুঁজতে খুঁজতেই সেদিন পেয়ে গেল তার গুপ্তসম্পদের সন্ধান। সে তার ওয়েস্টকোটের লাইনিং ছিঁড়ে সযত্নে বের করলো একখানা ফটো—বলাবাহুল্য রমনীর মুখাবয়ব—ঈষৎ কাঁপা হাতে যা সে আমার

দিকে বাড়িয়ে দেয়। ফটোগ্রাফিতে মুন্সিয়ানা নেই, কাগজটার পরমায়ুও ফুরিয়ে এসেছে; তবু এক লহমাতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়, মুখশ্রী হাজারে বিরল। সৃষ্টিকর্তা তাঁর অনেকগুলি প্রহর নিঙড়ে নিঙড়ে গড়ে তুলেছিল এই মুখ। হাসিটি মধুর, কান পাতলে এখনই বুঝি স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি শোনা যাবে।

বিশ্বাস করুন, আমি কোন রকম আদিখ্যেতা করছি না। কেবলমাত্র এই ছবিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বহু ডাকসাইটে সুন্দরী কুণ্ঠিত ও বিড়ম্বিতবোধ করবে।

আমি যখন ফটোখানা দেখছি, লোচিন কিছুক্ষণ আধমরা হ'য়েছিল। তারপর একরকম ঝাপটা মেরে ছবিটা সে ছিনিয়ে নেয়। অভাবনীয় আকুলতায় ঝুঁকে পড়ে ওর ওপর। একটি নিছক প্রতিচ্ছবিকে জীবন্ত ক'রে তুলবার বুঝি এ বিরল সাধনা। সুন্দরী, কৃশাঙ্গী, তুমি জেগে ওঠো, বিহ্বল বায়সকণ্ঠে ডাকো, 'ডার্লিং, লো-চি-ন···'

মিটার লোচিনের বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস বের হয়। সে আবার সযত্নে কোটের পকেটে চালান দেয় ছবিখানাকে। এবং তখনই আমি টের পেলাম, মিটার লোচিনের অনেক দুর্দান্ত রূপ ও রূপান্তর সত্বেও একটি কোমল গোপনীয়তা আছে, আছে তার ঝরঝরে বুকের মধ্যে আলাদা এক বাসা, যেখানকার রূপ-রস ও দুঃখের কোন ইয়ত্তা নেই, যেখানে অতি শক্তিমান পুরুষও বারবার পরাস্ত হয়।



পূর্বরাগ—প্রথম দর্শনেই প্রেম—প্রবল এক দৈবঘটনা। দৈব এই জন্য যে এর পিছনে কোন প্রস্তুতি থাকে না। ঈশ্বরের বিচিত্র বাসনায় একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর প্রথম চাক্ষুষ পরিচিতি এবং তাতেই রক্ত প্রবাহের মধ্যে অহরহ আছাড়ি পিছাড়ি।

মিটার লোচিনের কোটের পকেটে যে সুন্দরীর প্রতিকৃতি, সে নত্য —নত্য তার নাম, যার দীঘল চোখের দিকে চেয়ে মিটার লোচিন নিশ্চয় চিত্রার্পিত হয়ে পড়েছিল এবং ভাবতে ভালো লাগে, ছিপ ছিপে বুদ্ধি প্রখর লোচিনকে দেখেও নত্যের মনের তল মুহূর্তে টলমল। বাস্তবতার ভূমি খুঁজতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, মিটার লোচিনের সঙ্গে মুলাকাৎ হবার আগে নত্যের জীবনে কোন পুরুষের আবির্ভাব ঘটেনি, যদিও সে ক্রমশই পরিপূর্ণ যৌবনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে। ছায়াছন্ন বাড়ির চারদিকে ঝুমকো লতা, সবুজের হাট, নীলাকাশ নীচু হতে হতে সবুজে লীন হ'য়ে গেছে। নত্য, আমার কল্পনানুযায়ী, এই নরম কোমল পারিপার্শিকতা দেখেছে এবং পুরুষ বলতে জানতো কেবল তার বাবা ও ভাইদের। এমন নারী তো প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়বে, অবশ্য সেই পুরুষকে নিশ্চয় তার স্বামী হলে চলবে না। আর যাই হোক মশাই, স্বামী-টামীর সঙ্গে কি প্রথম দর্শনেই প্রেম সম্ভব? যদি বলেন সম্ভব, আপনার বক্তব্য আমার মনঃপুত হবে না। কোন রসিকজনেরও হবে বলে মনে হয় না।

রিলিফ ও তদীয় বিষয়ে বিশারদ মিটার লোচিন গ্রামে-গঞ্জে ঘুর-ঘুর, মোসাহেবি মারফৎ তার অনেক সঙ্গী সরকারী অনুদান চেটে-পুটে খায় এবং লোচিনের চোরাচালানের উগ্রতা বৃদ্ধি পায়। সে দুর্দ্ধান্ত দুঃসাহসী, বাচনভঙ্গী চমৎকার, সংগতিও কম নয়; নত্যের মতন পবিত্র কন্যার সন্ধান পেলে সে তো আরো বেপরোয়া। সে তাকে কথায় ভোলাবে, উপহার এনে দেবে, বড় বড় মানুষের মিথ্যা আশীবানী পৌঁছে দেবে, বিবাহ ইত্যাদির অঙ্গীকার তো হাজার হাজার বার। নিষ্ক্রিয়তার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এমন প্রেমিকার প্রেমে সুধন্য হতে সে আল্পসের চূড়োতে উঠতে পারে, স্বখাত সলিলেও ডুবে মরতে আপত্তি নেই। পোশাকের চাকচিক্যে তার শারীরিক শীর্ণতা ঢাকা পড়েছে,মার্কিন রিলিফ অফিসার হিসেবে তার একটা বাড়তি সুবিধা আছে বৈকি! সুদূর থেকে

এসেছে নিশ্চয় বসে বসে মশা মারার জন্য নয়—স্থানীয় মেয়েদের নজরে তারা স্মার্ট, আকর্ষক।

গরীবগুর্বোদের দুঃখে চুক্‌চুক্ করতে করতেও মেয়েমানুষ জরীপ করা লোচিন সাহেবের বিশেষ দক্ষতা। এমন কি মহিলা-মনের ব্যূহভেদও তার পক্ষে খুব একটা আয়াসসাধ্য কম্ম নয়; ওদের বায়না যে ঘন ঘন কোন পথে ছুট দেয়, সেটা তার জানা। অর্থাৎ স্পষ্টতই নত্য তার জীবনে প্রথম নারী নয়। সে যে লাইনের লোক, মেয়েমানুষ তো সেখানে আকছার। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি, পয়সা লোফালুফি, বাকপটুতার দৌড় তথা যৌন কামড় ইত্যাদির পারস্পরিক আদান-প্রদানে এ যাবৎ সে বিছানায় বহু মেমেকে পেয়েছে; কাজেকাজেই ঐ এনাটমি তার মুখস্ত।

আর এতখানি অভিজ্ঞতা ছিল বলেই মাঠে ঘাটে হোটেলে বারে চরে খাওয়া মানুষ লোচিন বুঝতে পেরেছে, চুপচাপ মুখ ও শান্ত ঐ দুই চোখ বালিকা নত্য নারীরত্ন হিসেবে কতটা মূল্যবান। এখানে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সরলতা, লোচিন আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।···

এইগুলি সবই আপনার, আমার যুক্তিনির্ভর অনুমান!···

তখন জ্যোৎস্না রাত্রি। মার্কিন রিলিফ দপ্তরের অফিসার মিটার লোচিন হাতে—ঠেলা গাড়ি হুইলব্যারো ভাড়া করবার জন্য গ্রামে ঢুকছে। দুঃস্থ মানুষদের কাছে রিলিফের প্যাকেট পৌঁছে দিতে এই গাড়িগুলি কার্যকরী।

লোচিনের পদক্ষেপ মর্যাদাপূর্ণ। এখানে লোকজন কম, সুমসাম রহস্যময়তা অবারিত চাঁদের আলোয় মাখামাখি মাঠে—ময়দানে। বারুদের গন্ধে অভ্যস্ত লোচিন যেন ধূপগন্ধে নিজেকে পবিত্র ক'রে তুলছে। প্রতিটি বড় বড় তারা আকাশপ্রদীপ হ'য়ে চাঁদকে দেখছে। এখানে, এমন পরিবেশে কিছুকাল থাকলে লোচিন ভূয়োদর্শী হয়ে উঠবে এবং প্রকৃতই অদূরে অপেক্ষমান প্রেম।···

হুইলব্যারো ভাড়া দেওয়া নত্যদের পারিবারিক পেশা। খবর পেয়ে লোচিন সেই বাড়ির দিকে।

আপদমস্তক লতা-পাতায় ঢাকা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আওয়াজ তুলতেই কপাট খুলে নত্য এসে দাঁড়ালো। প্রথম মানুষ পরিচিতি। লোচিন থ। আরক্ত জবু-থবু নত্যও কেঁপে উঠলো…

ভাড়া করা হুইলব্যারোটা ঠেলতে ঠেলতে ফিরে আসতে থাকে লোচিন। অনেক তাগিদ সত্বেও গতি শ্লথ। উচু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সে একবার পিছন ফিরে তাকালো। পুলকে নেচে উঠলো তার বুক— ঐ যে দুয়ারে অবিমিশ্র মুগ্ধতায় এখনো তারই দিকে চেয়ে আছে সে। লোচিনকে ঘুরে তাকাতে দেখেই নত-চক্ষু। ঐ রকম হাল গতিতে সেদিন যে কি বাঙনিষ্পত্তি হয়েছিল তাদের অনুমানের বিষয়।

অতঃপর মিস্টার লোচিনকে প্রায়ই দেখা গেল হুইলব্যারো-ভাড়া করতে ঐ গ্রামে ঢুকতে এবং ঘুরতে ঘুরতে ভারি নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ঠিক সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতে।

নত্যর মার কিন্তু টের পাবারই কথা। তাঁর মেয়ে যে সন্ধ্যা ঘনালেই অন্যরকম হ'য়ে যায়, এটা তো বোঝা উচিত ছিল। হয়তো খানিকটা অনুমান করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ঠিক ঠিক সবুদ চট ক'রে না মেলায় আঙুল আর তর্জনী তুলে হুঁশিয়ার করে দিতে পারেন নি।

নত্যদের আশ্রমপ্রতিম ঘরে ভিন্নতর রহস্যময়তা দ্রুত দানা বাঁধছিল। বাতাসে কুমারী মেয়ের আকুলতা। সবুজ মখমলের মতন বাগানে, ছেঁড়া খোঁড়া সীমিত ময়দানে যখন সে পায়চারি করে, তার মতন আনমনা মেয়ে দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি নেই। যুবতীরা বিনা কারণে রাতের পর রাত জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে না ; অন্তরে নিদারুণ নটঘটি না ঘটলে কোন সুন্দরী কেবল চাঁদের দিকে চেয়ে নিজের আকুলতা প্রকাশ

করতে চায় ? যতই সে তার বাগানকে ভালবাসুক, কোন সব্বনাশী অন্ধকার ঘনালেও ঝোঁপ-ঝাড় ছেড়ে উঠে আসতে চায় না ? কোন মানসিক পর্যায়ে পৌঁছলে অনূঢ়া যুবতী ভোরের পাখির মতন গুন গুন করতে থাকে ? ··

জানিনা, নত্যার মা কতখানি সাবধানী ছিলেন। সাবধানী মহিলা হ'লে নিশ্চয় অনেক কিছুই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। যেমন, প্রায় রাতেই বাড়ির লনে ফুল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কে যেন শিষ দেয়। ভূত-প্রেত নয়, তক্ষকও নয়। আরো আশ্চর্য যে, শব্দটা গড়াতে গড়াতে এসে থামে ঠিক নত্যার ঘরের জানালার সামনে! তখন নত্যার কাছে ঐ শব্দ সমুদ্রের গর্জনের চেয়েও মাদকতাপূর্ণ, নাইটেঙ্গেলের ডাকের চেয়েও মর্মভেদী, বাগানের সবচেয়ে সুগন্ধ ফুলটার চেয়েও আকর্ষক। যদি ঐ শব্দকে অনুসরণ ক'রে তার মা এগিয়ে আসেন, দেখতে পাবেন একটি বিচিত্র দৃশ্য।

একটি ছোট্ট সিল্কের রুমাল কাঁপা হাতে নত্যা জানলা দিয়ে উড়িয়ে দিলো এবং মার্কিণ রিলিফ অফিসার মিষ্টার লোচিন লুফে নিলো সেটা। তারপর সেই রুমালে সযত্নে গিট বেঁধে দিলো রমনীয় উপহার—রাগুসা রিপাব্লিকের পুরাতন ভারী মুদ্রা। রুমালটা ফেরৎ পেয়েই চকিতে নত্যা তার বুকের গোপন আধারে লুকিয়ে ফেললো।

নত্যার মা যদি সচেতন হতেন, তাঁর খেয়াল হতো, দিনের বেলাতেও তাঁর মেয়ের আচরণে কত পরিবর্তন। আগে সারাটা দুপুর সে তার ভাইদের জামায় সুতো দিয়ে কতরকম ফুল তুলতো ; এখন কোন কাজেই মন নেই, কেবল বিছানায় টান টান শুয়ে উপরপানে মুখ তুলে কি যেন ভাবছে আর ভাবছে। আবছা আবছা ছায়াঘরে সে বুঝি কড়িকাঠ গুণছে, সময় সময় আলতা স্পর্শ করছে নিজের নরম বুক, যেখানে লুকিয়ে আছে লোচিনের উপহার প্রাচীন মুদ্রাটি। কখনো কখনো সে চোখ বোজে এবং তখন তার চোখগুলিও যেন কি গভীর ভাবনায়

তাকিয়ে থাকে। অবস্থা তার তখন বিখ্যাত উর্দ্দু কবি মীরতকী মীরের ভাষায়—

দুখ অব ফিরাককা হমসে সঙ নহী জাতা,
ফির উসপে জুলুম য়হ হ্যয়, কুছ কহা নহী জাতা।

এদিকে মিটার লোচিনের ওপরওয়ালা মেজর টুডি, যাঁকে দেখলেই মিটার শশব্যস্ত, ভুরু কুঁচকে দেখছেন তাঁর অধস্তনের সাম্প্রতিক আচরণ। আগের মতন চটপট নয় ছোকরা। কথাবার্তাতেও সে রকম সপ্রতিভ থাকছে না। মুখের ওপর রুমাল চাপা দিয়ে সকলকে এড়িয়ে যেতে চায়। কাজেও মন নেই। আগে কাজের নামে যার মেজাজ চনমনে ও খুশ, এখন সে প্রচুর কাজ থাকা সত্ত্বেও ঝিম মেরে রয়। যখন গ্রীষ্মের পেল্লায় সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে উদ্বাস্তুদের রুটি বিলানোতে তার তদারকি করার কথা, সে কিনা তখন নিজের ঘরের চৌকিদার হ'য়ে পাশবালিশ আঁকড়ে শুয়ে আছে! বন্ধু বান্ধবেরা এলে চোখে-মুখে বিরক্তি ; পরিচিতরা বিদায় নিলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আপনার মনে হওয়া স্বাভাবিক, মেজর টুডি যখন ওপরওয়ালা, তখন তো তাঁর উচিত ছিল মিটার লোচিনকে হুঁশিয়ার ক'রে দেওয়া ; যেমন উচিত ছিল নত্যর মার তাঁর মেয়েকে চোখে চোখে রাখা। আসলে পাহাড় ও টিলার কাছে পরিদর্শণরত দৈত্যাকায় মানুষ মেজর টুডির বহিঃপ্রকাশ যাই থাক, মনে মনে রোগাপটকা লোচিনকে একটু যেন ভয়ই করতেন। না, তিনি অসাধু ছিলেন না ; লোচিনের পক্ষে তাঁকে ব্ল্যাকমেলিং-এর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বরং মাত্রাতিরিক্ত আত্ম-সম্মানবোধ সততা এবং আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে ঈষৎ দুর্বল ক'রে রাখতো। যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে এই সবের ভাবাবেগ তাঁকে যেন পিছন থেকে টেনে ধরতো। বনেট খোলা গাড়ির ওপর ভর দিয়ে প্রায়শই তিনি নিজের ভেতরেই যুদ্ধ চালাতেন। অধিকাংশ অ্যামেরিকানের মতন তিনিও মনেপ্রাণে চাইতেন, অ্যামেরিকার পর্যাপ্ত সাহায্যে পৃথিবীর

দুঃস্থ এলাকাগুলি সতেজ হয়ে উঠুক। সেই সঙ্গে এটাও তিনি চাইতেন, তাঁর মহান দেশকে কেউ যেন বদনাম দিতে না পারে।

নিজের এই মানসিকতার জন্যই তিনি মিটার লোচিনকে বিশেষ ঘাঁটাতে সাহসী হতেন না। প্রথমত, লোচিন নন-অ্যামেরিকান। তার স্বার্থের লেজে পা পড়লে সে নির্দ্বিধায় অ্যামেরিকার মুখে কালি লেপে দেবার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয়ত, ছোকরা বড় রহস্যময়। কিছুদিন আগেও তার ভেতর ছিল হিসেবহারানো উল্লাস। এখন বিমর্ষতা। আবার মানসিক পরিবর্তন এলে সমুদ্রের ঢেউ হ'য়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, টুডি এ যাবৎ ওর অসাধুতার কোন পরিচয় পাননি। সামান্য 'অফ মুডে' আছে তো, এমন কি হয়েছে ? দারুণ উৎসাহী মানুষও সময় সময় নির্জনতাকে নিয়ে থাকতে চায়।

সুতরাং, লোচিন যদি এখন ভর দুপুরেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গোনে তো, গুনুক। টুডির বুকের মধ্যে কিছুতেই সে কাঁটা হ'য়ে খিচখিচ করবে না। না।

কিন্তু পুরুষমানুষের তুলনায় মেয়েমানুষ যথেষ্ট ঘড়েল। মেয়েমানুষের নজর বড় সন্ধানী অথবা, চোখ বুজে তারা অনেক সত্যকে দেখতে পায়। মেজর টুডি যা ধরতে পারেন নি, নত্যর মা সেটা প্রায় টের পেয়ে গেলেন। রহস্যের গন্ধে গন্ধে চুপি সাড়ে এগিয়ে আবছা আবছা যা পরখ করলেন, তাতেই আত্মারাম খাঁচা। শিষ দিতে দিতে কে যেন এগিয়ে আসে এবং ব্যাকুল নত্য তার রুমালটাকে বাতাসে উড়িয়ে দেয়।

আশঙ্কায় ভদ্রমহিলার হাত-পা থর থর কাঁপতে থাকে। নির্ঘাৎ শহরে শেয়াল ঘুর ঘুর করছে ঘরের চারপাশে ; ঠিক একদিন তাঁর অবুঝ ছানাটিকে নিয়ে বেপাত্তা হবে !

স্বভাবতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মহিলা তাঁর দাপট দেখাতে কার্পণ্য করলেন না সংসারের সর্বাঙ্গে তাঁর যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত চটক, সেটাই বুঝি শান

দিতে দিতে এগিয়ে এলেন বোকা মেয়েকে হুঁশিয়ার করে দিতে।, তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাস, বসবার ভঙ্গীতে রীতিমতন ঋজুতা।

'নত্য, আমি সব দেখেছি। ক'দিন ধরে চলছে এমন নষ্টামি ?···কি, কথা বলছিস না যে ?···' মা কিছুক্ষণ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিছানার ওপর বসলেন। তাঁর স্বর হিম, কঠিন, বিস্বাদময়।

'আমরা কিন্তু ঐ ছোকরাকে দ্বিতীয়বার এখানে দেখতে পেলেই গুলি করবো।···তোর নিশ্চয় জানা আছে, এ বাড়ির সকলেই অল্প বিস্তর বন্দুকে রপ্ত। অন্ততঃ ঐ ঝোপের মধ্যে এক-আধটি উটকো বদমাইশকে খতম করবার হিম্মৎ আমাদের হবে।'

কথাগুলি বলেই তিনি তাঁর দুই মাংসল হাত এমনভাবে ঝাঁড়লেন যেন সদ্য সদ্য একজন অপদার্থ লোভীকে অবাধ তাচ্ছিল্যে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর গর্বিত দুই নীল চোখ নত্যর মুখে দুর্বোধ্য ভাষা পড়বার চেষ্টায়। তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর উচ্চারিত এই ভয়ঙ্কর শব্দগুলি নিদারুণ আলোড়ন তুলবে মেয়ের মনে এবং একজন যথার্থ হিতৈষীর বদান্যতায় তিনি তাঁর মেয়েকে শহুরে শেয়ালের খপ্পর থেকে রক্ষা করতে পারবেন। এখন—এখনই নরমস্বভাব নত্য ভেঙ্গে পড়বে মার কাছে এবং গোটা ঘটনাটাই খুলে বলবে। সঙ্গে সঙ্গে চেনা যাবে, কে ঐ বাহাদুরী ফালানো আগন্তুক !

নত্য কিন্তু জবাব দিলো না, যদিও বুকে তার ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। তখনো তার ভরাট স্তনের ভাঁজে রাগুসা রিপাব্লিকের বিরাট মুদ্রাটা ঘামে ভিজছে। অনেক কষ্টে সে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে নীরব থাকে। একটি গ্রামীণ পরিবারের চণ্ডাল রাগ কুমারীর স্বপ্নকে চূর্ণ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কোন কথাই সে তাই কবুল করবে না। মা বিড় বিড় করে চলেছেন, '···পাজি, নচ্ছার···ঐ সব ছাই পাঁশ—গেলা মানুষের সঙ্গে পীরিত !···খুব চিনি ওদের। মধু চুষে ফক্কা···'

কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো আসামী হলেও নত্য দ্রুত তার ভয়কাতর পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠে, বিস্ময় ও পুলকের সঙ্গে লক্ষ্য করলো যে,

রহস্যের কোন কিনারা খুঁজে না পেয়ে মার স্বরগ্রামে বিবিধ লয়ের অস্থির ওঠা নামা। ভদ্রমহিলার স্বর আর হিম কঠিন বা মিহি থাকছে না, মরীয়া বাতাসের মতন আছড়ে পড়তে চাইছে নিজের চারা গাছটার ওপর। নরমে—গরমে ঘুরে ফিরে সেই জিজ্ঞাসাঃ বল, সে কে? ঠিক কোথায় এসে দাঁড়ায়? আমাকে বল। আমাকে সব খুলে বল।

স্বাভাবিক বুদ্ধিতে নত্য টের পেলো, মা এখনো গোটা ব্যাপারটা ধরতেই পারেন নি। তপ্ত হেঁয়ালিতে খাবি খাচ্ছেন মাত্র। মিটারকে কোনদিন চাক্ষুষই করেন নি! কেমন দেখতে সেই যুবক, কি করে, স্বভাব চরিত্র কোন ধাচের, এ পরিবারের ধ্যান ধারণার সঙ্গে আদৌ খাপ খাবে কিনা—এইসব দরকারী প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে তিনি অসহায়; মা হিসেবে দায়িত্ব স্খালনের জন্য তিনি মরীয়া।

নত্য আরো বুঝলো, মা ব্যাপারটা বাবার কানে তোলেননি। বাবা সাধারণতঃ কোন ধোঁয়াটে জিনিস পছন্দ করেন না, তিনি চান হাতে-নাতে প্রমাণ। প্রমাণ না দিতে পারলে বাবার কাছে মা নিশ্চিত বিভ্রান্ত অপমানিত বোধ করবেন।

সুতরাং মার মুখে ঐ সব 'বন্দুক-টন্দুক ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। নিজের উদ্বেগে নত্য এখন নিজেই একটু একটু লজ্জিত। সুক্ষ ব্যঙ্গ ঝিলিক খেয়ে যায় তার পাতলা লাল ঠোঁটে।···সেই ঝোপটার গায়ে প্রতিদিন চক্রাকারে কত রঙ বেরঙের প্রজাপতি ওড়ে, পাখিরা শিষ দেয়; সন্ধ্যায় অভিভূত চাঁদের আলো চুইয়ে চুইয়ে নামে; ঐ ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে একদিন সে মুক্তির স্বাদ পাবে। ইস, মরে গেলেও মাকে সে ওর সন্ধান দেবে না।···

মেয়ের নীরবতা আল্পসের বরফের মতন, দিনের পর দিন—মা স্তম্ভিত! স্বতস্ফূর্ত হওয়া দূরের কথা, পেট থেকে একটা কথাও বের করলো না। এমন অভাবনীয় ব্যর্থতায় মার বুকের ভেতরটা হাহাকার করতে থাকে। চাপা গলায় দিন-রাত গজ গজ করতে থাকেন।

রান্না থেকে বড় ঘর, উঁকি মেরে আনমনা মেয়েকে দেখা, দুপ দাপ শব্দ তুলে বাগান মাড়িয়ে মেঠো পথটার ওপর ক্রুদ্ধ মুরগীর মতন ধুলো ওড়ানো—বুদ্ধিসুদ্ধি নেই মেয়েটার, একদম বুদ্ধু! শুকনো বতাসে গুমগুম আওয়াজ ভেসে আসে। তিনি ফিরে আসেন।

ক্রমশ মা বুঝলেন, না—এভাবে নত্যকে বশ করা যাবে না। প্রেম আবেগের এমন একটা স্তরে অবশ তাঁর নত্য, যেখান থেকে ভয় দেখিয়ে কিছুই আদায় করা সম্ভব নয়।

কথা আদায় করার জন্য নত্যর মা দ্বিতীয় অস্ত্র ছুঁড়লেন।—

হঠাৎ যেন থমকে গেল ঝড়। যে দাপট আরো অনেককাল ধরে চলবার কথা ছিল, হঠাৎ তা থিতিয়ে গেল। মা নেতিয়ে পড়তে পড়তে আচমকা নাটুকে ভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। না, নাটক নয়। তিনি ঝর ঝর ক'রে কাঁদছেন! মাকে এমন ক'রে কাঁদতে নত্য তার জীবনে কখনো দেখেনি। যে মা সংসারে কারুর তোয়াক্কা না রেখে সর্বেসর্বা, তার এমন রূপ অভাবনীয়। 'বোকা মেয়ের' সামনে দাঁড়িয়ে হাপুস-নয়ন। দো-টানায় পড়তে হয়, সত্যি সত্যি কাঁদছেন তো! কেবল চোখের জলে ক্ষান্তি নেই, মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে বিহ্বল ক'রে তুলছেন—গালে, কপালে, মাথায়, হাতে গুনে গুনে কয়েক ডজন চুম্বন বৃষ্টি। নত্য শিউড়ে শিউড়ে ওঠে, কোথায় যেন একটা ক্লেদস্পর্শ, ঠিক যেন কোথায়···। মেয়ের চোখে মা অসম্পূর্ণ, মার চোখে মেয়ে। এত সোনাজল এবং আদরের মধ্যেও সেই অপরিচয়ের বিষ কাঁটাটা খচ্ খচ্ করছে।···

মা ইনিয়ে-বিনিয়ে মেয়েকে তার সুখের ধারাবিবরনী দিচ্ছেন। সেই সব গোছা গোছা সুখ, নিশুত রাতে কুমারী মেয়েরা যাদের স্বপ্নে পরখ করে। ডাহা মিথ্যা হলেও ক্ষতি নেই, কথাগুলি তো সুন্দর, যেন সোনায় মাখানো। যারা বনে-বাদাড়ে লুকিয়ে চুরিয়ে পায়ে-গোড়ালিতে ভেজা মাটির গন্ধ মেখে গৃহস্থবাড়ির মেয়ের ঘরে উঁকি মারে, প্রলুব্ধ করে, তারা কখনো ভালোলোক হয় না! ওদের হাতে জীয়নকাঠি নেই, ওরা

নিজেরাই এক একটি মরণকাঠি। অমন লোকের সঙ্গে বেপাত্তা হলে সর্বনাশ যে কী চরমপর্যায়ে পৌঁছাবে, একমাত্র অন্তর্যামী জানেন। সে পলাতকা যুবতীকে নিয়ে শহরের এঁদো গলির মধ্যে ঘর ভাড়া নেবে, দিনে-রাতে মধু চুষে ঝাজরা করে ফেলবে ; তারপর এগিয়ে আসবে তার ইয়ারদোস্তরা। তারাও একেবারে ছিঁড়ে খাবে। এই হবে পরিণতি! বুঝলি ? বুঝলি ? মার হাঁ করা মুখের ভেতর ইস্পাতের শব্দ, চাপা গোঙানি, চেচাঁনি, শাশানি···।

তিনি নত্যকে আরো বলছেন—আমরা তোকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখি! এই পরিবারের জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে তুই হলি গিয়ে সেরা মেয়ে। আমরা সকলে মিলে খুব ভালো পরিবারের চমৎকার ছেলের সঙ্গে মহা ঘটা ক'রে তোর বিয়ে দেবো। গাইতে গাইতে সবাই গির্জায় যাবো। কী সুন্দর ক'রে সাজানো হবে তোকে। বিরাট উৎসব হবে।···ভুল করিস না বাছা! নিজের এমন সর্বনাশ করিস না।···বলতে বলতে তিনি কখনো জ্বলজ্বলে চোখে, কখনো ভুরু কুঁচকে মেয়ের মুখের দিকে তাকান।

এবারও বরফ গললো না, কিন্তু বৈলক্ষণ যে একেবারে নেই, বললে ভুল হবে। বরং নত্যর নিবিড় বিহ্বল চোখে হঠাৎ এক দমক আশঙ্কা উড়ে আসে। না, এমন 'পায়াভারী মেজাজে চললে তার প্রায় অপরিচিত 'পুরুষ'টি সত্যিই বিপদে পড়তে পারে। বলা যায় না, হয়তো এবার থেকে মা বাবাকে নিয়েই বন্দুক হাতে ঘাপটি মেরে বসে থাকবেন। ঝোপের কাছে শিষ দিতে দিতে ছায়ামূর্তি নড়ে চড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই 'গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম···'। যতভাবে, ততই মাথা গরম হয় নত্যর, মহা ফাঁপড়ে পড়ে যায় যেন। তার জন্য একটি তরতাজা প্রাণ শেষ হতে চলেছে—ভাবতেই আনমনা নত্য অস্থিরমনা হ'য়ে উঠলো। খুন খারাপির ব্যাপারে গ্রামের মানুষরা কবেই বা বাছবিচার ক'রে থাকে! তার উপর বাবা ও মা যদি একবার বন্দুক হাতে এককাট্টা হ'য়ে দাঁড়ান, সর্বনাশ-সর্বনাশ-সর্বনাশ। মা বরাবরই শহুরে ফিটফাট যুবকদের

সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন, যেন স্মার্ট যুবকমাত্রই শয়তান। তাঁর মতে, শহরের সঙ্গে গাঁয়ের সম্পর্ক দায়ে-কুড়ুলে। কোন মানে হয়? কতকাল তাঁর মেয়ে এমন পর্দানশীন হ'য়ে থাকবে? সে এখন যুবতী; তার একটা নিজস্ব ওম তৈরি হয়েছে না? আসল কথা, একটা রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটতে চলেছে। নত্যর প্রেমিক তো নিছক স্বপ্নের দূত নয়, জ্যান্ত আর শরীরী অর্থাৎ সে খুন হতে পারে।

মা যেমনটি চাইছিলেন, অবশেষে তাই ঘটলো।

উল্টোপাল্টা ভাবনায় অস্থির হ'য়ে নত্যর প্রত্যয় ও কাঠিন্য এককাট্টা নয়, সে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে নিজের ঘরে পায়চারি করতে থাকে। ফিটফাট বিছানা-পাতা চৌকি, দুটো কাঠের ভারী চেয়ার, চেয়ারের ওপর একটা অসমাপ্ত মাথার রুমাল—এইসব নিঃসঙ্কোচে এলোমেলো জড়ো-সড়ো ক'রে এক সময় সে কাগজ কলম হাতে টেবিলের ওপর ঝুকে বসলো।

কালিতে নিব ভিজিয়ে সে গোটা গোটা অক্ষরে লিখলো ঃ

হে প্রিয়, তোমার ওপর মৃত্যুর জাল ছুঁড়ে দেওয়া হবে। তুমি তো কিছুই জানো না, কতবড় ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করা হয়েছে তোমাকে খতম করবার জন্য।...লক্ষ্মীটি, তুমি কখনো এখানে এসো না। আমাকে দেখবার বাসনা ত্যাগ করো। এরা সব বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত।...

শব্দ ক'টা সাজিয়ে নত্য ঝোঁপটাকে কল্পনা করলো, যেটা আর স্বর্গ নয়, ভূতের আস্তানা। চুপ চুপ ক'রে ওখানে এসে ঢুকছে মৃত্যুর দূতেরা। একটা অস্পষ্ট সংকেত রিন্ রিন্ বেজে চলেছে—তার প্রেমাস্পদকে এরা আদৌ রেহাই দেবে না।...নত্য পাথুরে মূর্তির মতন। মায়ের পুরনো হুঁশিয়ারীটা ক্রমশই বাস্তব হ'য়ে নানান রন্ধ্রপথে তার হাড়পাঁজরে কাঁপন ধরাচ্ছে।

চিঠিটা শেষ ক'রে সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। কিছুক্ষণ ঐ অক্ষরগুলির মধ্যেই সে বুঝি সিঁটিয়ে থাকে। এরা গুরুত্বপূর্ণ, একটি মূল্যবান প্রস্তাব, যা শহরের মাইফেল থেকে ছিটকে আসা প্রেম—খলিফাকে বিপদের

বেড়াজাল থেকে রক্ষা করবে। চারিপাশের কূট সন্দেহ এড়িয়ে সে এক সময় কাগজটাকে টাঙিয়ে দিয়ে আসবে ঝোপের কাঁটায় এমনভাবে যাতে প্রেমিক প্রথম নজরেই ওটা আবিষ্কার করতে পারে। তখন টিমিয়ে জ্বলে উঠবে আলো, সে নীচু হ'য়ে বিশেষ প্রয়াসে জল বুদ্বুদের মতন অস্পষ্ট প্রতিটি অক্ষরকে উদ্ধার ক'রে অস্থির আবহে সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেবে। সিদ্ধান্ত একটাই—বিপদ ভয়ঙ্কর, পালাও পালাও···। বন্দুকধারীদের কড়ে আঙ্গুল দেখিয়ে চোখের পলকে হারিয়ে যাবে ছায়াটা। আর তখন জানালার সামনে ভূতগ্রস্ত নত্য মরীয়া হ'য়ে চেষ্টা করবে, তাকে শেষবারের মতন দেখতে। নিজের বুদ্ধির ওপর বিস্তৃত আস্থায় ক্ষণিকের জন্য নত্য যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যঙ্গ করতে চায় তার মার ক্রুর চোখ ও হিস্ হিস্ কান্নাকে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভয়। বস্তুত সে তো তার মনের মানুষটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেই না। সে কি ভয়ে-সঙ্কোচে জড়োসড়ো না, ভীষণ বেপরোয়া? তার স্বরে আবেগ আছে, গাম্ভীর্য আছে, আবছা অন্ধকারে প্রেমাচ্ছন্ন সেই মানুষ কখনো বিষাদময়, কখনো তীব্র টগবগে। সে কেমন? যদি সে বেপরোয়া হয়, নত্যর এই হুঁশিয়ারী পাঠ ক'রে সকৌতুকে হেসে উঠবে। তার চোখা আর চালাক রক্তে আরো দোলা লাগবে। প্রথম অবস্থায় মেয়ের মা-বাপের এমন দাপাদপি তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং এতে যারা পিটটান দেয়, তারা কাপুরুষ, নারীর প্রেমের যোগ্য নয়। বরং তার পরিক্রমা আরো বাড়বে, অসংখ্যবার সে তার পরিক্রমা সারবে বন্দুকের উদ্ধত নলকে উপেক্ষা করে।

আর সে যদি নত্যর হুঁশিয়ারীকে গুরুত্ব দেয়, সেটাও কম বেদনাদায়ক হবে না। নিছক প্রাণের ভয়ে এমন কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণকে ত্যাগ করা! সে রকম্ হ'লে সে তো আর আসবে না। এই সব সন্ধ্যা রাত্রিগুলিতে আর জেল্লা থাকবে না, হাজার কান পাতলেও আর ভেসে আসবে না সেই শিষ, চাপা মিষ্টি সম্ভাষণে কেউ তাকে উত্তেজিত করবে না ঘর ছাড়তে···শীতকাতর মুর্গীছানার মতন কেঁপে উঠলো নত্য।

বিশাল আধুনিক দুনিয়ায় কিভাবে যে অগনন মানুষ বেঁচে বর্তে আছে, নত্যে তার কিছুই জানে না। তার কাছে আগন্তুক ঐ পুরুষটি আসলে যে কে, এ প্রশ্নের জবাব সে কখনো খোঁজেনি। কেবলই তার স্বপ্ন পরিস্ফীত হতে হতে তাকে আরো অসহায় ও টালমাটাল করে তুলেছে। এখন মনে হচ্ছে, সে যদি তার ঠিকানা জানতো, চিঠিতে সব জানিয়ে দিতো খাঁটি নির্ভেজাল প্রেমে আকুতি বড় বুদ্ধিহীন, বড় বিপজ্জনক!

মাথার মধ্যে একটা চরকি অনবরত বোঁ বোঁ···উপায় নেই, উপায় নেই, উপায় নেই···মৃত্যুর গড়ান ঢালু বেয়ে একটার পর একটা ছবি আসছে, যাচ্ছে। নত্যে কিভাবে নিস্পৃহ থাকতে পারে? হয়, সেই পুরুষ নিহত হবে অথবা, সে আর কোন দিন এসে দাঁড়াবে না এই জানালার সামনে। দুটোই অসহ্য!···

কালপুরুষ অনেকগুলি দিন গ্রাস করে নিয়েছেন। আজ, এতকাল পর ঐ ক'টি মুহূর্তের কথা কল্পনা ক'রে আমার মনেও আবেগের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে, যদিও যুক্তি শানিয়ে আমি সর্বদাই অবাস্তব,অপ্রকৃত নিছক আবেগকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে থাকি। প্রেমের লয়তালে অনেক প্রয়োজনীয় ও খামোকা ভাবনা নিজের নিজের মহিমায় খরশান হ'য়ে ওঠে। হরেক প্রমাদ ও সুখ এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে এরাই তো দু'টি হৃদয়কে গেঁথে ফেলে। আমার কোন সন্দেহই নেই, মিটার ও নত্যের ভালোবাসায় কোন খাঁদ ছিল না; এক যুগ অজ্ঞাতবাসের পরও তারা বোধহয় পরস্পরকে ভুলে যেতে পারতো না। অথচ, কোন রকম তামসিক আনন্দ বা, মহা উল্লাসময় নটঘটির সন্ধান পাচ্ছি না। মাকুর মতন একই ভাবনায় ডুবে থেকে নত্যা যতখানি মিটারকে নিয়ে মশগুল, নত্যকে নিয়ে মিটারও ততখানি। রিলিফক্যাম্পে হাজারো ব্যস্ততা, হৈ-হৈ হাঁকাড়, চোরাচালানের শংকা ইত্যাদি সত্বেও আপন নির্জনতায়

মিটার দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল : ঐ কন্যাকে আমি তুলে নিয়ে আসবোই!

সে অভিজ্ঞ। দফায় দফায় অনেক দেখেছে, এখনো পুরো মৌজে ভাঁড়ে মাল চেখে টলতে টলতে উত্তেজক গান গায় এবং সেই কারণেই যুক্তি শানিয়ে সে ভেবেছে, জীবনকে নির্মল নকশাদার, সুন্দর ও সুখময় গড়ে তুলতে হলে অমন একটি সঙ্গীনীই দরকার। নত্যর প্রেমের পিছনে কোন বোলচাল, যুক্তি বা বুদ্ধি নেই, কিন্তু মিটারের আছে।

কিন্তু দুর্ধর্ষ প্রেম-প্রীতি প্রণয়ে মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের অহরহ বিবাদ। মিটারের মস্তিষ্ক তার হৃদয়কে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চুপ রাখতে বলছে, নত্য পেরুনিকের সঙ্গে তোমার এই যে স্বতঃপ্রণোদিত প্রেম-প্রেম ভোমরার ডাক, তা বিপজ্জনক ও পরিণতিহীন। এখনো সময় আছে, আর ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে ও তল্লাটে যেও না। গলার শির ফুলিয়ে যাই বলো না কেন, তোমরা দু'জন দুই মেরুর। এ ধান্দা ত্যাগ করো বৎস।

কিন্তু মন বড় বেয়াড়া, পাকাপোক্তভাবে সে যাকে আশ্রয় দিয়েছে, কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। বুদ্ধির হুঁশিয়ারী পাত্তা পায় না; অবিশ্যি পাত্তা না দিলেও একটা ধন্ধ কিন্তু থেকেই যায়—নত্য পেরুনিকের প্রতি এই যে তার টান, এটা কি নিছক মোহ না, প্রেম? যতকাল তার রাজার মতন মেজাজ ছিল, অনেক মেয়ে তার কাছে এসেছে। আজ তার মেজাজ অন্যখাতে বইছে বলেই হয়তো এমন বিড়ম্বনা।

মনের ইত্যাকার ইতস্তত খটকায় যুক্তি লাফিয়ে ওঠে। কেন বাপু ফুলের মতন নিষ্পাপ মেয়েটার বারোটা বাজাচ্ছো? তোমার কি বিবেক-টিবেক বলতে কিছু নেই? নত্য তো তোমাদের সেই সব ঢুলুনীদের কেউ নয়, যারা রোজ ধূপধুনো দিয়ে বসে থাকে নিত্যি নতুন নাগর পাকড়াবে বলে। দেহ-টেহ দূরের কথা, কোন প্রেমিক ছেলের কথা ভাবতে গিয়েই সেই ভবিষ্যযুক্তা সরল মেয়েটা শিউরে ওঠে!

সঙ্গে সঙ্গে মন চাপা হিংস্রতায় নেচে ওঠে,—খোদা মেহেরবান, এই

জন্যেই তো ওকে আমার চাই। কে বলে, আমি ওকে নাচাচ্ছি'? যে মিটার লোচিন মেয়েমানুষ ছানাছানি করতো, সে এখন জাহান্নামে। এ অন্য লোচিন। প্রেমিকার জন্য আমি এখন চাঁদমারির লক্ষ্য হতে পারি। যত সময় গড়াবে, ততই তুমি দেখবে, মিটার লোচিন ভেরোভিক বদলে যাচ্ছে ; সে আর চালাকি করে না, মালের আসরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না, হরেক ভোজবাজি দেখিয়ে যে কোন মেয়েকে ছেনাল বানবার মতলব তার নেই। সে বেচারির হাড়সর্বস্ব শরীর এবং বিশাল হৃদয় জুড়ে একজন মাত্র প্রেমতুলালী, নাম যার নত্য। নত্যকে যদি সে না পায়, তার মাথায় আবার চাগাড় দিয়ে উঠবে সেই সব পাপ, পৃথিবীকে যারা নরকের দুয়ারে ডিগবাজি খাওয়ায়।...আমি এখন আদত প্রেমের নেশায় বুঁদ ; একা থাকতে খুব ভালোবাসি ; এমনকি কারুর পারিবারিক উৎসবেও যোগ দিতে নারাজ। দেখছো তো, কাঁহা কাঁহা মুলুকে চষে বেড়ানো লোকটা কেমন ধীরে ধীরে আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠছে। আমার ভড়কিময় অতীত নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর কপচানি বিলকুল না পছন্দ। আওয়াজ, আওয়াজ—চারদিকের আওয়াজ থামিয়ে আমাকে চুপচাপ থাকতে দাও, চুপচাপ। ক্যাম্পের সামনে ময়দানে দাঁড়িয়ে একটা পেটমোটা গাধা প্রতিরাত্রিতে চাঁদের দিকে মুখ তুলে যখন প্রচণ্ড চিৎকার তোলে, আমি নত্যাদের বাগান থেকে একজন প্রকৃতই নেশা-ঘোরের মতন টলতে টলতে ফিরে আসি। মেহেরবানী ক'রে আমাকে সন্দেহ করো না।

এরকম ভাববার কোন কারণ নেই যে, লোচিন হুবহু এই সব কথাই ভাবছিল। এটা আমার সরল অনুমান, যার সামিল হতে পাঠক-পাঠিকাদের আহ্বান জানাচ্ছি। মানুষের ব্যক্তিত্ব, মন এক এক সময় এক এক রকম। স্রেফ অনুমানে সারতে হয়।

পরিণতবুদ্ধি লোচিন নিজের সঙ্গে বহুক্ষণ যে লড়াই চালিয়েছিল, সন্দেহ নেই। জীবনটা সে তরতর ক'রে পার হ'য়ে আসেনি বা কখনো

অপরের কাঁধের ওপর ভর ক'রেও থাকেনি যে বিলকুল নিজেকে ভবিতব্য নামক বাতাসে ভাসিয়ে রাখবে।

মনে মনে সে যতই তড়পাক, তার বাস্তববুদ্ধি কখনোই শূণ্যতে গিয়ে দাঁড়ায় নি।

তবে কিনা হৃদয়গত ব্যাপারে সে এই প্রথম বড় দুর্গম পাহাড়ী পথে, এক পা এক পা ফেলে আর ভয়ে ভয়ে পিছু পানে তাকায়।

সে টের পাচ্ছিলো, এই প্রেম ও অভিসারে অনেক দুঃখ ও যন্ত্রণা অপেক্ষা করে আছে। হয়তো এখনো কেউ জানে না। যদি জানতে পারে, চিত্তির—গেঁয়ো গোঁয়ারদের দাপাদাপি, রামোঃ! মিটার লোচিনের সঙ্গে নত্য পেরুর তফাৎ কতখানি? অনেক—অনেকখানি। একেবার ধোঁয়ায় থোঁয়াকার। সুতরাং সেই অতিকায় প্রশ্নটাই যেন গরম তেলে চড়বড় ক'রে ফুটতে লাগলো, নত্য কি তার প্রেমিক যুবককে কখনোই পূর্ণভাবে পাবে না? অথবা মিটার কি এবার প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি লাফিয়ে পড়বে নত্যর ঘরের ভেতর?

মিটারের অতীত এবং ভবিষ্যৎ যাঁরা জানেন, যাঁরা তার ঘামে ভেজা স্থিরপ্রতিজ্ঞ মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব অজানা নয়।

লোচিনের মেজাজ যদি খিঁচড়ে থাকতো, যদি সে এক গণ্ডুষে খোঁদল খোঁদল বোতলগুলি শেষ ক'রে দিতে চাইতো, তা হলে তবু নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু লোচিনের মুখাবয়বে ঈষৎ শংকা মিশ্রিত দৃঢ়তা, যার অর্থ সে ঝুঁকি নেবেই।

ঝুঁকি সে অনেকক্ষেত্রে নিয়েছে, যার জীবনটাই যেন দক্ষযজ্ঞ, না হয় আর একবার সাঙ্ঘাতিক ও দুর্দ্দান্ত হ'য়ে উঠবে। হাতে তার হুঁক লাগানো একটা শক্ত দড়ি—এইটে বেয়ে বেয়ে সে আজ রাতে বিমূঢ় নত্যর ঘরে ঢুকে পড়বে। তার অনাঘ্রাত যৌবনকে ভালবাসার অসহ্য উষ্ণতায় আজই সে গ্রাস করবে। বুটের ডগায় একবার হুঁকটা ধাক্কা

লাগাতে ঝংকার উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে দড়িটাকে গুটিয়ে গুটিয়ে ছোট গোলাকার ক'রে ফেললো সে। তাকে এখন যথার্থই গোঁয়ারগোবিন্দ গেঁয়ো গেঁয়ো দেখাচ্ছে। শান্তিপর্ব শেষ।

সন্ধ্যা নামবার কিছুক্ষণ আগে থেকেই বাহ্যিক হুড়োহুড়ি ধূমধাম থিতিয়ে এলেও ভেতরে ভেতরে অন্য একটা চাঞ্চল্য এই শহরটাকে উতলা ও নাজেহাল ক'রে ফেলে। আড্রিয়াটিকের অনুক্ত গোঙানি এবং আলস্যের বুক-ঘামানো কুয়াশার জাল রাজত্ব বিছিয়ে বসে ত্রিয়েশতির বুকে।

নিষ্প্রাণ রিলিফ ক্যাম্পে বড় জাবদা খুলে হিসেব মেলাচ্ছেন বড়বাবু, অবশ্য মেজর টুডির পক্ষে এখন ঘরের মধ্যে থম্ মেরে বসে থাকাটা অকল্পনীয়। এই কিছুক্ষণ আগে হাফ্ ডজন ডিমভাজা খেয়ে বেরিয়ে গেছেন—এতক্ষণে নির্ঘাৎ ক্লাবে ঢুকে আপন আহ্লাদে উরু চাপড়াচ্ছেন।

একমাত্র মিটার লোচিন ক্যাম্প ছেড়ে, ক্লাব ছেড়ে, শহর ছেড়ে হন হন হেঁটে যাচ্ছে শহরের দিকে। তার পায়ে কাপড়ের জুতো, হাতে হুঁক-লাগানো পোক্ত দড়ি, যেন সে ফাঁদ পেতে পাখি ধরতে চলেছে। দু'পাশে পাকা ফসলের অনর্গল কথকতা শুনতে শুনতে বার কয়েক মোড় নিতে হলো তাকে। নেশার মতন টান, অগ্রাহ্য ক'রে বাপের অসাধ্যি। এক বোতল দিশি মাল সহ কোন জাঁহাবাঁজ মেয়েছেলে তার পথ জুড়ে দাঁড়ালেও তার আমীরীমন টলবে না। রাস্তার আলোগুলি কুলুংগীতে বসানো টিম টিমে প্রদীপ ; তবু যদি কেউ তার মুখের দিকে তাকায় তো মুশকিল। সে যেন একটা দৃশ্যের টুকরো টুকরো অংশ হ'য়ে নিজের মহিমাকে অপ্রকাশ্য রাখতে চাইছে। কিছুক্ষণ তার পিছু পিছু একজন বাতিকগ্রস্ত বুড়ো আসছিল। কাশতে কাশতে এক সময় সে কোন মোড়ে হারিয়ে গেল। পাহাড়তলির হৃদপিণ্ডে এখন যাদুর আসর, সকলের উড়ু উড়ু মনকে তুক ক'রে রেখেছে। ভিজে দেশলাই কাঠির মতন

নেতিয়ে আছে আলোশূন্য মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম। কেবলমাত্র গ্রাম্য চার্চে ঢং-ঢং-ঢং···।

কারুরই হয়তো খেয়াল নেই, লোচিনের হাতে সাপের মতন পাকানো দড়ি। রিলিফ আফিসার এখন দড়ি হাতে যাচ্ছেন কোথায়? —বেশ কৌতুকময় প্রশ্ন। বড় চুপি সাড়ে, যেন উন্মনা হ'য়ে হাঁটছে লোকটি। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়, লড়ুয়ে মোরগের মতন তার ছিপ ছিপে শরীর খুব টান টান।

এবং ঐ তো রণক্ষেত্র।

ঝোপঝাড়, ফুলের কেয়ারি, ঝুমকো-ঝামকা লতা-পাতায় ঢাকা পেরুনিকদের বাড়িটা তো লড়াই বাধাবে বলেই মুখিয়ে আছে। চাঁদের আলোয় হাস্যোজ্জ্বল সুন্দরীর মতন এই আশ্রমপ্রতিম আবাস। নির্দিষ্ট ঝোপের মধ্যে ঢুকে দূরের দিকে চেয়ে গুটিকয়েক প্রশ্ন এবং তাদের সঠিক উত্তর যেন খুঁজে নিল মিটার।

এরপর তাকে কিছু টুকিটাকি কাজ সারতে হলো। কোন কাজটাই টুকিটাকির পর্যায়ে নয়, কিন্তু এমনভাবে করলো যেন সে এ সবে অভ্যস্ত। গ্রামের কোন লোক এ সময় তাকে এখানে দেখলে ভূত-টুথ ভাবতে পারে এবং সেই ঘোর ভেঙে যা'ওয়াটাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রথমত, মিটার একটি ছোট্ট ঢিল তুলে তাক ক'রে মারলো নত্যার জানালার দিকে—ঢিলটা জানালা গলে নীচে পড়লো। ঘরের আলোটা কাঁপছে অর্থাৎ ঢিপ ঢিপ বুক নিয়ে নত্য ঘরে রয়েছে। নিশ্চিন্ত।

না, এই মুহূর্তে কোন কলরোল উঠলো না।

আবার পরিকল্পনামাফিক সক্রিয় হলো লোচিন।

দ্বিতীয়ত, সে তার ঠোঁটদুটোকে সরু ক'রে শিষ দিয়ে উঠলো। থেকে থেকে বার বার ঝিম ঝিম রাতকে বিভোরভাবে অবশ রেখে। এটা যে কোন পোকা-মাকড়ের ডাক নয়, বোঝা যায়; বরং ঐ শব্দে

শৈশব-কৈশোরের জগত জেগে উঠতে থাকে ; তবু তো কারুর গ্রাহ্য নেই।

তৃতীয়ত, মন্দিরে যেমন প্রণামী ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তেমনি কায়দায় দড়িতে বাঁধা হুকটা সে জানালা তাক ক'রে ছুঁড়ে দিলো। প্রথমে মনে হয়েছিল তার এই প্রয়াস হাস্যউদ্রেককর। কিন্তু তা নয়। যেন স্বপ্না-দেশে পাওয়া দক্ষতা—হুকটা ঠিক ঐ দূরের জানালার একটা কপাটে গেঁথে গেল। বার দুয়েক টেনে দেখলো, পোক্ত দড়ির কঠিন বাঁধন—একটি শক্তিশালী ঘোড়াকে বেঁধে রাখাও অসমীচীন নয়।

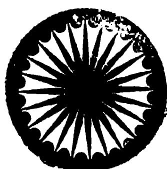
চতুর্থত, এর পরই কিছুক্ষণের জন্য বর্তমান পটভূমিতে নির্বান্ধব নিরাত্মীয় লোচিন কেমন যেন ঈষৎ নার্ভাস ও উতলা হয়ে ওঠে। তার হাতের তালুতে জমছে ঘাম। তার দুই চোখ তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজে, কেউ তাকে খেয়াল করছে কি না! অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আবিষ্কার করতে পারলো না একজোড়া অগ্নিস্রাবী বর্ষীয়সী চোখ।

এরপর নিজের নার্ভাস, থতোমতো ভাবটা কাটিয়ে উঠে মিটার লোচিন যা করলো, তা বড় রোমহর্ষক—দড়ি বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলেছে যেন একটা ঝুলন্ত মাছ! ক্রমশই একটু একটু উঁচুতে, লক্ষ্য একটাই—নত্যদেবীর খোলা জানালা। এগিয়ে যেতে যেতে এক চিলতে চমকে তার হুঁশ হলো, আশ্চর্য, নত্য জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নেই কেন? সন্দেহ জাগলেও দড়ির খর খরে ছোঁয়া থেকে হাত সরিয়ে নেবার পাত্র সে নয়। অপেক্ষাকৃত সাবধানে ঘাড় উঁচু করে সে এগিয়ে চললো। কোথায় যেন জলপড়ার একটা ঝির ঝির শব্দ। দূর ফোয়ারার ছিটও এসে লাগছে। মাটি থেকে কয়েকহাত ওপরে ভাসমান লোচিন খুব চেষ্টা করছে জানালাটাকে থাবার মধ্যে পেয়ে যেতে। এই তো,··· থাবা মেরে জানালার তলা চেপে হাঁ ক'রে দম নিলো, বড় বড় চোখ মেলে তুলে সে দেখবার চেষ্টা করলো ঘরের ভেতরটা এবং সঙ্গে সঙ্গেই নজরে এলো আততায়ীর ছায়া!

দুর্দমনীয় স্নায়ুর চাপে সে বুঝতেই পারলো না, আততায়ী নারী না,

পুরুষ? কেবল থর থর আতঙ্কে সে দেখলো, যেন ঘোড়ার রেকাবে পায়ের ঠোক্কর দিয়ে কে এক বন্দুকধারী ঢুকে পড়েছে এই ঘরে এবং বিবর্ণ নত্যকে পিছনে ঠেলে তুখোড় সাহসিকতায় বন্দুক তাক করেছে লোচিনের কপাল লক্ষ্য করে। লোচিন নিজে যদি তখন একটু স্থির দেখতে পেতো, তার নিজের চেয়ে আততায়ীর ভয় ও উত্তেজনা কিছু কম নয়! বন্দুকের নলটাই ঠক ঠক করে কাঁপছে; লোচিনের পাল্টা তেজীয়ান হুঙ্কারে বন্দুকটা অনায়াসে হস্তচ্যুত হতে পারে। কিন্তু তেমন তুরঙ্গম ঘটনা ঘটাবার মতন মানসিক শক্তি ছিল না মিটার লোচিনের। সে 'ও গড' এই অস্ফুট আওয়াজ তুলে দুই শূন্য হাতে বাতাস ঠেলে মারলো উল্টো ডিগবাজি। নরম মাটির ওপর হামাগুড়ি দিলো কয়েক সেকেণ্ড এবং তারপরই ছুট-ছুট-ছুট...।

একেবারে সদর রাস্তায় উঠে আসবার পর লোচিন দু'বার গুলি বর্ষণের শব্দ শুনতে পেলো। সে পিছন ফিরে না তাকিয়ে গতি আরো বাড়িয়ে দিলো।



পাহাড়তলীর হৃদপিণ্ডে প্রহর কয়েক কখনো উত্তেজনায় লালে লাল, কখনো হতাশায় পাঁশুটে লোচিন ভেরোভিক।

এই প্রথম সে এক বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকতে গিয়ে বন্দুকের নল দেখে পালিয়ে এলো।

রাতে ঘুম এলো না।

দিনে কাজে গেলো না।

ভর দুপুরে টো-টো-টো।

দুটি পাহাড়ের অন্তবর্তী নির্জন উপত্যকায় খরস্রোতা হিল্ হিলে নদীর জলে কুটি কুটি অনেক কুটো ভাসালো।

রোগা শরীরে তাকে তখন যথার্থই অসুস্থ দেখাচ্ছে। একমাথা নিস্তেল চুল এলোমেলো। আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে সে বুঝি পাগল পাগল। নীল অসীম আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তার আবেগ আরো বাড়ছে; আবেগ ও স্বপ্নের আঁচল ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে বুদ্ধির হুঁশিয়ারী।

আমি মিটার লোচিন, চোরাচালানের নকশা যার হাতের পাতায় আঁকা, যে মানুষকে পুতুল বানিয়ে নাচায়, মেয়েমানুষ যার কাছে এতকাল একটা সমস্যাই ছিল না, যে বার বার হরেক বিপদ টপকে টপকে এসেছে, কাল রাতে সে-ই কিনা এক দো-নলা দেখে পড়ি মরি তফাত্ হটে এলো। ছিঃ লোচিন! ছিঃ!

খুবই বিশ্রী ব্যাপার! খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা!

অফুরাণ অকৃপণ সাহসিকতায় ভর ক'রে উড়তে উড়তে এমন আকস্মিক পদস্খলন ও পরাজয়কে মেনে নিলে নিজের কাছেই আমি সারাটা জীবন উপহাসের পাত্র হ'য়ে থাকবো।

কি করা যায়—কি করা যায়…!

কি আর করবে সে?

এমন কোন ঝকঝকে উপায় তার জানা নেই, যার সাহায্যে ঝটপট মেয়েটাকে বল্গা-ছেঁড়া করা সম্ভব। বরং কেমন যেন ছাই সে নিজেই পৌরাণিক প্রেমিকের মতন আরো নেতিয়ে পড়ছে। তার যদি একটা ঘোড়া থাকতো—সশস্ত্র সওয়ার হ'য়ে জোর-জবরদস্তির মহড়া নেওয়া যেতো। অবিশ্যি তার মেদহীন লিকপিকে শরীরে…।

আদিতে সন্ধ্যা ঘনালেই লোচিন সাহেব ঘুর ঘুর, বিলকুল অভ্যাসের বাধ্যবাধকতা মেনে চলেছে যেন, নত্যদের বাড়ির কাছাকাছি যায় এবং ঝোড়ো বাতাসের মতন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিরে আসে।

নত্যসুন্দরী তার অভিবাবকদের পূর্ণ হেফাজতে—ঘরের জানালা বন্ধ।

কে জানে, কেউ হয়তো অন্ধকারে বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে। এতটুকু এলে বেলে অসতর্কতা, অস্থিরতা দেখালে আর জান নিয়ে ফিরে যেতে হবে না। এমন গেঁয়ো গোয়ারগোবিন্দ পরিবারও আছে এই অমায়িক দুনিয়ায়।

চোখের সামনে জানালা বন্ধ। সর্বৈব ঢাকা পড়ে আছে অন্ধকারে। কঠিন জালিয়াতি বা, মরমী প্রেম—কারুরই ঠাঁই নেই।

কি করছো তুমি নত্য? সপাটে ঐ জানালা খুলে আলোর সামনে এসে দাঁড়াও। তরতরিয়ে নেমে এসো আমার কাছে। তারপর দুনিয়ার সব সুখ, রোমাঞ্চ আমরা দু'জনে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নেবো।···

দেখা দাও। আমি যে এসে এসে রোজ ফিরে যাচ্ছি।

লোচিন তীক্ষ্ণ শিষ দেয়, ছোট ছোট নুড়ি তুলে ছুঁড়ে মারে; তবু সাড়া জাগে না।

রাগে-দুঃখে মাটিতে আঁচড় কাটতে থাকে লোচিন।

একদিন, দু'দিন ক'রে দশদিন চলে গেল। প্রতিটি দিন নরক এবং সর্বক্ষণ মাথার ভেতর ঝিম ঝিম রেশ এবং পরাজিতের আত্মগ্লানি।

এগারো দিনের সন্ধ্যায় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। আবার সেই কস্তুরীমৃগীর গন্ধ বয়ে আনলো তারই এক চটুল স্বজাতি।···

স্বগত বিষাদে ভরসন্ধ্যায় তখন লোচিন নিজের বিছানায় আধশোয়া। এক রকম যেন ঘুষি ও চাপড় মেরে মেরে জানালা-দরজাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে সে। আজ আর সে বের হবে না। গত ক'দিন যাবৎই তার সর্পিল চলাফেরায় ঢিলেমি এসেছে; রহস্য ও রোমাঞ্চ যখন থিতিয়ে যায়, তখন একজন যুবকের অবস্থা বৃদ্ধেরও অধম। বৃদ্ধ তবু অনিবার্য বিদায়ের আশঙ্কায় চতুর্দিক দৃক্‌পাত করে আর হতাশ যুবক চায় অপরিণত ক্ষণে নিঃশব্দে মুছে যেতে।

কলঘর থেকে ঘুরে এসে দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে

কিছুক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইলো লোচিন। তারপর হেঁচকি তোলা ও ধ্যাননিমীল চোখে বুঁদ হ'য়ে থাকতে সে বোতল-গেলাস নিয়ে বসলো।

বোতলের পেটটা মোটা, গেলাসের মুখটা সরু ; এতকাল এদের সমন্বয়ে ছিল যত কলরব ; এখন ওরাই উপহার দিচ্ছে টলটলে নীরবতা। একেই কয় হৃদয়াবেগ।

সাধারণত ঘরে বসে লোচিন বড় একটা ছিপি খোলে না, দল বেঁধে মাল খাবার জন্য অনেক বার রয়েছে ত্রিয়েশতি শহরে। মিটার লোচিন আর তাদের ঠিকানা মনে রাখতে চায় না।

হৈ-হুল্লোড়, বন্ধু-বান্ধব অনেক করেছে ; আর নয়।

একের পর এক চুমুক সে ক্রমশই অদ্বিতীয় হয়ে উঠছে। শিরা-উপশিরায় তুলকি চাল। চোখ টকটকে লাল। ভস্মমাখা বিষাদে যা কিছু বিস্বাদ, তাই এখন কাম্য। দৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক সবকিছু ঘষা কাঁচের মতন ঝাপসা। হেঁচকির হ্যাপা সামলাতে গোটা শরীরটাই ঝাঁকানি খাচ্ছে থেকে থেকে।

নত্য মানেই বন্দুকেই ভয়! অসহ্য!

আমি ওকে তুলে আনবোই। খানিকক্ষণ থমকে থমকে শপথ উচ্চারণ করে লোচিন। সরু গোঁফের তলায় এক চিলতে হিংসার্ত হাসি তির তির কাঁপতে থাকে। আবার পর মুহূর্তেই হাসি থেমে যেতে সে এক থমথমে মুখ বোকচন্দর।

এমন সব ভাবাবেগে লোচিন যখন বেসামাল, দরজায় কে যে টোকা দিতে শুরু করেছে।

প্রথমে অবহিত হয়নি লোচিন। খেয়াল হতে মুখবিকৃত করে। নিশ্চয় চেনা-জানা কেউ ; এক-আধ গেলাস গুনাগার দিতে হবে!

তবে টোকা দেবার ধরণটা বেশ নরম, বেশ গোপনীয়। টুক—টুক—টুক···!

বিরক্তির সঙ্গে উঠে গিয়ে কপাট খুলে চমকালো লোচিন। মালের

প্রভাবে নিশ্চয় তার এমন ঘোর আসেনি যে মেয়ে ও পুরুষের প্রভেদ বুঝবে না।

মুখে সলজ্জ খুশির ঢঙ ফুটিয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে জনৈকা অপরাচিতা যুবতী।

আমার ঘরে, এ সময়ে নারী কেন? নির্জন সন্ধ্যায় উদাসীন বর্বর পুরুষের সামনে তুমি কেন সুন্দরী? যুবতীর চোখে কিন্তু কোন ধাঁধা নেই, সে সপ্রতিভা, একমাথা কোঁকড়া চুল দুলিয়ে বললো, 'আমি কি মিটার লোচিন ভেরোভিকের সঙ্গে কথা বলছি?'

নাটকীয় ভঙ্গীমায় প্রথম জিজ্ঞাসা। এও বুঝি চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য।

এখনই ঘটবে ফ্ল্যাশকাট বা মনতাজ।

'আপনার অনুমান যথার্থ। কিন্তু আপনি?'

'আগে ভেতরে ঢুকতে দিন, তারপর বলছি।'

অপ্রতিভ লোচিন পথ ছেড়ে দেয় এবং সেই মুহূর্তে অন্তরের অন্তস্থল থেকে সে টের পায়, এই যুবতীর আগমন নিরর্থক নয়—একটা সুঁতো ছেঁড়া ঘুড়ি ফিরিয়ে দেবে বলে ও এসেছে। দুর্গন্ধযুক্ত নির্গত শ্বাস গোপন করতে করতে একটা কুর্সীর দিকে ইঙ্গিত করে লোচিন।

যুবতী কিন্তু চট করে আসন নেয় না। তার কৌতুকী দৃষ্টি ঘুরতে থাকে এ ঘরের এক কোন থেকে অন্যকোন অব্দি। ঘর তো নয়, যেন জঞ্জাল; সেই জঙ্গলের মধ্যে টাঙ্গানো লোচিনের গুটিকয়েক মূল্যবান পোশাক ঝিকিমিকি রোদ্দুরের মতন। দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে স্থিরবদ্ধ হয় গৃহস্বামীর ওপর! বিলকুল টলমল চাল চলন। চেহারার মধ্যেও এমন কিছু নেই, অভিজ্ঞ মেয়েমানুষকে যা চমকে দিতে পারে। ক্যামেরার লেন্স পাতলে ওর ভেতর কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু আকর্ষক কিছু নেই, কিচ্ছু নেই।

লোচিন আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি?'

অসমান দাঁতে মিষ্টি অসমতল হাসি তুলে সে বললো, 'আমি জোন্দাক, নত্য পেরুনিকের বান্ধবী।'

খাটের বাজুতে হাত রেখে টাল সামলাতে হলো লোচিনকে। তার নেশাগ্রস্ত কপিশ চোখেই মশাল জ্বলে উঠলো বারেকের জন্য। মিলে গেছে! এক চিলতে চকিত স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের শুভ পরিণয়। লোচিনের বুকময় সেই সুরভাঁজা। গুটি গুটি সে যেন এগিয়ে যাচ্ছে নত্যর জানালার দিকে, সর্বাঙ্গীন প্রাপ্তির আশায় দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দু'হাতে নরম শরীরটা তুলে নিয়ে দিক-বিদিক হারা, ডিঙ্গি মেরে মেরে নদী পার হচ্ছে, আল্পস পার হচ্ছে। চারপাশে প্রকৃতির কত ঝাঁক! আর কেউ নেই তাদের উর্ধ্বশ্বাসে তাড়িয়ে বেড়াবার। একদল অশ্বের হ্রেষাধ্বনি তার রক্তে পলাতকের উৎসাহ এনেছে।

জেন্দাকা কৌতুকময় তীক্ষ্ণস্বরে বললো, 'শুনছেন, আমি নত্যর বান্ধবী। আমার নাম জেন্দাকা।'

লোচিনের চোখে মশাল দুটো নিভে গেল। তার কপালে ফুটে উঠছে একটা ত্রিশূল।

সে কি নেহাৎ নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে? না, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অপরিচিতার অপরিচিত গন্ধ এসে নাকে লাগছে। সন্দেহ ও অচেতনতার স্তর থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার আপ্রাণ প্রয়াসে সে প্রথমেই আবিষ্কার করলো, ছোটখাটো চেহারার জেন্দাকারের কাঁধে ঝুলন্ত একটি ক্যামেরা নেমে এসেছে ওর মাংসল নিতম্ব অব্দি। ক্যামেরা কাঁধে মেয়েমানুষ মিটার লোচিন জীবনে খুব বেশি দেখেনি।

কিন্তু জেন্দাকাকে এ অঞ্চলের অনেকেই চেনে। আদ্যিকালের বুড়ো থেকে কাঁচ-চোখ শিশু অব্দি। কমদামী ক্যামেরা নিয়েও ফটোগ্রাফিকে যে একটা আর্টের পর্যায়ে তোলা যায়, জেন্দাকা তা প্রমাণ করেছে। হুট মুট এখানে-সেখানে। এ পাহাড়ের কোল ছেড়ে ঐ নদীর তট ভূমিতে। কোথাও সুস্থ সক্ষম পাইনের ঝাঁক, কোথাও এলোহি ঝড়ের

মুখে হা-হা মাঠ-ময়দান। ক্যামেরাটা তার নিজের নয়। চাকুরির খাতিরে ওটা নিয়ে তাকে ঘুরতে হয়। এক ফটোগ্রাফিক স্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত। শহর ও গ্রামের সংগমস্থল দোব্রুকায় জনা কয়েক উৎসাহী লোক স্টুডিওটিকে বসিয়েছিল। পাতলা, মসৃণ কাঠের দেয়াল, ভেতরে ঢুকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ধনী গৃহস্থের বৈঠকখানার মতন ছিমছাম সাজানো। চমৎকার লাল রং সোফা, ছোট ছোট গার্ডেন চেয়ার, পিছনে কালিকো স্ক্রিণ তকতকে নীল আকাশের মতন, ফিপ্‌থ এভিনিউর চমকপ্রদ কালারড ফটোগ্রাফ—প্রাসাদের চেয়েও আদিগন্ত নীলাকাশে উড়ন্ত একবিন্দু চিল বেশি নজর কাড়ে।

তবে আফসোসের কথা, এদের ক্যামেরাগুলি ঠিক আধুনিক নয়, সম্ভবত নীলামে কেনা পুরনো মাল। অ্যামেরিকার রিলিফ-কর্মীরা কদাচিৎ এই স্টুডিওতে পদার্পণ করেছে। তা যাই হোক, গাঁয়ের মানুষদের নিয়ে এদের ফটোগ্রাফিক কারবার চলছে মন্দ নয়। নিজের প্রতিকৃতি নিয়ে শখ শৌখিনতা তো মানুষের মজ্জাগত। অনেকেই আসে দলবেঁধে গ্রুপ ফটো তুলতে। কখনো কখনো জোড়ায়-জোড়ায়। আবার অনেকে একান্ত চুপিসাড়ে একাকী। এ ছাড়া মহিলাকর্মী জেন্দাকা ক্যামেরায় তুলে আনে রমনীয় সমস্ত নিসর্গচিত্র, যাদের এনলারজড কপিগুলির বিক্রি উৎসাহজনক। প্রকৃতির সজীবতাকে ছুঁয়ে থাকা যায় ঐ প্রতিটি ছবির মাধ্যমে।···

গাঁয়ের লোকদের কাছে ছবি তোলানো একটা মহৎ ব্যাপার। সুযোগ যদি আসে, সকলেই ছবি তোলাবে। বসে, দাঁড়িয়ে, একা বা, মিলেমিশে। যৌবনের বিশেষ ভঙ্গীমায় তোলা ফটোকে তারা সারা-জীবন সযত্নে রক্ষা করে। প্রৌঢ়ত্বকে ও পিছনে রেখে কাতর বা জুলু-জুলু চোখে যৌবনের প্রায় অস্পষ্ট হলুদ ছবিকে দেখে, পরিজনকে সগর্বে দেখায়।

এই স্টুডিওতে এরকম খদ্দেরদের সংখ্যাই বেশি। জেন্দাকা ওদের কাছে বেশ প্রিয়। যতই দৌড়ঝাঁপ করুক মেয়েটা, হাতটা মিষ্টি।

বুড়োটে মানুষের নেতিয়ে-পড়া-ঘাড় আলতো চাপে যখন সে সোজা ক'রে দেয়, ফোকলা দাঁতে বিগলিত হাসি আর চাপা থাকে না।

কিছুকাল জেন্দাকারের ওপর ভার পড়েছিল স্টুডিওটাকে চালাতে। তার তৎপরতায় ব্যবসা আরো বেড়ে যায়।

ওর মতন মেয়ে এ তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই। অমন স্বাধীন মেয়ে-মানুষ এখানে বিরল। বিশেষত, নত্য তো স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। গ্রামে-গঞ্জে একা একা টো-টো, খিল খিল হাসি—পরিস্থিতিটা নত্যর কাছে অকল্পনীয়, ঠাণ্ডা, সিরসিরে। তার ছোট ছোট শখ-আহ্লাদ সব চার দেয়ালের বন্ধনীর মধ্যে। এবং সে মনে করতো, এটাই তার কৌলীন্য। নিজের ঘরে শান্তশিষ্টভাবে বসে থাকবার মধ্যে যে সৌন্দর্য, তাতে বুঝি নারীত্বেরই জয়-জয়কার ঐ গর্বেই অটুট থাকতো নত্য, যদি না অকস্মাৎ তার কুমারী জীবনে একরোখা যুবক লোচিনের আবির্ভাব ঘটতো।···দ্রুত—অতিদ্রুত সে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠলো এই সীমাবদ্ধ জীবনের ওপর।···

জেন্দাকারের সঙ্গে নত্যর পরিচয় নতুন নয়। একাধিকবার জেন্দাকা ক্যামেরা ঝুলিয়ে এ পরিবারের অন্তঃপুরে ঢুকেছে, খুব যত্নে ছবি তুলেছে নত্যর।

'অনেকের অনেক ছবি আমি তুলেছি। কিন্তু তোমার মতন এমন সুন্দর মুখ আমি কখনো পাই নি।'

—লেন্সে চোখ রেখে অকৃত্রিম মুগ্ধতার সঙ্গে জেন্দাকা বলেছিল।

নত্যের ঠোঁটের কোনে তখন ফুটে উঠেছিল এক চিলতে ধারালো হাসি, যা কেবল অহংগরিমার পরিচায়ক। সেই হাসি বিবর্ণ হতে হতে একদম মিলিয়ে গেছে এখন। এখন যেন চেনা যায়, গালচোপসানো পেরুনিক দম্পত্তিরই মেয়ে বটে সে! উদাসী জোড়া চোখ, পাতলা ঠোঁটে ঈষৎ কম্পন, দুর্বল দুর্বল পায়ে চলা, বাড়ি ছেড়ে বাগানে যেতে চাইলেই ওর মা যেন ভিরমি খান ও হেই হেই ক'রে ছুটে আসেন—এই সমস্ত পরিবর্তন দেখে নত্যকেন্দ্রিক অঘটনের গন্ধ পাচ্ছে জেন্দাকা।

মেয়েটা যে কেবল চব্বিশঘণ্টা চক্ষুবন্দী, তাই নয়, তাকে একটি বাহারী পুতুল ক'রে তুলবার সব রকম চেষ্টা চলেছে। তার ঢেউখেলানো শরীরের ওপর দারুণ দারুণ সব চেকনাই পোশাক চাপানো হচ্ছে; কখনো সমুদ্রের মতন নীল, কখনো পাকা শস্যের মতন হলুদ, কখনো গোলাপের মতন লাল···। প্রসাধনী প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে গালে, রং ঘষা হচ্ছে ঠোঁটে, চুলের সঙ্গে ঝুলছে জরির ফিতে···কী তামাশা···কী সব বিধিনিষেধ···বড় বড় বিষণ্ণ চোখ দুটো মেলে আছে লেন্সের দিকে ···এমনি সব ভোজবাজীর অর্থ একটাই—এই নত্যর বিয়ে হবে।

সন্ধ্যারাত্রির অপরাধী আগন্তুক, যদিও এখন অব্দি যাকে সনাক্ত করা যায়নি, নিশ্চয় বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে আর এমুখো হবে না। নত্যর যে শীঘ্রই বিয়ে হবে, এটাই জেল্লাময় তাকলাগানো সত্য। কথাটা যতবার নত্যর কানে গেছে, ততবারই সে শিউড়ে শিউড়ে উঠেছে, দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করেছে।···

পূর্ব য়ুরোপের ধরণ ধারণ আলাদা। এশিয়ার বনেদী দেশগুলির রক্ষণশীল ছোঁয়াচ সেখানে খুব। শহরগুলি যেমন-তেমন, গ্রামের বাড়াবাড়ি কহতব্য নয়।

আর সকলের বেলা যেমন ঘটে থাকে, নত্যর বেলাতেও তাই হতে চলেছে।

সে মাটির দিকে চেয়ে রোদের বুকে একটি নিঃসঙ্গ পাখির ছায়া দেখেছে, কিন্তু কখনো আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাবার সুযোগ পায় নি।

কোন ব্যাপারে কুমারী জীবনে তার যে একটা কিছু বক্তব্য থাকতে পারে, তা কেউ মানতেই রাজি নয়। বিয়ের ব্যাপারে তো নয়ই! মেয়েকে ঘরে-বরে মিলমিশ খাইয়ে দেবার দায়িত্ব মা-বাপের! তারপর তুমি সংসার করো, তোমার ছেলে-পুলে হোক, লজ্জার মোড়ক খুলে

আপসে তোমার ব্যক্তিত্ব জ্বলতে থাকবে অর্থাৎ, তর্জন-গর্জনে তুমিই তখন সকলকে জ্বালাবে।

তখন তোমাতে-আমাতে কোন ফারাক নেই। কত তখন তোমার মতামতের দাম!

নত্যর সঙ্গে যার বিয়ের কথাবার্তা ঠিকঠাক, তাকে নত্য কোনদিন চোখেই দেখেনি।

জমিজিরেত চাষবাস, একচাকা গাড়ি ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি সেরে বাপ মাঝে-মধ্যে খোঁজ নিয়ে আসে তার ভাবী জাঁদরেল জামাইয়ের। আহ্, কালে কালে সে কী হ'য়ে উঠেছে, কী হ'য়ে উঠবে। আর কী নজর কাড়া ঠাট! নত্য তো রাজরাণী হবে!

সব হিসেব বাপ-মায়ের আঙ্গুলের ডগায়, মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় কোন বুরবক? ঘরে থেকে নিজের কৌমার্যকে অটুট রাখো, এড়িয়ে যাও যতেক লোভাতুর দৃষ্টি, সেলাই ফোঁড়াই করো, এখন কোন যোয়ান পুরুষের স্বর শোনাও ভীষণ পাপ!

নত্যও এই ব্যবস্থাকে দিব্যি মেনে নিতো; হঠাৎ পায়ে ঘোড়ার দৌড় লাগিয়ে লোচিন এসে সব বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে গেল। এখন মার কোন কথাই তার কানে ঢুকলেও মরমে পশে না। রাজপুত্রের মতন বর হবে, সকলে মিলে গাইতে গাইতে গির্জা থেকে ফিরবো, পাদ্রী মন্ত্র পড়বেন, ফুলের পাহাড় তৈরী হবে দু'জনকে ব্যেপে—আরো কত বৃত্তান্ত!

ধ্যাৎ! নত্য ওসবকে পাত্তাই দিচ্ছে না, অদেখা পাত্র এখন তার চক্ষুশূল।...

পশ্চিম য়ুরোপের কোন যুবতীর পক্ষে এটা সমস্যাই নয়। ব্যক্তি স্বাধীতার মোক্ষম ঝাড় ফুঁকে উড়িয়ে দিচ্ছে গুরুজনদের ইত্যাকার মাতব্বরি।

পুবের গ্রামগুলিতেই যতো কঠোরতা। কন্যা যখন নেহাৎই শিশু বা, বালিকা, বাপ-মা তার ভাবী বর খুঁজতে ইতি-উতি চক্কর কাটেন।

পোকা-মাকড় ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ওড়ে ন্যাড়া মাঠের ওপর, আর বাপ তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খোঁজ নেয়, ভালো ঘরের কোন বালক মন দিয়ে পড়াশুনা করছে কিনা! পাত্র ও পাত্রী গুরুজনদের পছন্দমাফিক হ'লে ভবিষ্যৎ মিলনের দিনক্ষণ স্থির ক'রে আসে। হোক না সেই বিবাহ এক যুগ বা, দেড়যুগ পরবর্তী ঘটনা।

পাত্র হিসেবে নত্যার জন্য যাকে বাছাই করা হয়েছিল, কালে কালে তার উন্নতি দেখবার মতন। পুরুষ আকর্ষনীয় হয়, তার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে, চোখ জুড়ানো বাংলোয়। চেহারা-টেহারা একমাত্র মেয়েদের বেলাতেই বিবেচ্য।

নত্যার ভাবী স্বামীকে এক কথায় বলা চলে, সফল মানুষ। সে এখন জেগরাবের ইস্কম্পটন ব্যাঙ্কের বড়কর্তাদের একজন। এই বয়সেই অধস্তনদের কাছে সে দূরের রহস্য। মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়, তার মগজের কোষে কোষে বিবিধ বৈষয়িক ভাবনা। পয়সা ও ইজ্জতে মাখামাখি একটা বাড়তি লাবণ্য রয়েছে তার। শহরে, হাটে-বাজারে, চাকুরি-জগতে যথেষ্ট খাতির। বুদ্ধির বহর নেহাৎ খারাপ নয় নিশ্চয়; মাইনে-পত্তর যা পায়, বারো মাস পকেটটা তার উঁচুই হয়ে থাকে। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত এই লোকটির নাম ডক্টর পেডার স্রেডিক। একমাত্র নত্যার মতন বোকা মেয়ের পক্ষেই সম্ভব এমন পুরুষের সংসারকে গোছগাছ করতে অস্বীকার করা।

কোথায় এই চমৎকার লোকটির স্বপ্নে মশগুল থাকবে তা নয়, কোথাকার এক ধূমকেতুর চিন্তায় দিন-কে দিন সে বিবর্ণ! আর কী সব ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক পরিকল্পনা! সে নাকি পালাবে! মিটার লোচিনের সঙ্গে অ্যামেরিকায় পগারপার!...

মেপেজুঁকে চালাতে গিয়েও মেয়ের জীবনে কলঙ্ক এড়ানো গেল না। এখন এটা চেপে রাখাই বড় কথা, পাঁচ কানে বেজে উঠবার আগেই মেয়েটার বিয়েটা সারতে হবে।

দাঁত কিড় মিড় মা কপাল চাপড়ালেন। বাবা স্ত্রীর ভাবসার দেখে ফড়শীর নল টানতে টানতে একবার মাত্র গর্জন ক'রে উঠলেন 'খর্বদার। বের হবিনা, নত্য!'

তারপর নল নামিয়ে রেখে দেয়ালে টাঙ্গানো পুরনো আমলের বন্দুকটার ওপর আঙ্গুল বোলালেন বারদুয়েক। চাতুরি মিশ্রিত চোখে দেখলেন মেয়েকে। আহ! মুখখানা এখনো বড় নিষ্পাপ!

বাবার মনে স্নেহ উথলে ওঠে। বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হয় না···। নত্যর পক্ষে কোন গোপন—প্রণয়কে লালন করা নেহাৎ অবাস্তব। অথবা, যদি কিছু ঘটেও থাকে, তা বিলকুল গুরুত্বহীন।···বাবা হুইল-ব্যারোগুলি পর পর সাজিয়ে রাখছেন। আকাশের গায়ে লেপটে আছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। নত্য এগিয়ে এলো তাঁকে সাহায্য করতে। মেয়ের মুখ দেখে বাবার বুকে আর একদফা চিন্‌চিনে অনুভূতি—আহ, গড়খাইয়ের জল খেতে এসেছে যেন এক হরিণশিশু! পাপ নেই, আমার মেয়ের এক মনে পাপ নেই; এ কেবল ওর মার বাড়াবাড়ি। কোন ফাজিল ছোকরা ইয়ার্কি করতে এসেছিল আর কি! তবে হ্যাঁ, ভরা যুবতীকে চটপট বিয়ে দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি ঘর ছেড়ে মাঠের ওপর দিয়ে রওনা দেন ফুরফুরে বাতাস। পাকা ফসলের মাথায় মাথায় রোদের ঝিলিক চিত্রবিচিত্র আঁকিবুকি। খেত-খামারে চাষীরা দল বেঁধে কী। এক বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করছে। কি বলছে ওরা? যদি দরকার হয়, মার্কিন রিলিফ দপ্তর গাঁয়ের গরিবদের নাকি সাহায্য পাঠাতে রাজি! নত্যর বাবার কপালে একটা ত্রিশূল চিহ্ন ক্রমশই ফুটে উঠতে থাকে।···

জানালা খুলে বড় বড় চোখে বাবার অপস্রিয়মান ছায়াটাকে দেখলো নত্য। সে নিজেকে কখনোই সুস্থ বলে মনে করতে পারছে না, বুকভর্তি ক্ষোভ ও তরাস গৃহত্যাগে উৎসাহ দেয়। ছোট বেলা একবার সে অনেকদূরের পাহাড়-নদী-বন দেখে এসেছিল; এখন সে ঐগুলিও

টপকে টপকে আরো দূরে পালিয়ে যেতে চায়। এই যে পালাই-পালাই মানসিকতা, এতে তার বুকে ব্যথা, মাথা ঘোরায়, গায়ে তাপ। তাপ বলে তাপ—গোপন বুকের ভাঁজে, নাভির নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। মীনাকরা চোখের তলায় শুকিয়ে-যাওয়া জলের দাগ। যদি এখনো ঐ ময়দানের দূরতম প্রান্তে বেপরোয়া লোকটিকে ভেসে উঠতে দেখে, সে ঘর ছেড়ে সমস্ত নাড়ির সম্পর্ক চুকিয়ে ছুটে পালাতে একপায়ে খাড়া। সবটাই কল্পনা, নচেৎ চার দেয়ালের কঠিন বাঁধন বড় মর্মান্তিক! এই কথা যতই সে ভাবে ততই তার রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, শরীরে আরো উত্তাপ বাড়ে। সন্ধ্যার পর এ বাড়িটা ডাইনীবুড়ির আস্তানা। জানালা—কপাট সব বন্ধ। ভাইগুলিও চোখ পাকিয়ে তাদের বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে; আর মা বন্দুক হাতে এ ঘর থেকে সে ঘর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

সে কি আসে না?

এসেছে, নিশ্চয় এসেছে এবং তিক্ত হতাশা নিয়ে ফিরে গেছে।

ক্যামেরা-কাঁধে জেন্দাকারের তলব এ বাড়িতে নতুন নয়।

অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষরা ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারলে খুশি হয়, বিভিন্ন ভঙ্গীমাকে তুলে রাখতে পারায় এক ধরণের আত্মতৃপ্তি ও আত্মগৌরব স্পষ্ট।

গত ক'দিন যাবৎ জেন্দাকা দেখছে, পেরুনিকদের আবাসে ভিন্নগতির বাতাস বইছে। বাড়ির লোকজনের মুখে-চোখে সন্দেহ ও উদ্বেগ, আবার উৎসবের গন্ধও এসে লাগছে নাকে। দরজার সামনে অপরিচিত কাউকে দেখলেই সাবধানী কইমাছেরা যেন ছুটে আসে, অথচ জানালা-কপাটে নতুন বাহারী নকশা কাটা পর্দা অদৃশ্য আগন্তুকদের ইশারায় ডাকে। মেয়াবিটিদের গালে-গলায় রং, নতুন নতুন জেল্লাদার পোশাক তুলে তুলে হাঁটে, ঝুটি ফেলানো মোরগের মতন লেন্সের পানে যখন তাকায়, কত রস বুঝি চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। এ সমস্তই উৎসবের

পূর্বলক্ষণ। কিন্তু উৎসব যদি হবে, সবকিছুকে জড়িয়ে অমন ভয় ভয় থমথমানি কেন?

আর এ বাড়িতে একটি মাত্র পূর্ণবিকশিত ফুল নত্য,—তাকে আরো—আরো রূপসী ক'রে তুলতে সমবেত ব্যস্ততা। তাকে কেউ মাটিতে পা রাখতে দেবে না, হাতের নোখে পায়ের নোখে মীনা করা হয়েছে; মেয়ের স্কার্টে একটু ময়লার ছোপ পড়েছে কি মহিষমর্দিনী মা চোখ পাকিয়ে ধমক-ধামক দিচ্ছেন।

অথচ, কোন সরস রসিকতা নেই। এ সময় প্রতিবেশী মহিলারা আসেন, সমবেত যুবতীরা দলবদ্ধভাবে আসে, হাসি-মস্করায় ধুলোট শুরু হয়। তা না, কেবল শুকনো হুঁশিয়ারী। জেন্দাকার সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে। নত্যর মুখে আর হাসি সেই, সেই ভুবনভোলানো হাসির রেশটুকুও মিলিয়ে গেছে দেখে জেন্দাকা দুঃখিত হয়, তার মনে প্রশ্ন জাগে···সে চাইছে, নত্যকে কিছুক্ষণ একাকী পেতে। উপায় নেই। কেউ ঐ সুন্দরীর ঘরে ঢুকেছে কি, দরজা-জানালায় থিক থিক করবে একাধিক চোখের উঁকি-ঝুঁকি।

আজ সকালে অপেক্ষাকৃত খুশ মেজাজে নত্যর মা জেন্দাকাকে বললেন, 'বুঝলে মেয়ে এবার আমরা নত্যর বিয়ে দিচ্ছি।'

জেন্দাকার কালো চোখের তারায় ঝিলিক, 'পাত্র কি ঠিক হ'য়ে গেছে?'

মা গর্বের হাসি হাসলেন, 'ঠিক তো হয়ে আছে অনেক কাল আগেই। ব্যাঙ্কের বড় অফিসার গো। ঘরও বনেদী।'

জেন্দাকা, যে এমনি সব বার্তা শুনতে শুনতে নির্বিকার, সকৌতুকে তাকালো অদূরে চেয়ারে বসে থাকা নত্যর দিকে। দুধে-আলতা সুন্দরীর একেবারে উৎসাহ-আধিক্য নেই, একটি সিল্যুট ছবি যেন। দেশীয় রীতি-পদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠানের ধুম লেগেছে, অথচ যাকে নিয়ে এত সব, সে ভাবলেশহীন। বাইরে, পথে, এক গাড়োয়ান চাষারে

গলায় গান গাইছে ; নত্য যেন তন্ময় হ'য়ে শুনছে ঐ গানই। প্রথম বেলার কচি রোদ সর্বাঙ্গে জমজমাট। পোশাকের জেল্লা চমকপ্রদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সঙ্গে বেমানান। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কি!

কিছুক্ষণ অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে জরিপ করবার পরই জেন্দাকার মন দুলে ওঠে। ও গড, বিয়ের খবর পেলে যুবতী কন্যা কখনো অমন স্থবির বিষণ্ণ হয়ে থাকে নাকি? সে তো তখন লাজে গরবে-শঙ্কায় ক্ষণে ক্ষণে রাঙা হয়ে উঠবে, সঙ্গোপনে নিজের সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, খিড়কীর দরজা দিয়ে বাগানে ঢুকে ফুল তুলবে···ইঁদারার টলটলে জলে নিজের ঢল ঢলে মুখখানা দেখবে। তা না, এ মেয়ে যেন ইঁটের পাঁজায় পড়ে থাকা আহত নিঃসাড় পাখি—আকাশে ভাসমান শিকারী ঈগলও বিষণ্ণতার সুরটা ধরতে পেরেছে।

জেন্দাকা নত্যর মাকে পোশাকী শিষ্টাচারের সঙ্গে বললো, 'তাই বুঝি বাড়িতে এমন উৎসবের ঝাঁজ! সত্যি, চমৎকার মেয়ে নত্য! চমৎকার!'

চ-ম-ৎ-কা-র—জেন্দাকার উচ্চারণে অনেকটা তীব্রতা ছিল, যা, বিস্ময়-বিতানে আছড়ে পড়ে ছুঁয়ে গেল নত্যকে। এই প্রথম চকিত চমকে সে মুখ তুলে দেখলো জেন্দাকাকে। পরাধীনা স্বাধীনাকে দু'পলক করুণ দৃষ্টিতে দেখলো। চোখের পাতা ভিজে, পাতলা ঠোঁট দু'খানি কাঁপছে। মুখ ফ্যাকাসে, কোথাও ব্রীড়াবনতার চিহ্ন নেই ; অথচ, গেঁয়ো মানসিকতায় ওকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে একটি কনে-পুতুলের মতন। পরণে স্বচ্ছ গোলাপী মস্‌লিন, একটা অদ্ভুত পাতলা ওড়না কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। এখন হাতে দস্তানা পরে গীর্জায় গিয়ে দাঁড়ালেই হলো! সে জেন্দাকাকে দেখে চেয়ারের হাতলে হাতের চেটো ঘষতে থাকে ; তারপর উঠে দাঁড়ালো, সরসরিয়ে হেঁটে গেল নিজের ঘরের দিকে। জেন্দাকা মনে মনে বললো, বয়সের তুলনায় যথেষ্ট বাড়ন্ত মেয়ে—

শক্তিমান পুরুষের সাহচর্য দরকার! প্রকাশ্যে মুচকি হেসে বললো, 'যাই, ওর লজ্জা আমি ভাঙবো।'

—বলেই পা বাড়ালো নত্যর পিছু পিছু।

সেই মুহূর্তে মিসেস পেরুনিকও ঈষৎ আনমনা। তিনি উঠলেন না। তাঁর কাঁচা পাকা চুলে সূর্যের পরশ বড় আরামপ্রদ। দেয়ালে টাঙ্গানো রঙচটা পারিবারিক ছবিটার নির্বিকল্প দৃষ্টি। সেখানে নত্যদের তরুণ বাপ যেন এক সিংহ পুরুষ, গোঁফ জোড়া মোম দিয়ে মাজা। তিনি পা দুটো টান টান মেলে দিলেন। আলপাকার মতন নরম ত্বকে ক্রমশ ফাটল ধরেছে, চাকা চাকা দাগ। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। গলার নলিতে দলাপাকানো ব্যাথাটা ক'দিন যাবাৎ বাড়ছে। মা মেরীর কৃপায় নত্যর বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি হাতের রশি আলগা ক'রে দেবেন, আর সাতসকাল থেকেই সংসারের পিছনে হাওয়া দিয়ে বেড়াবেন না। তাঁর তামা-রং কপালে অনেকগুলি ভাঁজ পড়ছে ও মুছে যাচ্ছে। মনের পর্দায় বার বার বিসর্জনের বোল বেজে ওঠার তালে তালে দশাশয়ী বুকের ওঠানামা। তিনি ভুলেই গেলেন, এই কিছুক্ষণ আগে ক্যামেরা কাঁধে শহরমুখী সেয়ানা মেয়েটা মৃদু পায়ে ঢুকে গেছে তাঁর নত্যর ঘরে। অনাসৃষ্টির পূর্বাভাষ। কিন্তু টের পেলেন না।

নত্যর ঘরখানা নেহাৎ ছোট নয়, অন্তত আট হাত লম্বা এবং সাত হাত চওড়া—ছিমছাম রাখতে গিয়ে গৃহকর্ত্রী প্রায়ই জেরবার। সদ্য চুনকামকরা, দেয়ালের একদিকে রঙিন কাগজের আস্তরণ, একটি ক্রশ দুলছে পেরেকে, একখানা ক্যালেণ্ডার, একখানা ছবিতে ঘোড়ার পিঠে মহাখুশি বালিকা নত্য (জীবনে নিশ্চয় ঐ একবারই সে অমন উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছিল।), কিছু বই সমেত ছোট বুকসেলফ, বইগুলির ওপর নজর গেলে ভির্‌মি খেতে হয়—কেবল ধর্মমূলক উপদেশমূলক এবং কিছু সেলাই-টেলাই সম্পর্কিত বই, পশুপালন সম্পর্কীয় একখানি পত্রিকাকে এই কিছুক্ষণ আগে কে যেন উসখুস মানসিকতায় খুলে রেখে গেছে···

এবং বাগানমুখী জানালার সামনে দৃষ্টিহারা নত্যার নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ততা।

ঃ নত্য।

মৃদুস্বরে জেন্দাকা ডাকে।

আচম্বিত সম্বোধনে চমকে ওঠে মেয়েটা, মুখ ঘুরিয়ে বিষণ্ণ লৌকিকতার হাসি হাসে, ইশারায় খাটের ওপর বসতে বলে।

জেন্দাকা কিন্তু বসে না, কায়দামাফিক হ্রস্ব চুলকে ঝাঁকিয়ে যেন কোন উৎসবকে চাঙ্গা করবার মানসিকতায় ওয়াল্টজ নাচের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নত্যার কাছাকাছি গিয়ে ওর কাঁধ ছুঁয়ে দেয়।

আধঘুমন্ত নত্য জেগে উঠে বললো ঃ আমি কিন্তু আজ ছবি তুলবো না। থেকে থেকে রং মাখতে আর ভালো লাগে না।

জেন্দাকা ঃ রং তো তোমার মনে।

নত্য ঃ কেন ?

জেন্দাকা ঃ সব শুনেছি। গন্ধর্ব সুন্দরীর বিয়ের ফুল ফুটেছে।

খুশির আমেজ এলো না, প্রলুব্ধ হলো না এমন কোন জবাব দিতে যাতে ঠাট্টাটুকু উসুল করা যায়। বরং নত্যার মুখে চোখে চাপা কাঠিন্য দানা বাঁধে, ডান চোখের নীচে একটা সুখ নীল শিরা কাঁপতে থাকে, সমস্ত শক্তি নিঙড়ে ভীষণ প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ ক'রে যেন সে ঃ এ বিয়ে হবে না। আমি গীর্জায় যাবো না।

চাপা স্বর, তবু কী সম্মোহনময় আর্তনাদ!

জেন্দাকা বিস্ময় প্রকাশ করে ঃ সে কী!

নত্যার চকচকে কপাল স্বেদাক্ত, জেন্দাকার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রচণ্ড আকুল হ'য়ে ওঠে ঃ তুমি তো অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াও, তাই না ?

ঃ পেশার তাগিদে যেতে হয়।

ঃ অনেক মানুষের সঙ্গে তো তোমার পরিচয়, তাই না ?

ঃ মানুষ ও প্রকৃতি—দুইয়ের সঙ্গেই আমার খুব ঘনিষ্ঠতা। এই

ঘনিষ্ঠতাকে গাঢ় করতে আমি কোন বাধাকেই তোয়াক্কা করি না। ত্রিয়েশতি শহরের ধনীদের প্রাসাদ, মাথা ঝিম ঝিম করানো নোংরা হোটেল, জঘন্য বস্তী—সব জায়গাতেই ক্যামেরা কাঁধে ঘুরে বেড়াই, মানে ঘুরে বেড়াতে হয়। আবার তুহিনাবৃত আল্পস পর্বত, দিগন্ত বিস্তৃত হরিৎ বন, রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রান্তর, খরতোয়া নদী—এরাও আমার খুব পরিচিত। এরাই তো আমার অবস্থা ফিরিয়েছে।

জেন্দাকার কণ্ঠস্বরে পেশাদারী বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মুখস্ত করা কাব্যিক বর্ণনাগুলি নানান গলিঘুঁজি থেকে বেরিয়ে এসে এক ঝলক উষ্ণস্রোত বইয়ে দিলো। ফটোগ্রাফার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এই কথাগুলি অনেককে অনেকবার সে বলেছে। কিন্তু এই রকমের মতন ঠাণ্ডা ঘরে এ এক নতুন প্রাণস্পন্দন। আর নত্যর কাছে এ বুঝি বিস্মৃত প্রায় গানের একটা কলি। পুরুষানুক্রমে পুরুষরা যা উপভোগ করে, মেয়েরা তা পায় না কেন? এই প্রথম শেকল ভাঙ্গা মেয়ে জেন্দাকার প্রতি নত্য শ্রদ্ধানুভব করে। তার দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে কৌতূহলের নক্ষত্র ঝিকিমিকি করতে থাকে। প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো: তুমি কখনো মার্কিন রিলিফ অফিসে গেছ?

এবার জেন্দাকার চমকে ওঠার পালা। নিরানন্দ নীরস ঘানির চক্রপথে ঘুরতে ঘুরতে গৃহবন্দিনী মেয়েটা হঠাৎ মার্কিন রিলিফ দপ্তরের কথা বলে বসলো কেন? জেন্দাকা লক্ষ্য করে, নত্যর দুই কান এবং নাকের ডগা পোড়া মাটির মতন লাল। লজ্জায়, উত্তেজনায় রক্তের চাপ বাড়ছে।

হুঁ, বুঝতে পেরেছি, কুমারী মায়ের আশিসে মাথাটি আমার বরাবরই বেশ পরিষ্কার—জেন্দাকা ভাবলো। সম্ভবত, পেরুনিকদের পারিবারিক হুইলব্যারো ব্যবসায়ের সূত্র ধরে কোন এক ইয়াংকি শ্রীমানের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং নত্য হতভাগিনীর [হায়! ছেলেরা যে কেমন হয়ে থাকে, সে জানেই না।] নরম মনে রেখে গেছে একটি স্থায়ী ছাপ। তবু এটা বিস্ময়কর, রীতিমতন অবাক ঘটনা।

জেন্দাকা ওর প্রেমোদ্ভুত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, আমি সেই অফিস চিনি। কিন্তু কে সেই তোমার আর্যপুত্র? সে কি ভিন্‌দেশী?'

বিষণ্ণ নত্যর মনে বেহালার ছড়-চমক। জেন্দাকার বুদ্ধির তীব্রতা যেন ভুগর্ভের আদিম আগুন—মুহূর্তে পুড়িয়ে সাফসুতর করে দিলো যাবতীয় গোপনীয়তা। পরক্ষণে তার বুক জুড়ে ছায়া ফেলে দারুণ ভয়; এতদিন সে যা অবিশ্রান্ত ও অপর্যাপ্ত প্ররোচনার মুখেও গোপন রাখতে পেরেছিল, আজ এই মেয়েটার সামনে তা ফাঁস হয়ে গেল! কে না তারিফ করবে এই চতুরার চাতুরিকে? একবার যদি হদিশ মেলে, আমার বাড়ির লোকেরা অ্যামেরিকান রিলিফ দপ্তর অব্দি দাপিয়ে আসবেন। বাবা গোঁয়ার, মা মুখরা, ভাইগুলো যেন ওঁদের অনুগত অশ্বতর—একেবারে পুরো ব্যাটেলিয়ানটাই ধেয়ে যাবে প্রতিশোধ নিতে।

আতঙ্কে অস্পষ্ট নামহীন একটা শব্দ উচ্চারণ করতে থাকে নত্য, মাথাটাও ঘুরতে থাকে, এ যেন পৃথিবীর নিজস্ব গতির এক শব্দ।

বুঝতে পেরে জেন্দাকা আবার ওকে সস্নেহ স্পর্শ করে, 'ভয় পেও না, নত্য। তুমি নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পারো। হয়তো আমি তোমার প্রয়োজনেও লাগতে পারি। যারা পবিত্র প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় না, অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে চায়, আমি তাদের ঘৃণা করি।'

নত্য বড় বড় চোখ মেলে জেন্দাকার মুখে আশ্বাস খুঁজতে থাকে। ক্রমশঃ যুদ্ধফেরৎ তুরঙ্গের মতন দৃশ্যতঃ হাঁপ ধরে গেছে নত্যর, অনিশ্চয়-তার রূপারোপিত ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে নেহাৎই আটপৌরে মেয়ের মতন বললো, 'আগে তুমি মা মেরীর নামে শপথ ক'রে বলো, এ কথা তুমি আমার জীবৎকালে আর কারুর কানে তুলবে না।'

ধর্মের দোহাই দিয়ে বড় কঠিন শপথ। তবু স্ববৈপরীত্যের টানে-বেটানে অমন প্রতিজ্ঞা যে কত মানুষ জীবনে কতবার নির্দ্বিধায় করে বসে। মানুষ যদি আজো নিজের নিজের শপথের জিম্মায় থাকতো, পৃথিবীর আত্মসন্তুষ্ট চেহারাটাই হতো অন্যরকম।

জেন্দাকা মৌজ করে আত্মম্ভরী হাসি হাসে, 'কারুর মানে নিশ্চয় তোমার মা ও বাবা?'

নত্য তার স্থবিরত্ব কাটিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ে, 'না-না-না, কেবল মা-বাবা নয়। তুমি এ কথা কাউকেই বলতে পারবে না। শপথ করো।'

আবার শপথের জন্য পীড়াপীড়ি; বিশৃঙ্খলতায় মাথামাখি দুনিয়ায় যেন মেরীর নাম করলেই একটা হিল্লে হ'য়ে যাবে! নত্য জানে না, জনবিস্ফোরণের দুঃসহ পরিবেশে ঈশ্বরের নামে শপথ করাটা একধরণের ছেলেমানুষী।

কৌতুকের দৃষ্টিকে যথাসম্ভব মোলায়েম ক'রে রাখে জেন্দাকা। নত্যর ভাবভঙ্গী দেখে খুব হাসি পেলেও যুক্তিগ্রাহ্য গাম্ভীর্যও বজায় রাখছে। গা ভারি ভারি তুলতুলে মেয়েটা যেন একটি জাপানী পুতুল —দিব্যি না কাটলে এ মেয়ে কিছুই কবুল করবে না। কেবল যে মুখ খুলবে না তাই নয়, পরিকল্পিতভাবে সে আর কোনদিন উৎসুক মুখে তার ক্যামেরার সামনে এসেও দাঁড়াবে না।

সুতরাং জেন্দাকা জলজ্যান্ত ভীমের মতন প্রতিজ্ঞা করলোঃ মা মেরীর নামে শপথ করছি, আমি এ কথা কাউকে বলবো না, বলবো না, বলবো না…।

তার স্বার্থে জেন্দাকার আত্মোৎসর্গ দেখে নত্যর মুখের চেহারা ঈষৎ স্বাভাবিক হয়ে আসে। রক্তের চাপ কমে আসায় চামড়াটা ফ্যাকাশে দেখায়। গাঢ় শ্বাস ফেলে। স্বাভাবিক জ্ঞানগম্যি ও সতর্কতায় দেখে নিলো, দরজার আড়ালে কেউ কান পেতে আছে কি না! না, কেউ নেই। আজকের এই সকালটাই আশ্চর্য। বাড়ির লোকগুলিকে যেন বোবা শিথিলতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে। থাকুক ওরা কিছুক্ষণ এমন নির্লিপ্ত হয়ে।

একবার জেগে উঠলে তো আর রক্ষা নেই—চারদিক থেকে পরিমিতিহীন সহস্রবাহু সতর্কতা ছুটে আসবে।

রহস্য উন্মোচনের আশায় চেয়ে থাকে জেন্দাকা।

মেয়েমদ্দর গোপন প্রেমের কেচ্ছা শুনতে কার না ভালো লাগে? প্রায়শই সেগুলি পারম্পর্যবিহীন হলেও রসের ভাণ্ডার। সুযোগ পেলে, যে কোন মেয়ের পক্ষে, তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা পালন করাটা বেশ লোভনীয় এবং মেয়েদের মধ্যে এ ব্যাপারে উৎকর্ষের প্রচুর সম্ভাবনা।

নিরিবিলি আকুলি-বিকুলি গোপনীয়তায় ঝুঁকি থাকলেও তা খুব আকর্ষক। আর যদি দেখা যায়, এখানে একটি মেয়ের পারিবারিক ঐতিহ্য তথা কুলপ্রথা চূর্ণ হতে পারে, তা হলে তো তথাকথিত বান্ধবীর তাথৈ তাথৈ উল্লাস ষোলআনার ওপর আঠারোআনা।

নত্যর মতন গোঁড়া পরিবারের মেয়ে শাসনের গনগনে আঁচ সত্বেও এমন একটা বিপজ্জনক সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরে আছে, তুনিয়ায় এর চেয়ে বড় মজাদার প্রহেলিকা যেন আর নেই!

নত্য তার বাঁ হাতে নিজের তুই আকাশী নরম চোখ ঢেকে ধীর নীচু গলায় বললো, 'আমি তার জাতজন্মের খবর রাখি না। জানি না, তার বাপ মা জীবিত আছেন, না, তাঁদের তিরোধান ঘটেছে! ঐ সব কথা জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজনই আমি বোধ করিনি। সেও কখনো আমার পারিবারিক ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেনি! মা পরে বলেছেন, শহরের লোকদের নাকি অনেক রকম বদমাইশি থাকে, তারা নাকি নানা রকম ক্যারদানি দেখিয়ে মেয়ে পটায়। আমি এ সব কথাকেও গায়ে মাখিনি এই জন্যে যে, সর্ব্বোনাশ যদি কপালে থাকে তো থাকুক, আমি তাকে অবিশ্বাস ক'রে আরো বেশি কষ্ট পেতে চাই না।'

নত্যর মৃত্যু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে যুগপৎ আত্মপ্রত্যয় ও যন্ত্রণা। আধুনিক মেয়েরা যে সব কেতাবী—কানুন মেনে বেছে-বুছে প্রেমাস্পদ যোগাড় ক'রে নেয়, নত্য সে সবে রপ্ত নয়! তার মনে এখন একটি সরল দূরন্ত কবিতা, যার আবেগ-প্রকাশে সে নিজেই গলদঘর্ম হ'য়ে উঠেছে। জেন্দাকা জম্পেশ ক'রে বিছানায় উঠে ঠানদিদিভঙ্গীমায় গালে হাত দিয়ে শুনছে, মুখের কোনে হাসিটুকু কখনো করুণ, কখনো তেতো।

'আমাদের বাড়ির সামনে বাগান যে ঝাঁকড়া ঝাউ গাছটা আছে, ওখানেই সে সন্ধ্যায় আসতো। কত বড় ঝুঁকি! তবু রেয়াৎ করাতো না। শিষ দিতে দিতে মাঠবাদাড় পার হয়ে ওখানে এসে এসে দাঁড়াতো। কখনো কখনো বিলক্ষণ আমার জানালার নীচে এসে দাঁড়াতো। টুকিটাকি উপহার ছুঁড়ে দিতো। আমিও ক'দিন থাকতে না পেরে কয়েক মুহূর্তের জন্য ছুটে গেছি ঐ গাছতলায়। তারপর কবে যেন মা টের পেয়ে গেলেন। বন্দুক নিয়ে ছুটে এলেন ওকে খুন করতে। হ্যাঁ, খুন করতে! ওঃ! কী ভয়ঙ্কর!...'

নত্যার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে একটি অছেদ্য ছায়াকে বন্দুকের নলের সামনে এগিয়ে আসতে এবং ছুটে যেতে দেখে। প্রচণ্ড অন্তর্ঘাতী সংঘাতে তার কোমল মন ঘরগৃহস্থালির নিষ্ঠুর আচার-ব্যবহারকে অস্বীকার করতে চাইছে।

নিজেকে একটু সামলে সে আবার বললো, 'আমি এখন ঈশ্বর ও নিয়তির হাতে ক্রীড়নক। মানুষটার পরিচয় জেনে কি হবে? তবে এইটুকু জেনেছি, সে অ্যামেরিকান নয়, পূবদেশীয়ই হবে। অনেক বিদেশ বিভূঁই চষে বেরিয়েছে, আমাদের এই এলাকার মানুষগুলির মতন ছিরিছাঁদহীন নয়। অনেক কিছু জানে, এমন সব জায়গার নাম বলবে, মোটামুটি ভূগোল হাতড়ে তুমি যাদের খুঁজে পাবে না। এমন সমস্ত অবাক করা গল্প বলবে, যা শুনলে মনের রস উথলে ওঠে। হেলাফেলা লোক নয়, বিদেশী রিলিফ দপ্তরের অফিসার। কখনো মুখ গোমড়া ক'রে থাকে না, সব সময় হাসছে।'

প্রেমিকের গুণপনা ব্যাখা করতে করতে উচ্ছ্বসিত নত্যা হঠাৎ থেমে গেল। ফর্ গাছে ঢাকা একটি ছোট্ট তুষার কুটিরের মতন দেখাচ্ছে তাকে। তবে সূর্য ওঠায় মুঠো মুঠো আবির—তার দুই গাল রীতিমতন রক্তাভ।

ওর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে নীরবে যেন বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছে জেন্দাকা। এই সতর্ক বাড়ির কেউ ঘুণাক্ষরে টেরও পাচ্ছে না, তাদের

তরতাজা মেয়েটি এবার প্রকৃতই দুষ্কৃতকারীদের বিপজ্জনক ফাঁদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে।

আচমকা নামটা উচ্চারণ করলো নত্য ঃ তার নাম মিটার লোচিন ভেরোভিক !

জেণ্ডাকা চমকালো ; অথবা, যেন তার খটকা লাগলো। গরীব গুর্বোদের সাহায্য করতে শহরে যাদের সাম্প্রতিক পত্তনী, তাদের মুখে মুখে ঐ নাম। লোকটা নাকি চতুর স্মার্ট, অনেক পয়সা থাকে মালটি-পকেট কোটের ভেতর, রোগা শরীর নিয়েও খুব মাল টানতে ওস্তাদ, রেগে গেলে জাহাজের কাপ্তেনের মতন গালিগালাজ করে, আর না হলে মিষ্টিহাসি ও আষাঢ়ে বার্ত্তালাপ তার বৈশিষ্ট্য।

গতকাল, হ্যাঁ, মাত্র গত সন্ধ্যায়, জেন্দাকা তার এক বয়স্ক মার্কিন বন্ধু কার্বির সঙ্গে দুর্বা ঘাসে ঢাকা পার্কের জমিতে বসে এই নামটার কথাই শুনেছিল। কার্বির প্রকাণ্ড ভারী ধরণের চেহারা, মাথায় টাক, কাঁচা-পাকা চুল ছড়িয়ে পড়েছে সারা বুকের ওপর—তখন বলছিলো, 'তোমাদের দেশের লোকগুলি যে আদৌ বোকা নয়, বরং মাথাটি যে বেশ পরিষ্কার, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের দপ্তরের মিটার লোচিন ভেরোভিককে দেখলে।'

হ্যাঁ, এই নামটাই ঃ মিটার লোচিন, হ্যাঁ এই নামটাই···। আশ্চর্য যোগাযোগ আর কি ! জেন্দাকার চিন্তান্বিত মুখ দেখে নত্যর মেঘাচ্ছন্ন মনে হাসির রোদ ঝিলিক দেয়, তার রুদ্ধশ্বাস জিজ্ঞাসা আছড়ে পড়ে ঃ তুমি তাকে চেন ?

বালিশের' পর কনুয়ের ভর দিয়ে চিবুকে আঙ্গুল রেখে জেন্দাকা বললো ঃ ঠিক চিনি না, তবে খুঁজে বের করতে পারবো।

কে বুঝি বেহালা বজায়।

বেহালা নয়, বাতাসের গায়ে অবশ্য-বহনীয় দুঃখ, যাকে বলা যায় বুকের কোনে গ্রহণ করা একটা সামান্য ব্যধিমাত্র।

জেন্দাকা এক সময় কবিতা লিখতো। এখন কেবল অবসরে শীস দিয়ে গান গায়। কিন্তু তার অবসর বড় কম। সকলেই জানে, ক্যামেরায় সে বড় শিল্পী। কিন্তু ক্যামেরাই সব নয়। জেন্দাকা পয়সা করতে চায়, পয়সার জন্য সে বাজি ধরবে, ঝুকি নেবে, সঙ্গ দেবে কার্বির মতন পয়সা ও চর্বিসর্বস্ব বিদেশীদের।

জেন্দাকার ঐ দ্বিতীয়রূপ যে মোটামুটি অপ্রকাশ্য, এতে তার বাহাদুরি অনস্বীকার্য। সাধারণ পরিচিতদের নজরে সে আপাতঃ পবিত্র, লোভনীয় এবং সুগৃহিনী হিসেবে সে যে ভবিষ্যতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, এ ব্যাপারে অনেকেই নিঃসন্দেহ। সে যখন যথাযথ শালীন পোশাক পরে ঘন-সন্নিবিষ্ঠ শহরের পথ ধরে গটগটিয়ে হেঁটে যায়, তাকে পাপ-ইশারা করবার মতন কারুর বুকের পাটা আছে বলে মনে হয় না।

সহরের পাহাড়ী অঞ্চলে, যেখানকার সবগুলো ছোটবাড়িই কাঠের, জেন্দাকার ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের জীর্ণ আবাস নড় বড়ে। পরিবারটি ক্ষয়িষ্ণু এই জন্যে যে, ঐ পরিবারে আর বাতি দেবার কেউ নেই। পৃথিবীর একটি প্রাচীন উপজাতির মতনই এই বাড়ির লোকগুলি অনিবার্যভাবে শেষ হ'য়ে গেল! জেন্দাকার বাবা ছিলেন রেসের মাঠের ব্যর্থ জকি—বেশ্যাপল্লীতে লিভার ফাটিয়ে খতম হন; মৃত্যুর খবর আসে তিনদিন বাদে এবং কবরে শুইয়ে দেবার সময় গলিত শবের দুর্গন্ধে সকলকে নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়েছিল।

জেন্দাকার ছিল পেট সর্বস্ব একটি ভাই, মৃগী রোগের শিকার, কখন কোথায় যে হাত-পা খিঁচতে থাকবে, তাই নিয়ে মা-বেটিতে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না; তা সমস্ত রকম দুর্ভাবনার ইতি ঘটিয়ে ছোকরা একদিন দৈত্যপারা লালইট ন্যাশনাল স্কুলের ছাদ থেকে সবেগে নীচে—প্রায় অতলে চিৎপটাং; প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে, গলা দিয়ে একটা দলাপাকানো আওয়াজ অব্দি বের হয় নি।

স্বামী ও ছেলেকে খোয়াবার পর জেন্দাকার স্বাস্থ্যবতী মার যেন

হঠাৎ মালুম হলো, সে যে এখনো যুবতী! কাঠের সিঁড়িতে তার গোড়ালির ঠোক্কর, পরণে বাহারী নীল রং লাউঞ্জ-স্যুট—প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই তার সান্ধ্যভ্রমণ।

একদিন আর ফিরলো না। গুজব, এক তুর্কী নাবিক নাকি তাকে বগলদাবা ক'রে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। এই মাত্র কিছুদিন আগে পরিবারের শেষ পুরুষ জেন্দাকার কাকা সীমান্ত যুদ্ধে স্বেচ্ছায় নার্সের কাজ করতে গিয়ে শহীদদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। নড়বড়ে বাড়ি, ঘূণধরা সিঁড়ি, কপাটে বেশিরভাগ সময়ই ঝুলছে পেতলের তালা—জেন্দাকা আর কিছু টাকা যোগাড় করতে পারলেই বাড়িটার সংস্কার করবে। তিনটে ছোট ছিম ছাম ঘরই নির্জন জ্যোতিমণ্ডল, আবদ্ধ ঘরে অনবরত ঘুর ঘুর করে একটি ফিনলণ্ডীয় কুকুর—কর্ত্রীকে দেখলেই দু'পা তুলে লাফিয়ে উঠে, গাল চেটে দেয়।···

হুঁ, কে বুঝি বেহালা বাজায়।

না, বেহালা নয়, নিছক সোরগোল।

ভিক্টরদের খামার বাড়ির সামনে এক দঙ্গল গেয়োলোকের নিত্য-নৈমিত্তিক সরব জটলা। কার গাভী প্রসব করেছে, কোন গরীব চাষী ফসল ভালো না হওয়ায় শহরে গিয়ে পুঁজিবাদীর খপ্পরে পড়েছে, কার ছেলে পশ্চিমে পড়াশুনা করতে গিয়ে ছেনাল্ মেয়েমানুষের বংশবদ হয়েছে, কবে গীর্জায় উদ্দাম আত্মহারা হবে সবাই···এইসব ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা! কেচ্ছা-কীর্তনের ভাগটাই বেশি। কার বউর পাছাটা একটা বিরাট গামলার মতন, কোন লোকটার কটা চোখ কুশ্রী ট্যারা, ভেকরভিচের বিধবা বৌটা ক্রমশই যেন খানকী-স্বভাব হয়ে উঠেছে, কার গলার আওয়াজ পেঁচার মতন—এইসব নিয়ে হো-হো হা-হা ··।

জেন্দাকা কান না পেতে জটলা এড়িয়ে হন্‌হনিয়ে চলেছে।

একটি মেয়ে কপাট খুলে মুখ বের করে ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে সম্ভবত তাকেই দেখলো।. বলকান অঞ্চলে সমাধিকার আদায়ে নারী আন্দোলন

শুরু হওয়া দরকার—জেন্দাকা ভাবলো। এইসব মেয়েদের ভেতরও প্রচুর মহিমাময় বস্তু আছে, অথচ সমাজ ও পরিবার তাদের যেন অশরীরী ক'রে রেখেছে।

…'স্টুডিও আলফা'র কপাট খোলা রয়েছে বুঝি তারই অপেক্ষায়। কিছু কিছু স্বমত ও বিরুদ্ধতা সমন্বয়িত হ'য়ে আছে ওখানকার ডার্করুমে। আজ এবেলায় তারই ক্যামেরা ধরবার কথা ছিল, বেলা অনেকটা গড়িয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে জোন্দাকা লজ্জিত ও ব্যস্ত। তার কিছু কিছু দোষের মধ্যে এই একটি—সময়কে কিছুতেই তালুবন্দী করে রাখতে পারে না।

সবচেয়ে খারাপ লাগবে যখন স্টুডিও-কর্তা সাইমন দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে জবাবদিহি চাইবে। সাইমন, যার ডানহাতখানা জন্মাবধি পঙ্গু, ফটো বুঝুক না বুঝুক, পয়সা চেনে। পয়সা সে বানায়, জমায়, আবার দুর্বিপাকে হঠাৎ ফতুর হ'য়ে যায়। এক সময় গরমমশলা ও তাজা তামাকের ব্যবসায় ভালোই নাফা করেছিল, কিন্তু একদল তুর্কী হানাদার তার সর্বস্ব লুঠ ক'রে নেয়। ত্রিয়েশতি ঢুকে তার সাম্প্রতিক প্রয়াস 'স্টুডিও আলফা'। দু'ধারে আস্পেন গাছের সন্ সন্ রবের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা 'স্টুডিও আলফা' একদিকে ঘনবসতি শহর, অন্যদিকে বিস্তৃত ভূদৃশ্যের যোগবিন্দু। শহরের লোকেরা আসে বাঁকা হাসি মুখে এঁকে, গ্রামের লোকেরা আসে উত্তেজনামাখানো গভীর নিশ্বাস টেনে টেনে। কমদামী সেন্টের সঙ্গে পাতা, মাটি, গোবরের গন্ধ। গ্রাহকদের সঙ্গে সাইমনের ব্যবহার একেবারে বান্ধব ক্রীড়াসঙ্গীর মতন, তবে হিসেব মেলাতে সে কঠিন ও হুঁশিয়ার। ইদানীং জেন্দাকার তোলা নিসর্গচিত্রগুলির ভালো চাহিদা দেখে সে পুলকিত। একজন সমজদার খদ্দের বলেছিলেন, 'আমাদের এই জায়গাটা যে কত সুন্দর, জেন্দাকার এই ছবিগুলি না দেখলে বোঝা যেতো না। এতো কেবল ফটো নয়, যেন আল্পস পর্বতের অর্গ্যান ধ্বনি।…'

আবার চতুর সাইমন এও লক্ষ্য করেছে, স্টুডিওতে যারা নিজস্ব

প্রতিকৃতি তোলাতে আসে এবং তারা যদি সঙ্গিনীচ্যুত পুরুষ হয়, ক্যামেরা-লেডী জেন্দাকাকে কামনা করে। ওদের তখন একটাই বাসনা, জেন্দাকা এসে আঙুল বুলিয়ে ঠিক ক'রে দিক তাদের শরীর ও মুখের অবস্থান। লোভ-লোভ—সূর্যের হাজারটা বিস্ফোটনও যে বাসনাকে কোনদিন ধ্বংস করতে পারেনি, পারবেও না। মেয়েমানুষের চাতুরিমাখানো যৌবন যতদিন আছে, পুরুষ শাসিত সমাজ তো তার পায়ের কাছে। তথাকথিত ঐতিহ্যকে দাবিয়ে বেরিয়ে এসো, দেখবে—যাবতীয় ক্ষণায়ু নারকী বাসনা নিয়ে কত পুরুষ তাদের প্রাচুর্য্য ও প্রকাশোদ্দামতাকে নিয়ে রোমক গ্লাডিয়েটরদের মতন দাঁড়িয়ে আছে।

তবে এই জেন্দাকা পোশাকে আশাকে এখনো সেকেলে। বড্ড বেশি ঢাকা-ঢোকা, যেন কার সমাধিতে প্রার্থনা করতে এসেছে। কি দরকার বাপু, গলা অবধি ফিতে দিয়ে ঢেকে রাখবার। সোনামনি, একটু নীচু হ'য়ে দাঁড়িয়ে বুকের খাঁজ দেখাও, ভিড় আরো বাড়বে। স্কার্টের ঝুল আরো কমিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গীমায় উরু ও পায়ের ডিম নাচাও, ছবির দর আরো বাড়বে।

জেন্দাকার উচিত, পশ্চিমী দেশগুলিতে গিয়ে মহিলা-পরিচালিত সেলুনে ঢোকা, যেখানে পুরুষদের মাথায়-ঘাড়ে ব্রাশ চালাতে চালাতে সুন্দরীরা আয়নায় নিজেদের প্রায় বেআব্রু দেখায় এবং মিনিটে মিনিটে মিটার বাড়তে থাকে। এই সব উপদেশ নির্দেশ জেন্দাকাকে দেবার সাহস ও সুযোগ সাইমনের কোনদিন হবে না। এতদিন এক সঙ্গে কাজ করেও মেয়েটাকে সে দুটো সরস কথা শোনাতে পারেনি, বরাবরই ও তার নাগালের বাইরে। তদুপরি, মাঝে মধ্যে স্টুডিওতে পদার্পণ ঘটে সাইমনের মুখরা স্ত্রীর। তার হুঁশিয়ার দৃষ্টি জরিপ করে জেন্দাকাকে, খর জিহ্বা লকলক করতে থাকে। জেন্দাকা মনে মনে হাসে—এই সেই মহিলা, যাকে তুর্কী ডাকাতরা সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছিল। বেচারি! গর্ভধারণের রোমাঞ্চ তার কখনো হয়নি।

আর সামনের ডান হাতখানা—জন্মাবধি মেঠো ইঁদুরের লেজের মতন

লুজ লুজ করছে, কোন কাজের না হলেও স্পর্শকাতরতা খুব, একটু চোট লাগলেই যন্ত্রনা ঝিলিক মারে মাথা অব্দি। ভগবানের চাবুক।

জেন্দাকা স্টুডিওতে ঢুকলো সলজ্জ হাসির সঙ্গেঃ আমার নিশ্চয় অনেক দেরি হয়ে গেল।

সাইমন কফ-জড়ানো গম্ভীর গলায় বললোঃ দেরি কিনা জানি না, তবে আমি একা আর সামলাতে পারছিলাম না। একটা হাতে ক্যামেরা ধরা, ক্যাশমেমো লেখা—এ যে কত বড় বিড়ম্বনা।

ঃ আমি দুঃখিত মিঃ সাইমন।

—মাথা থেকে স্ট্র-হ্যাটটা খুলে রাখতে রাখতে জেন্দাকা বললো। হ্যাটটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ কোকড়ানো চুল শক্তিশালী ঘোড়া হয়ে লাফিয়ে পড়লো ঘাড়ের ওপর। শরীরের যেটুকু দৃশ্যমান, পরিপুষ্ট ও মাদকতাময়।

দু'জোড়া পুলকিত নজর তাকে লেহন করছে।

শহরের দুই ইয়ার, বাদাম ব্যবসায়ী এসেছে নিজেদের ছবি তোলাতে। একজন লম্বাটে, অপরজন খর্বুটে—দু'জনেরই শরীরে চর্বির দোলা। বেশ খানিকটা প্রসাধনী প্রলেপ সত্বেও গালে মেচেতার আভাস। নির্লজ্জের মতন ঘণ্টাখানেক ধরে বসে আছে জেন্দাকার সামনে পৌজ নেবে বলে।

জেন্দাকা খদ্দেরদের মর্জি মিটিয়ে, ডার্করুমে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নিগেটিভগুলিকে পজিটিভ ফর্মে এনে যখন আবার তার মাথায় স্ট্র-হ্যাটটা চাপালো, তখন সূর্য্যের মধ্য-যৌবন। ইতিমধ্যে আর দুই সহযোগী স্নলভিন এবং বোগেটা এসে গেছে অর্থাৎ জেন্দাকার এখনকার মতন ছুটি।

স্টুডিও থেকে বের হবার মুখে টাকা পয়সা আলগানো সাইমনের

পাংশুমুখের দিকে তাকিয়ে জেন্দাকা বললো : আমাকে যে ক্যামেরাটা দিয়েছেন, সেটা এবার বদলানো দরকার।

সাইমন আঁতকে ওঠে : সেকি ! নষ্ট হয়ে গেল কবে ?

জেন্দাকার গলায় ঝাঁজ : আমি বলিনি যে, নষ্ট হয়ে গেছে। তবে ভালো ইনস্ট্রুমেন্ট না পেলে ভালো ছবিও তোলা যায় না। আপনি একটা ভালো জাপানী ক্যামেরার খোঁজ করুন।

সাইমন সঙ্গে সঙ্গে অমায়িক হাসলো : করবো, করবো একটু সবুর করো, রেস্তর বড় অভাব। তাছাড়া ছবি তো বেশ উঠছে, চমৎকার ছবি উঠছে। তোমার মিষ্টি হাতের ছোঁয়ায় বাজে ক্যামেরাও অসাধারণ হয়ে উঠে।

গা ঘিন ঘিন জেন্দাকা শ্রাগ করে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বিড় বিড় করতে থাকে : বদমাশ। পাঁচ মিনিট লেট হলে গোঁপে চাড়া দিয়ে মালিকানা ফলাবে। আসল বেলা ঢুঁ ঢুঁ।··· মিষ্টি হাত ! দরকার নেই অমন কমপ্লিমেণ্টের মক্ষীচুষ কাঁহাকা !···কোন বিদেশী দপ্তরে যদি কাজ একটা জুটে যেত !···কার্বি ! কার্বি পারে না ?···তা হলে পাথরে ঠুকে লেন্স-ফেন্স, শাটার ফাটার—সব বারোটা বাজাতাম !···

বলছে বটে, তবে জেন্দাকা অন্ততঃ ক্যামেরাটা ভাঙবে না। সে ভাঙবার মেয়ে নয়। তার একটা শিল্পী সত্বা আছে। এককালে কবিতা লিখতো। এখন ছবি তোলে। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলে বিকট নির্জনতায় সে বেঁচে থাকবে কিভাবে ?···

কাঠের বাড়িটাতে বড় বড় দুটো ঘর, যথাসম্ভব তকতকে হলেও পরতে পরতে ঘুণ ধরেছে, সামান্য দাপিয়ে হাঁটা মানেই টালমাটাল ক্যাচক্যাচানি ; নীচটা তো একেবারে ফাঁকা, গুদাম হতে পারতো— এমন কেউ নেই পারিবারিক বন্ধনে, যে এই শূন্যতা ভরাট করতে পারে। প্রতিবেশীদের আবাসগুলিও একই রকম রাবিশ, কারুরই কোমরে জোর

নেই। ব্যতিক্রম কেবল বুড়ো ভাল্‌দিসা, সুদের কারবারে বৃহস্পতি যার তুঙ্গে—কাঠের বাড়িতে বছর বছর রঙের প্রলেপ, জানালাগুলিতে শাদা কাঁচ, রেডিও ও গ্রামোফোন, মায় ফোন অব্দি।···তালাতে চাবি ঘোরানো মাত্রই ভেতর থেকে অস্ফুট গর্জন। যে মুহূর্তে কপাট খুললো, ফিনলণ্ডীয় চারপেয়ে জন্তুটা লাফিয়ে উঠলো বুক অব্দি, অন্ততঃ পঞ্চাশ সেকেণ্ড ধরে গাল চাটলো। অল্পবয়সী মদ্দা কুকুর, স্বগোত্র সঙ্গিনীর অভাবে মাঝে মধ্যে কড়িকাঠ লক্ষ্য ক'রে লাফ মারে মাত্র।

জেন্দাকা দেরাজ খুলে রুটি বের ক'রে ওকে টুকরো টুকরো ছুঁড়ে দেয় এবং ও লাফিয়ে লাফিয়ে সেইগুলি লুফে নিতে থাকে।

নিজের অজ্ঞাতে বিকৃত মুখটা জেন্দাকার ক্রমশই সরল ও সুন্দর হ'য়ে আসে। সে বলতে থাকে কুকুরটাকে উদ্দেশ্য করে : আমি আছি, তাই তুই আছিস। তুই কিন্তু আমাকে ছেড়ে আগে যেতে পারবি না।

প্রত্যুত্তরে সারমেয়র ধূসর গোধূলি চোখে চাকচিক্য, কুঁই কুঁই শব্দ এবং মোটা লেজের দুলুনি।

একটু একটু ক'রে যে দুর্দৈব শীত নামছে, ঘরে বসে পোশাকের ভার খসিয়ে ফেলতেই টের পাওয়া গেল। রান্নাঘরটা একসময় পরিবারের সৌখীন ঘর ছিল, যেখানকার তুবড়ে-যাওয়া রিপাউসটা হিটারের সুইচের ঠিক নীচে।

হিটারে জল গরম ক'রে হাত-মুখ-পা ধুয়ে ফেললো জেন্দাকা। আজ কার্বির সঙ্গে সাঁতার কাটবার কথা আছে। তাকে কি সত্যি তলব করবো? ইচ্ছে হোক, না হোক, টাকার দরকার যে খুব। হাজারো গোঁজামিলেও ফন্দিবাজিতে আটশ ড্রাচমাকে বারোশ' ড্রাচমাতে পরিণত করা যে কি বিকট সাধনা! সাধনায় সাফল্য আসবার সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িটারও জেল্লা এমন ফিরে যাবে যে ওপরের সিঁড়িতে একটা নুড়ি ছেড়ে দিলে সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে অমলিন অবস্থায় রাস্তায় নেমে আসবে। কিচেনটা আবার বাহারী ঘরে পরিণত হবে, বাথরুমের পাশের ভাঙ্গা ঘরটা খাড়া হ'য়ে দাঁড়াবে হেঁসেল হিসেবে, নীচের ফাঁকা লম্বা ঘরটা হবে

হলঘর, যেখানকার দেয়ালে মাতিসের স্বল্পবসনার সঙ্গে জেন্দাকার ক্যামেরাবিদ্ধ গুলিয়ান আল্পস্। সিমসন কোম্পানীর সোফা-সেটের সঙ্গে লায়ন এ্যাণ্ড ক্রোকোডাইল-এর স্টিল ফার্নিচারগুলি রাজযোটক। তখন ফোনে ইয়ারদের সঙ্গে বাতচিৎ করতে জেন্দাকাকে আর বুড়ো ভাল্‌দিসার বাড়িতে ছুটতে হবে না। সকলের তখন প্রশংসার্হ দৃষ্টি ঃ হুঁ, মেয়ে বটে জেন্দাকা।

কিন্তু কার জন্য ?

জেন্দাকা তুমি কার ?
বড়ই নির্মম বেহালার স্বর !

এ জিজ্ঞাসাটা যদি পাকাপোক্তভাবে বুকে বাসা বাঁধে, জেন্দাকা তার মারই মতন ভেসে যাবে।···সময় আসবে, সুসময় আসবে, যখন এই সাধের আবাসেই সে তার সংসার পাতবে। সৎ, সুন্দর, বিশ্বস্ত সঙ্গী সে তখন খুঁজে নেবে।···টুকিটাকি কত জিনিসেরই তখন যে দরকার ! তার তৈলাক্ত মুখকে সুখী সুখী দেখাতে বেশ কয়েকটি মূল্যবান স্কার্টের দরকার, রং-বে-রং ফিতে দরকার, এমন একটি স্বচ্ছ নাইটি থাকবে তার, যা তার শান্ত সংযত পুরুষকেও কামুক ক'রে তুলবে। তারপর বিদেশী দপ্তরে নকরি যদি মেলে, সব বাসনাই তো ফৌত।

গূঢ় কথা হলো, ক্যামেরা পয়সা দেয় না, আনন্দ দেয়। ঐশ্বর্যের কাল্পনিক রবরবায় একাকী জেন্দাকা দেয়ালে ঝুলন্ত সাইমনের পুরনো ক্যামেরাটার বিবর্ণ কভারটার ওপর দুটো নিঃসঙ্গ চুম্বন দিলো। একরকম ছুটে গিয়ে হিটারের ওপর থেকে ডিমের লেই মাখানো পাউরুটি-গুলি নামিয়ে রাখে। গোলমরিচের মিহি গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়। দগদগে হিটারের ওপর জল বসায় কালো কফি বানাবে বলে। তারপর সে টাকার গরমাইয়ে ফুটন্ত মহিলার মতন সদর্পে পায়চারি করে কিছুক্ষণ। গরম জলের সাঁই সাঁই রব এবং ওরই তালে তালে যেন সে শীস দিয়ে দিয়ে স্বরচিত গান গায় ঃ

পাহাড় আমার মা, নদী আমার বোন
তোমরা—
তোমরা—
আমায় খুঁজে মরো এ কোন, সে কোন।
সুখ বলো, প্রেম বলো
ভ্রমরা—
ভ্রমর
অতলে ডুবেছে মন।

দুই হাতে নিজের স্তন তুলে দেখায় বাক্যরহিত অদৃশ্য কোন জনকে। শীসটাই জোরালো বাতাস হ'য়ে উঠছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, জেন্দাকার কুকুর দু'পা তুলে নাচতে আরম্ভ করেছে। শীস দিতে দিতে হাততালি দিতে দিতে একসময় ক্লান্তি নামে জেন্দাকার ওপর। সর্বাঙ্গ জুড়ে স্বেদ। নিরাভরণ যুবতী কাঠের পাটাতনে শয্যা পাতলো। তখনো টগ বগ জলের সাঁই সাঁই আওয়াজ। মুখে ডিম মাখানো পাউরুটি রেখে কি যেন ইশারা করতে থাকে কুকুরটাকে। ফিনলণ্ডীয় মদ্দা কুকুরটার গোটা শরীর আরো ফুলে ফুলে উঠছে, লকলকে জিভ মেলে গুটি গুটি লোভী চোরের মতন এগিয়ে আসতে থাকে সে।

এমনি মেয়ে জেন্দাকা তার মার্কিন ইয়ার কার্বির সঙ্গে নির্জন নদীর জলে, পাহাড়ের গোপন খাঁচে কিছুক্ষণ প্রেম-প্রেম জংলা খেলে বেশ কিছু হাতিয়ে ফিটফাট পোশাকে ও ক্যামেরা-কাঁধে এখন মিটার লোচিনের মুখোমুখি।

ঘরময় এ্যালকহলিক গন্ধ, পোড়া সিগ্রেটের ছড়াছড়ি, বিপন্ন প্রেমিকের গভীর মনস্তাপ আর কি!

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে খাদগম্ভীর স্বরে বিনীত লোচিন আবার বললো: বসুন, ম্যাডাম।

ম্যাডাম বসলো চেয়ারে, ক্যামেরাটা দুলতে থাকলো হাতলে:

বোতল গেলাস—শশের শিশি—আপেলের কুচি···ইত্যাদি ভাগাড়ের বস্তুকে সাফ-সুফিয়ে সিঁটিয়ে গুটিয়ে লোচিনও উঠে বসলো চৌকীর ওপর। জেন্দাকার বাঁকা পর্যবেক্ষণ, এই পলকা চেহারার লোকটার মধ্যে এমন কোন দ্যুতি নেই, যা প্রথম দর্শনেই একটি মেয়েকে ঘায়েল করতে পারে। আঁটোসাটো লাল জামার তলায় পাখির খাঁচা বুক, কেবল অনেকখানি বিমর্ষ বিস্ময় সত্বেও ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি—এই নত্যর রাজপুত্তুর, এই লোকটাই একটি অস্পর্শিত গ্রাম্য মেয়ের মনে মহাপ্রলয়।

না জানি, কি মুখোশ পরে দাঁড়িয়েছিল নত্যর সামনে! পরিচয়ে গভীরতা বাড়লে তবু না হয় সম্ভব, কিন্তু তাই বলে প্রথম নজরেই নেতিয়ে পড়া বেচারি নত্য! নত্য!

মাথার ভেতরকার কটকটে দগদগে ভাবটাকে চেপে রাখতে রাখতে লোচিন বললো: আপনি বলুন।

জেন্দাকা আর একবার ওর চেহারার মধ্যে কোন জান্তব অভিব্যক্তি খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টার পর মুখ খুললো: সে আর বললো? সে বেচারি তো দুশ্চিন্তায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

লোচিনের কণ্ঠনালীর কাছে আটকে থাকা ঢেঁকুরটা সশব্দে মুক্তি পেলো: দুশ্চিন্তা আমারও কম নয়। কিন্তু আমি নিরুপায়।

জেন্দাকা বেদনার্ত গলায় বললো: আপনি আর যাচ্ছেন না কেন?

লোচিন তার মিয়ানো স্বরে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনিময় গর্জন তুললো: ওটা তো কোন পরিবারের আবাস নয়, কতগুলি খুনেদের আড্ডা। ভাবতে পারেন, জানালার সামনে সব সময় কেউ না কেউ বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে যুবতী মেয়ের প্রেমিকা খুন করবে বলে। বর্বর! বর্বর!

ঘড়ির দোলকের মতন লোচিনের সংক্ষিপ্ত গালিগালাজ দুলতে লাগলো।

জেন্দাকা ঠোঁট কামড়ে থাকে। বললো: তার জন্য নিশ্চয় নত্য দায়ী নয়।

এক এক বাড়ির প্রতিরোধব্যবস্থা এক এক রকমের হয়ে থাকে। তার জন্য মেয়েটিকে ভুল বুঝলে তো চলবে না। বরং সেই শৃঙ্খলিত অসহায়ার জন্যই আপনাকে আরো সাহসী ও বেপরোয়া হয়ে উঠতে হবে। পরিবারের সকলের কাছ থেকে অজস্র ছুঁচফোটানো মন্তব্য তাকে প্রতিক্ষণে হজম করতে হচ্ছে! আপনাকে যেতেই হবে। একটি মেয়ের জীবন-মরণ সমস্যা। বিশেষতঃ নত্যর মতন নরম স্বভাব—

লোচিন আর শারীরিক অস্বস্তি না চাপতে পেরে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে তোয়ালেতে মুখ ঘষতে গিয়ে ছোট্ট আয়নায় নিজের পরাস্ত হৃদয়কে দেখতে পায়! চোখ-দুটো লাল, অভিব্যক্তিতে সেই ধূর্তামির রেখাগুলি কিছুতেই চাপা থাকছে না। জীবনের এতটা সময় সে যে ছল-চাতুরির খেলা খেলে এসেছে, নত্যর সংস্পর্শ কি তাকে একেবারে মুছে দিতে পারে? সন্দেহ হয়, যে কোন মুহূর্তে সে আবার তার পুরানো স্বভাবে ফিরে যেতে পারে।

পায়ের ও মাথার ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে মিটার লোচিন আবার ফিরে এলো নিজের জায়গায়। এই সময় জেন্দাকার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষনী হয়ে ওঠে। সে যেন লোচিনের অন্তঃস্থল অব্দি দেখতে পাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলো: দুঃখ ভুলতে আপনি কি মদ্যপ হ'য়ে উঠেছেন?

: কিছুটা তাই। তবে মদে আমার কোন কালেই অনীহা ছিল না।

: আশা করি, এবার আপনি নত্যর সঙ্গে দেখা করবেন।

জেন্দাকা ইচ্ছে করেই নত্যর সম্ভাব্য বিবাহ-প্রসঙ্গ তুললো না।

লোচিন আরো কিছুক্ষণ থম মেরে থাকে। তারপর হেসে ওঠে: ধরুন, আমি যদি আর ও মুলুকে না যাই? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রেম করাটা তো আমার নাও পোষাতে পারে।

ওর ঝক্‌ঝকে হাসি দেখে জেন্দাকা মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই বিদ্রূপে শান দিলো: তা হলে বুঝবো, আপনি কেবল লম্পট

নন, ভীরুও। সেই অবস্থায় আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, আপনার সম্পর্কে নত্যাকে হুঁশিয়ার করে দিতে। দরকার হ'লে নত্যার বাবা-মাকে আপনার ঠিকানা ও নষ্টামির হদিশ পৌঁছে দেব। জানেন না তো, তাঁরা কি ভয়ঙ্কর মানুষ!'

লোচিনের মুখে তোয়াজের হাসি ঃ দেবী, তাঁরা যে কোন ধাতুর জীব, অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। তবে আমিও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি। বিশেষত, নিজের প্রেমিকাকে হারাবার ভয়ে আমি সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক!

লোচিনের ভঙ্গীমা দেখে জেন্দাকা না হেসে পারে না।

লোচিন কিন্তু সেই মুহূর্তে অনেক কিছুই ভেবে নিয়েছে। যদি সে প্রকৃতই আর ঝুঁকি নিতে না চায়, সে যে কেবল জেন্দাকাকে হারাবে, তাই নয়, এই অপরিচিতা তাঁর কাপুরুষতা সম্পর্কে প্রচুর দুর্গন্ধ ছড়াবে। লোচিন ভাবতেই পারে না, কোন মেয়ের নজরে সে এমন হেয় হ'য়ে থাকবে। সর্বোপরি, নত্যার বাড়ির লোকগুলি বোধহয় প্রকৃতই দুর্দান্ত—টেক্সাসমার্কা মানসিকতা নিয়ে ওরা নির্ঘাৎ লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে।

লোচিন বললো ঃ তাহলে আমি কি আবার নত্যার জানালা বেয়ে উপরে উঠে আসবো ?

ঃ তার আগেই বন্দুকের নল গর্জে উঠবে।

ঃ প্রাণ দেবো।

ঃ না, প্রাণ দেওয়াতে বাহাদুরি থাকলেও সুরাহা নেই। কৌশল করতে হবে।

ঃ নত্যা যে ঘর ছেড়েই বের হতে পারে না।

জেন্দাকা গালে হাত দিয়ে ভাবে ; ভাবতে ভাবতে বলে ঃ উপায় একটা আছে। আমি স্টুডিও আলফায় ছবি তুলি। আবার আমি ওদের পারিবারিক ফটোগ্রাফারও। আগামী বুধবার নত্যার মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নত্যাকে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে আসবো সকাল

ন'টার মধ্যেই। স্টুডিওর মালিকও ঐদিন ঐ সময় বাকি দু'জন স্টাফকে নিয়ে দক্রকায় রওনা দেবেন ফ্লিম কিনতে। এই সুযোগে আপনাদের দু'জনকে মুলাকাৎ করিয়ে দেবো একেবারে নির্জনে। জেন্দাকা চোখ টিপলো।

এক পেট মদ থাকা সত্বেও প্রস্তাবের চমৎকারিত্বে মিটারের রক্তে যেন তুর্কীনাচ শুরু হ'য়ে যায়। এমন সম্ভাবনার কথা সে কখনো ভাবতেও পারেনি। আর যাই হোক, সেই অসাধারণ রূপসী নরম মেয়েটি কিছুক্ষণের জন্য তার বক্ষলগ্না হয়ে থাকবে!

সামনের দিকে ঝুঁকে লোচিন সাগ্রহে বললো ঃ পারবেন? পারবেন আপনি?

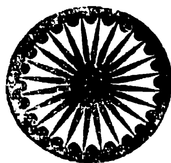
জেন্দাকা বললো ঃ ভরসা রাখতে পারেন।

লোচিন এবার জেন্দাকাকে স্পর্শ করে, ওর একখানা হাত নিজের দু'হাতে চেপে ধরে।

ঈষৎ শিহরিত জেন্দাকা অনুভব করলো, মিটার লোচিনের রক্ত কত গরম! এমন টগবগে রক্তের ছেলেরা ঘরের মেয়েদের প্রান্তরে এনে দাঁড় করায়। অথবা, কোন মেয়েই রক্তের এই উত্তাপকে অস্বীকার করতে পারে না।

জেন্দাকাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে এলো লোচিন। মেয়েটি নাকি কার্বির বান্ধবী। কার্বি মনে মনে লোচিনকে ভয় পায়। আর সেই লোচিন এখন এই মেয়েটির দুঃসাহসিক প্রস্তাব নিয়ে রীতিমতন খাবি খাচ্ছে।

প্রকৃতই কি ও নত্যাকে স্টুডিওতে নিয়ে আসতে পারবে এবং সত্যি কি লোচিন প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাবে নত্যাকে? না কি, এ একটা ফাঁদ? একবার উদ্যত বন্দুকের নল দেখতে পেয়ে লোচিন আর সহজে গা-আলগা হতে পারে না।



নিষ্ঠুর শীত নামছে।

শীত আসা মানেই প্রত্যেকের পাথরচাপা বুক। প্রতিমুহূর্তে মনে হয়, ঘুঙুর পায়ে কে বুঝি হাঁটছে। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ঘুঙুর বোলে পাতা ঝরার বিষণ্ণতা। তাজা প্রকৃতি দেখতে দেখতে জরাজীর্ণ হ'য়ে ওঠে। মাঝরাত্তিরে অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে যায় হু হু বাতাসের গোঙানিতে।

পাহাড়ী লোকদের এই সময় গৃহত্যাগের হিড়িক—শীত ও তুষার-ঝড়ের দাপট সইতে না পেরে সমতলভূমির উদ্দেশ্যে শুরু হয় তাদের পিল পিল পিঁপড়ে-যাত্রা। মাঠে-ময়দানে, গোরস্থানের ধারে, পাইন বনের ভেতরে তাঁবু ফেলেছে তারা। নামেই তাঁবু, আসলে শতছিন্ন মোটা কাপড়; হয়তো গত বৎসর রিলিফ হিসেবে পেয়েছিল, শীত বিদায় নিতেই তাঁবুগুলির ওপর অত্যাচারের দাপট ফলিয়েছে। এবার আবার শীত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষার হাত। শহরে দল বেঁধে চক্কর কাটে কঠিন ও সরল মুখ। মেয়েগুলির স্বাস্থ্য দেখবার মতন। পয়সা দিলে এমন নাচ দেখাবে যে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং ঐ মেয়েই যাবার সময় পকেট সাফ ক'রে যাবে।

এই সময়ই রিলিফ দপ্তরের কাজ তুঙ্গে। মেজর টুডি কেবল রিলিফ পৌঁছে দেন না, মার্কিন সরকারের অপার গুণবর্ণিত প্রচুর প্রচারপত্রও বিলি করে আসেন। ছোট ছোট যাযাবর ছেলে-মেয়েরা ঐ হ্যাণ্ডবিল গুলি বিলি করবার দায়িত্ব নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম-গঞ্জে হানা দেয়। কেবল দাও-দাও-আর দাও। তাঁবু দাও, গুঁড়ো দুধ দাও, বিস্কুট দাও, এ্যান্টিবায়োটিক দাও, আবার গর্ভনিরোধক পিলের মতন অর্থহীন বস্তুও দিয়ে আসো মুঠোমুঠো।

'তাই খুব খাটুনি বেড়েছে মিটার লোচিনের। অবশ্য একঘেয়ে

কর্মহীন জীবনের চেয়ে এমন এলোপাথাড়ি ছোটাছুটিতে আনন্দ বেশী।...

ডাঁই করে রাখা পলিথিনের গাদা গাদা শিট নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে সে। স্টিয়ারিংটা কিন্তু তার হাতে নেই, চালকের আসনে বিশালদেহী মার্কিন পুরুষ কার্বি। কার্বির লোমশ হাতের প্রতিটি রোমকূপে একটি ক'রে চকচকে তুষারবিন্দু। উন্মাদের তলোয়ার চালনার মতনই কালরাত থেকে তুষার ঝড়। পথ-ঘাট খানা-খন্দ সব ধূসর-শাদা। বাতাসের ঝাপটায়-ঝাপটায় মিটার লোচিনেরও ঝোড়ো চেহারা।

ঠোঁটের চুরুটটা নিভে যেতে আর লাইটার ধরায়নি। কার্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকলো ঃ কার্বি।

কার্বি ওর প্রথম ডাক শুনতে পেল না। বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল সেই শব্দ।

লোচিন গলার স্বর উঁচু পর্দায় তোলে ঃ কার্বি!

এবার কার্বির চোখের মাংসল থাকে কম্পন ওঠে, সামান্য ঘাড় ঘোরায় ঃ

বলো।

ঃ আবার কবে যাবে অ্যামেরিকায়?

ঃ এখানে যা এলাহী কাণ্ড চলেছে! তবু যদি মেজর ট্যুরের কাজ দেন তো আগামী মাসের সাত তারিখে বিমানে উঠবো।

ঃ আশা করি, শিকাগোতে একবার ঢুঁ মারবে।

ঃ তোমার দরকার থাকলে, নিশ্চয় যাবো।

ঃ কেবল আমার প্রয়োজনের কথা বলছো কেন? সেই যে একবার ছবিটা দেখে ফেলেছিলাম—তোমার গার্লফ্রেণ্ড জিনি রয়েছে না?

কার্বি হাসলো। তার জণ্ডিস রুগীর মতন চোখের মলিন তারাতেও লোভ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। উদ্‌ভ্রান্ত বাতাস তার বুক চাপা

উল্লাসকে ফুঁৎকারে উড়িয়ে নিয়ে গেল। পাতলা বরফের আস্তরণকে চূর্ণ করতে করতে ধেয়ে চলা গাড়ির চাকায় রহস্যময় শব্দ।

হঠাৎ কার্বির কাছে মুখ নিয়ে লোচিন বললো ঃ এই গরীব-গরবার দেশেও তো তুমি নিরামিষ নও, বন্ধু। তুমি একজন লোক্যাল লেডীকে গার্লফ্রেণ্ড হিসেবে পেয়েছ, তাই নয়?

কার্বি ভূতগ্রস্ত দৃষ্টিতে ও স্বরে গোঙাতে থাকে ঃ তো-তো···

লোচিন নিজের পাতলা গোঁফের ওপর আঙ্গুল রেখে তীক্ষ্ণ সর্পিল দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললো ঃ জানি হে, জানি, সব জানি। তোমার সেই বান্ধবীর নাম জেন্দাকা।

টোপ গেলা মাছের মতন ছটফটিয়ে উঠলো কার্বি। আর একটু হলেই হাতটা উঠে যেত স্টিয়ারিং থেকে।

লোচিন অবশ্য পরম হিতৈষীর মতন ব্যস্ততার সঙ্গে বলতে থাকে ঃ আরে, আরে-ইয়ার, ঘাবড়াবে না। নিজের গোপন কারবারে তোমাকে একটু আধটু ব্যবহার করি বলে ভেবো না যে, সর্বক্ষেত্রেই তোমার পিছনে কাঠি দিয়ে বেড়াবো! এখানে আমার কোন খারাপ অভিসন্ধি নেই। আমি তোমার সুইটহার্টকে নিয়ে কোন রকম ফস্টিনস্টি করবার মতলবে নেই।

কার্বি গম্ভীর স্বরে বললো ঃ জেন্দাকা সস্তা মেয়ে নয়।

কথাটাকে লুফে নিয়ে লোচিন প্রচণ্ড প্রাজ্ঞব্যাক্তির মতন ঘাড় নাড়ে ঃ নিঃসন্দেহে শ্রীমতী জেন্দাকা মূল্যবান, যদিও আমি দরাদরি করিনি। আমি কেবল তোমার কাছে জানতে চাইছি, তাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা?

কার্বি এবার পাল্টা প্রশ্ন করে ঃ আগে বলো, কি ব্যাপারে তুমি তার আস্থা ভিক্ষা করছো?

গাড়ি ক্রমশই শহুরে পরিমণ্ডলকে পিছনে মুছে ফেলছে,···শেষ মনিহারী দোকানটি···শেষ খাবারের দোকানটি···কোথায় যেন রেডিও

বাজছে···কুয়াশা কমবার বদলে আরো নিঃসীম অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে চরাচর।

মিটার লোচিন ঈষৎ লজ্জিত স্বরে বললোঃ ব্যাপারটা কি জানো, আমিও একটি স্থানীয় মেয়ের প্রেমে পড়েছি। কিন্তু মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনেরা বড় কট্টর, নিষ্ঠুরও। একমাত্র জেন্দাকাই তার কাছ থেকে গোপনীয় বার্তা বয়ে এনেছে আমার কাছে। আমি ফটোগ্রাফার মহিলাটিকে চিনি না, তুমি চেনো। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, ওর কথাগুলি কি বিশ্বাস্য ?

কার্বি কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপরই যেন চাবুক খেয়ে পাক্কা উন্মাদের মতন হো-হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়েঃ এই বাৎ! জেন্দাকার ওপর তুমি শতকরা একশ' পঁচিশভাগ নির্ভর করতে পারো। ব্যঙ্গচ্ছলে ও অনেক রকম দুষ্টুমি করে সত্যি, কিন্তু কোন অপরিচিত যুবককে ও কখনো বিপদে ফেলবে না, বরং আপ্রাণ চেষ্টা করবে তার আস্থা অর্জনের। এটা নিশ্চিত। হুঁ, এটা নিশ্চিত।

গাড়ি একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল।

আদিবাসী পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী, ছেলে-বুড়োর দল চকচকে চোখে তাকালো, অনেকে ছুটে এলো।

ঝকঝকে গলায় একটি যুবতী মেয়ে গান ধরলো কোমরে হাত রেখে। দুর্বোধ্য কথা, কিন্তু সুরে মাদকতা। কার্বি এবং লোচিন দু'জনই মেয়েটির সর্বাঙ্গ দেখে নিয়ে কেমন শির শির অনুভূতিতে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। এত হিমপাতের মধ্যেও মেয়েটির দুই হাঁটু অনাবৃত, ফলতঃ ওর পুরুষ্টু পায়ের ডিম দুটো মূল্যবান কোহিনুর হ'য়ে ডাকছে। সরু কোমরের ওপর অমন পাহাড়ী বুক এই পাহাড়ী মেয়েগুলিরই থাকে। আর কী ভরাট পাছা।

মিটার লোচিন ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললোঃ বাহ্! কী চমৎকার তোমার গলা!

সে প্রত্যুত্তর দিলোঃ হি-হি-হি···

লোচিন একটা গুড়ো দুধের টিন ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো ঃ এটা তোমার এই সুন্দর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য।

সে কৃতজ্ঞতা জানালো ঃ হি-হি-হি ··

'মেয়েটার গড়ন অদ্ভুত! ভোলা যায় না।' —ফেরবার পথে সর্বক্ষণ লোচিন ভাবলো। আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি হুঁশিয়ারী ছুঁড়ে দেয়—'ছিঃ! তুমি না প্রেমিক! নত্য বাঁধ ভেঙ্গে আসবে জেন্দাকারের স্টুডিওতে কেবলমাত্র তোমার সঙ্গে মিলিত হবার আশায়!'

রীতিমতন অস্থিরতা লোচিনের, কার্বি আশ্বস্ত করলেও তার মন থেকে ভয় দূর হয়নি। সে যে নির্নিমেষে একটি অচেনা ভয়ের দৃশ্যকেই দেখতে পাচ্ছে। তার মন কু গাইছে, কিছু একটা সাংঘাতিক ঘটবে। রক্তপাত, খুনোখুনি, আত্মহত্যা···।

তবুও নির্দিষ্ট দিনে বুকের দ্রিমি দ্রিমি বাদ্য নিয়ে লোচিন সাহেবের সাত সকালে অভিসারে চলা। ডেরা থেকে নামামাত্রই অসংখ্য পিঁয়াজ কুচির মতন নরম বরফে তার বুটের চামড়া ভিজে গেল। পরণে নীলকোট, নীল টাউজার্স, নীল হ্যাট। কিন্তু আকাশ নীল নয় এবং পৃথিবীও সবুজ নয়। আকাশে অনেকগুলি ধূসর রবারের বল এবং চরাচরে স্রুড়ুত ক'রে কে একজন এক পোঁচ লাল রং তুলিতে বুলিয়ে দিয়ে গেল। শীতের দাপট আরো বেড়েছে, বাড়বে, শীতার্ত মানুষের পক্ষে এখন বহির্মুখী হওয়া দুঃস্বপ্নের সামিল। নির্জন পটভূমিতে সে-ই একমাত্র জীবন্ত, একটি সচল বিন্দু!

ব্লো-আপ বাহাদুরি কিন্তু একমাত্র জেন্দাকার। নানান ফাটলে হরেক বিশ্বাস ও আস্থার বীজ বুনে সে ঘরের বাইরে টেনে এনেছে নত্যকে।

কারুর মনে যথার্থ ধন্দ জাল বুনতে শুরু করবার আগেই নত্য তার হাত ধরে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে পথে। গোলাপী অলেস্টার এবং কান

ঢাকা শাদা টুপিতে সজ্জিত নত্য বুঝি বা একটি পিঞ্জর মুক্ত পক্ষী, আর এক বিহঙ্গ জেন্দাকাকে জড়িয়ে ধরে ছ'গালে ছুটি বিমূর্ত চুম্বন এঁকে দিলো।

ঃ জেন্দাকা, আগে যদি তোমাকে সব জানাতে পারতাম।

ঃ সময় তো এখনো আছে।

ঃ সে ঠিক আসবে তো?

ঃ না এলে বুঝতে হবে, সে প্রতারক, লম্পট।

নত্য শিউড়ে ওঠে। না, না, সে নিশ্চয় আসবে। মা মেরী, সে যেন আসে। সে না এলে আমি বাঁচবো না। আত্মহত্যা করবো।··· নত্য নিজেকে এই মুহূর্তে কেমন দেখাচ্ছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্য ব্যাকুল। নিজেকে ঠিক ঠিক স্মার্ট লাগছে কি না, শহুরে প্রেমিকের দৃষ্টিতে তার এই সাজ আপ-টু-ডেট মনে হবে কিনা—এই সব ভাবনা-গুলিও কম শক্তিশালী নয়।

দিক চক্রবালে কেউ নেই। বাতাস নারকীয়ভাবে শীতল। কর্মতৎপর কৃষক পরিবারগুলিকে ও গাপ ক'রে নিয়েছে। গাঁয়ের ধনী বুড়ো স্টেন রইসের হাতীমুখো মোটর গাড়িটা পথে বেরিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে, গাড়ির মধ্যে বসে বিব্রত বুড়ো গলাখাঁক্রি দিতেই নত্য আরো টুপিটা টেনে দিয়ে চলার গতি বাড়ালো।

পেছন থেকে জেন্দাকা বললো ঃ এই, তুমি যে ছুটতে শুরু করলে।

নত্যর মুখ থেকে কোন স্বর বের হয় না।···

স্টুডিও আলফায় চাপ চাপ জমাট অন্ধকারে বিমর্ষ ও বিব্রত সাইমনের মনে হচ্ছে, সে বুঝি দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা অন্ধকার টানেলের মধ্যে আটকে আছে এবং পিছন থেকে কেউ ধাক্কা না দিলে সে আর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। আসলে কাল রাতে মুখরা কামুক বউ তাকে একেবারে নিঙড়ে নিয়েছে। মাগীর আবার তুষার পাতের সময় রস বেশি গড়ায়। পঙ্গু হাতটা ঝিন ঝিনে, মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিমে এবং

গালগলা চেপে ধরা—এমন শরীর নিয়ে ঐ হিমেল আবহাওয়া উজিয়ে তাকে কিনা যেতে হবে দূর শহরে কাঁচা ক্রিম সংগ্রহ করতে। শহর-তলীতে ব্যবসা ফাঁদা যে কী ঝকমারি, আজ হাড়ে হাড়ে টের পাবে। যেতেই হবে, কারণ এরপর বাতাসের গতি ও বরফ পাতের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। অবিশ্যি সে একা যাবে না, স্থুলভিন ও বোগেটা যাবে সঙ্গে। এখন আজকের মালিকানী জেন্দাকা রূপসী এসে পড়লেই তারা যাত্রা শুরু করবে। বাতাসের গোঁ গোঁ রবে রাত জাগা বউর পাঁচালী যেন শোনা যাচ্ছে। এখনো পলিত ঠোঁটে যন্ত্রণা। সাইমন মর্মে মর্মে জানে, তার হরমোন-শক্তি আর তেমন তেজালো নয়, তবু সহধর্মিনী খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হাতিয়ে হাতিয়ে, 'শিব' জাগাবে, চোখ সরু ক'রে অভাবনীয় অশ্লীল কথা বলতে বলতে স্বয়ং উঠে আসবে, মর্দানীর লালাভরা ঠোঁট আর দুই চোখে রামধনু রঙের রিঙ দেখতে ছোট ছোট রোমাঞ্চের ঘাই সাইমনও মারতে শুরু করে দেবে···তখন আর কি ছাই কোন যন্ত্রণা, চিন্তাভাবনা এই সব থাকে! তখন মাখনদলার মতন এক গামলা উলঙ্গিনী বৈধ মেয়েমানুষটাকেই জেন্দাকা বলে ভাবতে হয়। হুঁ, জেন্দাকাই তার শরীরের ওপর বসে বসে শুয়ে শুয়ে খাবি খাচ্ছে,···বাস্তব আর কল্পনার সীমারেখা পার হয়ে এলো-পাথাড়ি মাটি খোদা গর্তের থাস্ থাস্ শব্দ শুনছে সাইমন।···

দুর্বল সাইমন ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে।

হুঁ, ঐ তো জেন্দাকা আসছে। কিন্তু ওর সঙ্গে ওটি কে? আহ, যেন টসটসে আপেল দিয়ে তৈরী একটি পুতুল! সাইমনের অসহায় দৃষ্টিতেও অবিমিশ্র মুগ্ধতা ফুটে ওঠে।···

আমি মিটার লোচিন ভেরোভিক আর পাঁচজনের দৃষ্টিতে বুনিয়াদী না হলেও একেবারে পায়ে ঠেলা ভীরু কাপুরুষ নই, যেহেতু আমার চাকরিটাই মস্ত তকমা এবং আমার পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের কঠিন অভিজ্ঞতা। তবে হ্যাঁ, হুঁস হারিয়ে যারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমি

তাদের বৃত্তান্ত পাঠ ক'রে উৎসাহ বোধ করি না। আমার কথা হলো, চলার পথে তুমি যেমন ভীরু হবে না, তেমনি হঠকারীতাকেও প্রশ্রয় দেবে না। ও ব্যাপারে তুরস্কে প্রচলিত সেই হিতকারী পংক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

আবাস যদি খুঁজে না পাও বন্ধু
শুয়ে থেকো পথের ধারে।
কিন্তু তুমি শ্রান্ত থাকো যতোই
ঘুমাবে না এ অচেনা অজানা রাতে।

সেই হেতুই হুটমুট স্টুডিওর মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষার অধিকারটুকু হারাতে চাই না, কারণ মানুষের রক্ত বড় দুর্ঘট। এমন নির্জন সকালে যখন আকাশে একটা দিলখুশ পাখিও দেখা যাচ্ছে না,আমাকে যদি কেউ খুন ক'রে লাশটা বেমালুম গাপ করে ফেলে, শালা এ জুজুর দেশে কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না। সুন্দরী অস্পর্শিতা নত্যর কথা মনে এলে আমার উদ্দীপনা হঠাৎ- চতুর্গুণ হয়ে ওঠে সত্যি, কিন্তু এখানকার লোকদের সম্পর্কে আর কতটুকুই বা জানি—কুর্নিশ করবার ছলে গ্রীসে আমি একবার একজনকে ছুরি চালাতে দেখেছিলাম। আরেব্বাস! সত্যি কথা বলতে কি, এক সন্ধ্যার পরিচয়ে জেন্দাকার মতন সপ্রতিভাকে বিশ্বাস করাটা ঠিক নয়, বিশেষত মোটা মাথার কার্বির নারী সম্পর্কীয় ভুল সিদ্ধান্তের পৌনঃ পৌনিকতার কথা রিলিফ দপ্তরে সকলেই জানে।

লোচিন তার কোটের পকেটে হাত ঢোকালো একটি বিশেষ অতি শীতল বস্তুর স্পর্শ নেবার জন্য। আঙুলগুলি সেই বিশেষ বস্তুর শরীর একরকম স্থিতধী হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তাক্ত বুকের মধ্যে শত শত পিঁপড়ে জেগে ওঠে। সব স্মৃতি বাধন ছিঁড়ে এক সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে যেন। একটি আধুনিক অ্যামেরিকান চারঘড়া, তিনটে কার্তুজ লোডেড, খুব উন্মুখ—অনূঢ়ার সঙ্গে প্রথম মিলন যদি বারুদ ও রক্ত প্রার্থনা করে, কখনো নিরাশ করবে না। পিস্তলে হাত রেখে মিটার লোচিন

আবার সেই দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা হয়ে উঠতে চাইছে। ধুনুরীর যন্ত্র ছিঁড়ে যাবার মতন আঁতকা চমকে সে তার শৈশবে ফিরে গেল। ভুলে গেল পৃথিবীর এখন বড় শৈত্যসুখ—তার সর্বাঙ্গে হিম ঝরছে! সে কেবল ভাবছে, সে বুঝি তার কৈশোরে— যখন সে কত রকম দুষ্কর্ম না করেছে! মাত্র আঠারো বছর বয়সে এক মাতাল সৈনিকের স্ত্রীকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ছুটতে ছুটতে প্রতিরোধ অতিক্রম ক'রে সে প্রথম অনির্দেশ নিম্নমুখী।

এরো আগে, সম্ভবত বয়স যখন পনেরো, এক দঙ্গল বখাটের সঙ্গে ডকইয়ার্ডে ঢুকে চায়ের পেটি সরাবার চেষ্টা করেছিল, ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েও ছিল না কোন আপদকালীন চিন্তা। তারপর রক্তে আরো তেজ বাড়লে প্রাচীন লোল শ্লথ দেশ গ্রীসে ঢুকে কী না করছে। 'বাঘবন্দী' 'বাঘবন্দী' খেলতে গিয়ে নিজেই খাঁচাবন্দী হয়ে রইলো অনেকদিন—তার ছিলাটান শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে পঙ্গু ক'রে দেবার কতরকম চেষ্টাই না হলো! এখনো-এখনো যাবতীয় অনুশাসন-পর্বকে দাবিয়ে এক অর্থে সে অন্ধকারের জীব, তাবড় তাবড় মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে সুদূর মার্কিন মুলুকে সে আফিম চালান দেয়, তার গোপন বিত্ত ক্রমশ স্ফীত। নিজের সাংঘাতিক অতীতের এই সব অলীককল্পপ্রায় ছবিগুলিকে দেখতে দেখতে লোচিনের হাড়প্রধান শরীর উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। শিকারী বেড়ালের দৃষ্টিতে 'স্টুডিও আলফা'র দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বুকে হাঁটা গেরিলার মতন আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বুকের ভেরটা ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে—ঐ তো জেন্দাকা এবং অপরূপা নত্য, কিন্তু ওদের পাশাপাশি আরো তিনজন পুরুষ। একলাফে সকলের নজর এড়াতে স্টুডিওর পিছনে সরে গেল মিটার লোচিন। তার নজরে এলো এপাশে একটা বন্ধ জানালা, যার দুই কপাট মুখবন্ধ হলেও একটু শিথিল ফাঁক থেকেই যায় এবং সেই ফাঁকে চোখ রাখলে ভেতরটা স্পষ্ট। মিটার লোচিন তাই করলো। সে দেখছে—

নত্যর শরীর যেন সোনালি আঁশে মোড়া, অবিনাশী রঙ তার গালে, দারুণ দুঃসাহসের স্তর হওয়ায় এখনো উত্তেজনায় তার ঠোঁট কাঁপছে। স্টুডিও মালিক সাইমনের নাক উঁচু হয়, দুই চোখে পিট পিট আঁকিবুকি, 'এ কে?'

জেন্দাকা কোমরে হাত রেখে হাসলো, 'আমার বান্ধবী। ছবি তোলাবে।'

সাইমন জেন্দাকার মনোলোভা মুখের দিকে তাকিয়ে পঙ্গু হাতখানা কাঁপাতে কাঁপাতে বললো, 'দারুণ ছবি উঠবে। বিশেষত এমন মুখের মডেলও হবে চমৎকার। ইচ্ছে হচ্ছে, আমি নিজেই ক্যামেরার কাছে যাই।'

অস্বস্তিতে নত্য দুঃস্থ পুরুষের শঙ্খচূড় দৃষ্টি থেকে নিজের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। স্থূলভিন ও বোগেটাও দু'দিক থেকে স্থির নজরে দেখছে তাকে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে স্পর্ধিতা নারীর মতন যেন নির্দেশ দেয় জেন্দাকা, 'না। আপনি এখনই ফ্লিম আনতে যাবেন। এভাবে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাত্র গোটা তিনেক রীল পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে একটা আবার নষ্ট।

সাইমন সুবিনীতস্বরে বললো, 'স্থূলভিন ও বোগেটা যাক না। আমার শরীর আর বইছে না—'

বিরক্তির সঙ্গে জেন্দাকা ঠোঁট ওল্টায়, 'তা আপনার যেমন অভিপ্রায়। তবে আপনি গেলে দামের যে সুবিধাটুকু পাওয়া যেতো, তা হয়তো হবে না।'

পয়সার প্রসঙ্গ উঠতেই সাইমন যেন চাঙ্গা বোধ করে, 'না, আমি যাবো! ব্যবসায়ীর জীবনে বিশ্রামটা অভিশাপ। এসো, স্থূলভিন, বোগেটা, বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলি।'

দুই নীরব বলিষ্ঠ যুবক এগিয়ে এলো।

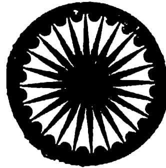
তিন মূর্তি তুষার কামড় সহ্য করতে পথে নামলো।

খুশিতে জেন্দাকা নত্যর গাল টিপে দেয়।

সাইমন, সুলভিন ও বোগেটার সামনে আদিগন্ত ধূসর আর ধূসর, কেবল পূর্বপ্রান্তিকে ঈষৎ লালিমা। তিনজনের প্রতিধ্বনি মিশে যায় বিন্দু লক্ষ্য রেখে।

আর যেন প্রতিপক্ষদের ছোটবড় অসমতল তিনটি ছায়াকে বরফে মিলিয়ে যেতে দেখলো মিটার লোচিন। মেঘেরা নীচু হতে হতে গ্রাস ক'রে নিচ্ছে সবকিছু, প্রতিটি তুষার বিন্দুতে ধূলো ও ছায়া মাখামাখি। আজ একমাত্র বিজয়ী মানুষরাই অভিযান ও অভিষেকের পথ বেয়ে আসে। মিটার লোচিনের বুকে বজ্র ও হ্রেষাধ্বনি—সে যেন প্রায় পা মেপে মেপে স্টুডিও আলফাকে প্রদক্ষীণ করে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, দুই সবল হাতে মেলে ধরে দুই কপাট।

জেন্দাকা এবং নত্য যুগপৎ প্রত্যাশা, বিস্ময় এবং পুলকে দেখলো ঃ সে এসে গেছে।



"আমি কি আসতে পারি ?"

—দুয়ারে দাঁড়িয়ে সহাস্য নায়কের প্রথম স্বর।

"আসুন, নত্য আপনারই প্রতীক্ষায়।"

—জেন্দাকা তার কাঁপানো হ্রস্ব কেশ ঝাঁকিয়ে আহ্বান জানায়।

মিষ্টার লোচিন ভেতরে এসে দুই লেডীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো সুশিক্ষিত ইংরাজদের ভঙ্গীমায়।

অভিবাদন শেষে নত্যর টকটকে মুখের ওপর তার দৃষ্টিপাত এবং মৃদু হাসি ; হাসির সঙ্গে সঙ্গে বারকয়েক তার ভ্রূ ধনুকবাঁকা হ'য়ে উপরে উঠলো ও নামলো।

আপন মুগ্ধতায় নত্যর ঠোঁটে ও চোখে ছায়া ফেলে অদ্ভুত ভাবালুতা।

প্রাচীন কাব্যের নায়িকারা পরম শক্তিধর পুরুষের গা-জোয়ারি ভূমিকা দেখে যেমন সমর্পণের আকাঙ্খায় ছটফটিয়ে উঠতো, নত্যর শরীরে-মনে তেমনি একটা বাসনা দুর্দমনীয় হ'য়ে উঠছে।

জেন্দাকা কব্জি ঘুরিয়ে সময় দেখলো, হকচকিয়ে গেল সময়ের দ্রুততা দেখে, তার স্বরে সংক্ষিপ্ত ব্যস্ততা ঃ আপনারা দু'জনে, হ্যাঁ, কেবলমাত্র আপনারাই দু'জনে এই বিজন স্টুডিওতে যা বিনিময় করবার, করুন। আমি বাইরে পাহারা দিচ্ছি। কেউ ঢুকতে চাইলে বাধা দেবো, কোন খদ্দের এলে হটিয়ে দেবো। একমাত্র ভয়, নত্যর বাড়ি থেকে কেউ এসে হানা না দেয়।'

নত্য দেখলো, আঙ্গুল তুলে জেন্দাকা স্টুডিওর রঙিন সোফাটাকে দেখাচ্ছে। তার বুকের মধ্যে আদিম ভয়ের বাজনা বাজতে থাকে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন এক উত্তরণের পথও দেখতে পাচ্ছে।

লোচিন অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্যে বললো ঃ আজ তারা এলেও আমি পলাতক হবো না।

জেন্দাকার চোখে কিছু কৌতুক ঃ বন্দুকের নল দেখলেও নয় ?

লোচিন ঠোঁট ভেঙ্গে বললো ঃ গুলির জবাব গুলিতে দেবো। আজ আমি নিরস্ত্র নই।

কথাটা শেষ করেই সে চোখের সামনে তুলে ধরলো পিস্তলটা।

চমকে উঠলো জেন্দাকা, কেঁপে উঠলো নত্য। কোন কথা না বলে জেন্দাকা দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল। আবার বন্ধ হয়ে গেল কপাট। ভেতরে কৃপণ আলো। সোঁ সোঁ বাতাসের রব এখানেও অশ্রুত নয়। কিছু বাতাস এ ঘরেও এসে ঢুকছে। তাপমাত্রা বোধহয় হিমাঙ্কের খানিকটা নীচে।

'তুমি কি এটা দেখে ভয় পেলে ?'

—পিস্তলটা ক্যাশবাক্সের ওপর রাখতে রাখতে লোচিন বললো।

নত্যর ভাবগতিক ভয়মিশ্রিত, সে জবাব দেয় না, লাল সোফাটাকে অঙ্গুলে চেপে ধরে নতমুখী।

'আমার মনে হয়েছিল, আমার একটা অস্ত্র থাকা দরকার', লোচিন বলতে থাকে, তার স্বরে আন্তরিক প্রত্যয় ও আনন্দের অভিব্যক্তি, 'কেবল নিজের নিরাপত্তার জন্য নয়, আমাদের প্রেমকে অক্ষত রাখবার জন্যও। সেদিন আমাকে তাক ক'রে গুলি ছোড়া হয়েছিল, আজ আমি প্রত্যুত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত। আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাবো। একহাতে তোমাকে বুকের সঙ্গে লেপ্টে রেখে অন্যহাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়াবো। যারা ফুল নিয়ে আসবে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো, আর যারা বন্দুক দেখাবে, তাদের স্তব্ধ করে দেবো চিরদিনের মতন। আমি যাকে ভালোবাসি, সে আমার বুকে থাকবে, তাকে বক্ষচ্যুত করে, এ দুনিয়ায় কারুর ক্ষমতা নেই নত্য, আমার প্রেম।...' যেন কোন দগ্ধবেলায় একটি ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্ণা মৃদুতানে ফুল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খাঁচার ভেতর থেকেই রাতপাখি ডেকে উঠলো ভোরের আলো দেখে। অনূঢ়া নত্য মুখ না তুলে পারলো না ; মুখ তুলে সে দেখতে পেলো, মিটার লোচিন তার অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে, তার অপ্রস্তুত অকর্ষিত জমিতে এই প্রথম বিসর্জন বাজনা বাজছে ঃ বীজ বপন করা হবে, বীজ বপন করা হবে, বীজ...লোচিনের উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে লাগছে কপালের ওপর, নত্য খুব চেষ্টা করেও চোখ মেলে রাখতে পারলো না, কিন্তু টের পেলো গুটি কয়েক উষ্ণ আঙ্গুল একটি অজানা যূথবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে তার চিবুক তুলে ধরেছে, নত্য আবার চোখ বন্ধ করলো। চোখ না মেলে সে টের পাচ্ছে, লোচিনের ঠোঁট তার কপালের ওপর ; প্রথমে আলতো, ক্রমশঃ ঠোঁটের চাপ বাড়ছে এবং তা শির শিরিয়ে নামতে নামতে ডান গালে, বাম গালে, তারপর দুটি পাঞ্জা তার নতমুখকে তুলে ধরলো এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঈষৎ বিস্ফারিত তার ঠোঁটের ওপর অভাবনীয় উষ্ণতা। থর থর কাঁপতে কাঁপতে নত্য বারেকের জন্য চোখ মেলে দেখলো, একমাথা কালো চুল তার গালের ওপর ; সে স্বয়ং প্রবল তাড়নায় দুই হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করলো সেই কালো চুলের আধারকে। পুরুষের শারীরিক ঘাম ও গন্ধ যে এত

উত্তেজক, নত্যর আগে ধারণা ছিল না। আবার গভীর নেশায় চোখ বুজে এলো তার। আরো তীব্র অনুভূতির ঢল নামতেই সে বুঝলো, যুবকের মাদকতাময় হাত কখন যেন তার ওভারকোটটিকে মুক্তি দিয়ে পিঠের ওপর ওঠা-নামা করছে। আঙুলের ছোট ছোট কামড়ে সে আর শীতার্ত নয় ; বরং, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে দুই ঠোঁট। একটা হাত পিঠে ঘোরে, কোমরে নামে, তলপেটে শিহরণ তোলে···সেই আঙুলগুলি সমবেতভাবে ঘুরতে-ঘুরতে-ঘুরতে বোতামের বাঁধন আলগা করে...নত্য জানে, তার অনাবৃত পিঠে নীলাভ বর্ণ কিছু রোম আছে, আঙুলগুলি সেই জন্মদাগটার ওপর পরিক্রম করছে···এহে, এখন একেবারে বগলের গহ্বরে এবং···নত্য আর দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম, ক্রমশঃ তার বৃত্তাকার স্তনের দুইপাশে আর একটি বৃত্ত পাক খেতে খেতে ছোট হতে হতে চাপ দেয়, আবার প্রসারিত হয়, আবার চাপ দেয়, আবার প্রসারিত···এক স্তন থেকে আর এক স্তনে একই প্রক্রিয়া···খয়েরী বোঁটায় কয়েকবারের ঘর্ষণেই নত্য পেরুনিকের প্রতিরোধ-প্রাচীর সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়, সে যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো মিটার লোচিন ভেরোভিকের অপ্রশস্ত বুকের ওপর। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে বুঝতে পারে, তার ঠোঁট অবশেষে জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে মুক্তি পেলো। কিন্তু তার ছোট্ট শরীরকে, যা পুড়ে পুড়ে লালচে, শূন্যে তুলে দোলানো হচ্ছে। এই সময় তলপেটে একটা চিন্‌চিনে ব্যথা অনেকদিনের পুরনো যন্ত্রণা, স্যাঁতসেঁতে আবাহাওয়া আর বিশ্রী কুয়াশার মধ্যে যখন সে আক্রান্ত হতো তার মা এই তলপেটে গরম তেল মালিশ ক'রে দিতেন, কখনো কখনো বাবার শ্যাম্পেনের খালি বোতলে গরম জল ভরে চেপে ধরতেন জায়গাটাতে। এখন গরম জল নেই, গরম তেল নেই ; পরিবর্তে রয়েছে একটি অচেনা গরম শরীর এবং সেই শরীরের টক-মিষ্টি গন্ধ। নত্যর ইচ্ছে হলো, এই অপরিচিত কঠিন শরীরটাকে তলপেটে চেপে ধরে থাকতে। কিন্তু এখন তার তো কিছু করবার নেই, ও-ই যা ইচ্ছে করছে, করুক তাকে নিয়ে। দোল খেতে খেতে নত্য বুঝলো, তাকে

নামিয়ে রাখা হলো সেই নরম লাল সোফাটার ওপর। শরীরের ঊর্ধাংশে তো কোন আবরণই রাখতে দেয়নি ক্ষুধার্তটা—কপাল থেকে নাভির ওপর অব্দি বীটফলের টাটকা স্যালাডের মতন টকটকে, ব্যতিক্রম কেবল ছবির মতন ধবধবে স্তন দুটি, যা সে নিজেরই দুই হাতের থাবায় ঢেকে রেখে পাশ ফিরবার চেষ্টা করে নত্য। 'প্লিজ, ডোণ্ট ফিল ডিজি, জোণ্ট বি ডিজি'···বিড় বিড় করতে করতে আবার সেই চুম্বনের ঝড়। এবারের চুম্বন আরো বলিষ্ঠ, আরো আগ্রাসী, তার বরবর্ণিনী শরীরকে কেবলমাত্র ঠোঁট দিয়ে শুষে নেবে বোধহয়। দুই স্তনের ওপর দুটো অনাবৃত চুল্লী দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। খুব চাপ এবং খুব ব্যথা, নত্য তার দুই হাত নামিয়ে আনতে বাধ্য হলো, ক্রমে আর কিছু করাই সম্ভব নয়, নিজেরই অজান্তে মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র গোঙানি তুলতে তুলতে দুই হাত ঢুকিয়ে দেয় লোচিনের তুষার ভেজা চুলের মধ্যে, মুঠোতে পাকিয়ে সেই চুল টানতে থাকে, আবার একবার তার একটা হাত ফস্কে নিয়ে লাগে লোচিনের কোমরে, এবারও অনিয়ন্ত্রিত হাত লোচিনের কোমরের আরো নীচে গিয়ে দারুণ হিংস্র হ'য়ে ওঠে। যন্ত্রণাদায়ক সুখকর বিস্ময়ে কঁকিয়ে উঠলো লোচিন। সঙ্গে সঙ্গে সে সকৃতজ্ঞভাবে আরো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। আসলে নত্যর শরীর আর নত্যর নিয়ন্ত্রণে নেই। সে নিজেই অনুভব করছে, লাভা স্রোতের দমকে তার হাঁটু ও কোমর সমুদ্রের ঢেউ-এর মতন ওঠা-নামায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে চায়। বুকের যন্ত্রণা এই বাহ্য। শরীরের একেবারে ভেতর থেকে যে চঞ্চলতা ও মাতলামি ঝুড়ি ঝুড়ি বের হয়ে আসতে চাইছে, তাকে চাপা দেবার কোন ক্ষমতা বা, কৌশলই নত্যর আয়ত্তে নেই। লোচিনের হাত আজ সব রকম সুবিধা আদায় করে নেবেই। অসহায় নত্যর হুঁস হলো, তার স্কার্টের হুকগুলোকে আলগা করা হচ্ছে, সম্ভবত একটা বোতামও ছিঁড়ে গেল—উঃ! এটাই এখন প্রধান অনুভূতি, এখানেই সমস্ত প্রতীক্ষা কেন্দ্রীভূত! স্কার্ট, হায় স্কার্টটা, যা কোনদিন আলোতে বা,

অন্ধকারে সম্ভব হয় নি, তাই ঘটছে – স্কার্টটা জীবন্ত হ'য়ে যেন প্রচণ্ড অভিমানে ছেড়ে যাচ্ছে তাকে—নাভিপদ্ম ছাড়িয়ে কোমর, কোমর ছাড়িয়ে জঙ্ঘায়, তারপর একেকারে হাঁটুর গাঁট অতিক্রম ক'রে গোড়ালিকে ছুঁয়ে হারিয়ে গেল। সিলোফেনের পাতলা জাঙ্গিয়াটায় যখন হ্যাচকা টান লাগলো, নত্য আর একবার চোখ না মেলে পারলো না! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে দেখলো, দুনিয়ার বিপুলতম লজ্জা, সুখ ও সম্ভাবনার দৃশ্য! যুবকের রোমশ দাবনার মধ্যবর্তী বাদামী পাথরে দগদগে রক্তচক্ষু মুহূর্ত কয়েক শূন্যে আন্দোলিত হয়ে অনিবার্য নিষ্ঠুরতায় নেমে আসছে তার কুমারী সঞ্চয়ে। পরক্ষণে সেই ধাতবখণ্ডে নিহত হবার যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো নত্য।···

বাইরে হিমে তুষারে মাখামাখি দাঁতে দাঁত চেপে সবটুকুই কল্পনা ক'রে নিতে পারলো জেন্দাকা। একবার সে নত্যর তীক্ষ্ণ গোঙানিও শুনতে পেয়েছিল। একে ঠিক ঈর্ষা বলা যায় কিনা, জানিনা, তবে নত্যর ঐ কাতর-ধ্বনি জেন্দাকার ভেতর এক ধরণের অদ্ভুত ধারালো পরিতৃপ্তি এনেছিল। গ্রাম্য বনেদী মেয়েকে এইভাবে জবাই হতে দেখলে, জেন্দাকার নিশ্বাস প্রশ্বাস অনেক দ্রুততর হ'য়ে ওঠে এবং তখন সে নিজেকে ভাগ্যহীনা মনে করে না।

সে কব্জি উল্টিয়ে ঘড়ি দেখলো, প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় উত্তীর্ণ। ভেতর থেকে ভেসে আসা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ থেমে যাবার পর আর কোন আওয়াজ নেই। নত্যর তুলনায় ছোকরাটি যে অনেক বেশী পারঙ্গম, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। এখন নিশ্চয় সঙ্গিনীকে সময় দিচ্ছে, এই আকস্মিক প্রচণ্ড শারীরিক আলোড়নের পর নিজেকে একটু থিতিয়ে নিতে। আচ্ছা, কান পাতলে ফিস ফিস কথা বলবার শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে। নত্য তবে স্বাদ পূর্ণমাত্রায় নিয়েছে এবং এখন ঐ ছোকরাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে চাইবে না। জেন্দাকা জানে,

কমবয়সী মেয়েরা একবার বিছানার স্বাদ পেয়ে গেলে কামুক কুকুরেরও অধম হয়।

জেন্দাকা কপাটে দু'বার টোকা দিতেই ভেতর থেকে লোচিনের মিষ্টি আহ্বান ভেসে আসে : আসতে আজ্ঞা হয়, জেন্দাকা দেবী।

ভেতরে ঢুকে যা দেখবে আশা করেছিল জেন্দাকা, তাই দেখতে পেলো। চুলগুলি এখনো এলোমেলো অবস্থায় থাকলেও মিটার লোচিন মোটামুটি স্বাভাবিক। কিন্তু নত্য? বেচারি যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, এখনো খামচে ধরে আছে লোচিনের একখানা হাত। লোচিনের পেটে কখন অসাবধানতায় লেগে গেছে টাটকা টকটকে রক্তের এক পোঁচ দাগ! ইস্ সোফাটাতেও কয়েক ফোঁটা! জেন্দাকা সিদ্ধান্ত নিলো. এরা চলে যাবার পর সে নিজের হাতে ঐ দাগগুলিকে মুছে ফেলবে।

এইসব মিলনসংক্রান্ত উত্তেজক মুহূর্তগুলি পেরিয়ে আসবার পর আপনাদের কি মনে হচ্ছে? আমি কি খুব বাড়াবাড়ি ক'রে ফেললাম? কিন্তু মদের মুখে লোচিন একদিন এমনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই আমাকে বলেছিল। নিজের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কখনো সে একসঙ্গে দশটা সিঁড়ি অতিক্রম করে, আবার কখনো পা মেপে মেপে চলতে ভালোবাসে। যাই হোক, এখন আপনাদের ধারণা কি? মিটার লোচিন নত্যর অসাধারণ যৌবনকে প্রথম উপভোগের আনন্দে কি উন্মাদ হ'য়ে আছে? আর নত্য কি তখনই প্রেমাস্পদের হাত ধরে পরদেশে পাড়ি দিতে উন্মুখ?

নত্যর সম্পর্কীত দ্বিতীয় ধারণাটি বহুলাংশে সত্য হলেও মিটার লোচিন কিন্তু একেবারে দিশেহারা নয়। তবে একথাও ঠিক যে, লোচিন সেই ভয়ঙ্কর সুখদায়ক সময়টা পার হ'য়ে এসে নিজের কাছে কবুল করলো, এমন মেয়ে আমার জীবন সঙ্গিনী হলে আমি হয়তো আমার ছন্নছাড়া ক্ষতিকারক জীবনপ্রবাহ থেকে সরে এসে অনেকটা সুস্থ ও

স্বাভাবিক হ'য়ে উঠতাম। নত্য যা দিতে পারে, এ পৃথিবীতে খুব কম মেয়েরই পক্ষে সম্ভব। ওর প্রেম অনাবিল ও নিবিড়, সৌন্দর্য অতুলনীয় যৌবন মাদকতাময়, আর একটু অভিজ্ঞতা হলে যৌন-আনন্দদানে এ নারীর সমকক্ষ কেউ-ই থাকবে না।...

এক কথায় বলা যায়, লোচিনের কাছে এখন নত্য হলো সেই আদর্শ রমনীরত্ন, যাকে সে এখনই মনে মনে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে হুটমুট করে বসতেও চায় না। সে চায়, ভেবে-চিন্তে একটা উপায় নির্ধারণ করতে। ততদিন জেন্দাকার মারফৎ একটা যোগাযোগ বজায় রাখতে পারলেই হলো।

কিন্তু যখনই নত্য ব্যাকুলতার সঙ্গে জানালো যে, বাড়ির লোকেরা তার জন্য ইতিমধ্যেই পাত্র নির্বাচন করে ফেলেছে, লোচিনের মাথায় যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে, সমস্ত রকম ধৈর্য ও শালীনতা ভেঙ্গে চিৎকার ক'রে ওঠেঃ কে সেই স্কাউণ্ড্রেল?

নত্য আঁতকে ওঠে লোচিনের হুঙ্কার শুনে।

জেন্দাকা কিন্তু হিমস্বরে বলেঃ আপনি কি তাকে এখনই গুলি করতে যাবেন নাকি?

লোচিন চিবিয়ে চিবিয়ে বলেঃ দরকার হলে তাই যাবো।

নত্য তার নোখে ওভারকোটের একটি টাটকা দাগকে খুঁটে তুলতে তুলতে নরম স্বরে বললোঃ না, তোমাকে আর সে রকম হেনস্তা হতে হবে না। তুমি যেদিনই এসে দাঁড়াবে, আমি সব ত্যাগ ক'রে পালিয়ে আসবো।

লোচিন কিছুক্ষণ স্তব্ধ, উদ্বেগের অকুস্থল অনেকগুলি—ঐ বাড়ির বাগদত্তাকে ছিনিয়ে আনা মানে মুরগীর পেটের তলা থেকে ডিম তুলে আনা, স্থানীয় আইনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে কোন এক গীর্জার ফরমান অত্যাবশ্যক হয়ে উঠবে, চাকুরিস্থলে মেজর টুডি ব্যাপারটা নিয়ে কেমন মাথা ঘামাবেন, সর্বোপরি পারিবারিক জীবনে এই সরল মেয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মত্ততা একদিন শুরু হবেই। লোচিনের কপালের চামড়ায়

টান ধরেছে হিমেল বাতাসের কামড়ে; সেই কপালে আঙুল রেখে কিছুক্ষণ থম মেরে থাকবার পর সে জিজ্ঞেস করলো: বিয়েটা কবে?

নত্য অপরাধীনীর মতন নতমুখী থেকে বললো: দিন এখনো স্থির হয় নি।

লোচিন বললো: কোন সভ্যলোক এসব বজ্জাতির কথা ভাবতেই পারে না।

প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া! এ একটা পাপ!

নত্য তখনো মুখ তোলেনি: আমি যা জানাবার, জেন্দাকার মারফৎ জানাবো। তুমিও—

কথা শেষ হবার আগেই জেন্দাকা কৃত্রিম অভিমানের সঙ্গে বললো: কিন্তু আমার লাভ?

লোচিন মুচকি হেসে বললো: আমি আপনার মহানুভবতার কথা কার্বির কাছে বলবো।

জেন্দাকা যেন ঈষৎ বেদনার্ত: কার্বি আমার কাছে সেই পুরুষ নয়, যার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজেকে মহৎ করে তুলতে হবে।

লোচিন উঠে দাঁড়ায়: আমি দুঃখিত।

জেন্দাকার স্বর স্পষ্ট: আপনি একেবারে ভুল করেন নি, মিঃ ভেরোভিক।

কার্বি আমার বন্ধু এবং মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও তাকে আমার দরকার হবে।

বিদায় নেবার পর নরম বরফের ওপর দাঁড়িয়ে লোচিনের মাথায় আবার সেই দুশ্চিন্তার আগুন। শীতার্ত হলেও স্নায়বিক উত্তেজনা তাকে পোড়াচ্ছে। খুব বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়েছি আমি, খুব বিশ্রীভাবে। নত্যার তবে বিয়ে ঠিক-ঠাক। মেনে নেওয়া যে কোন অবস্থাতেই কষ্টকর। উপায়? জেন্দাকা আবার বলেছে, স্টুডিও আলফা অব্দি নত্যাকে সে দ্বিতীয়বার আনতে পারবে বলে মনে হয় না। বাড়িতে ওর

কড়া শাসন, আর স্টুডিওর ভেতর পঙ্গু সাইমনের জুলুজুলু চোখ। এমন সুযোগ, এমন অবৈধ উত্তেজনার স্বাদ মিটার লোচিন আর পাবে না। অর্থাৎ বাতাস চুরি করা থমথমানি নিয়ে লোচিনকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে সেই জানালাটার কাছে স্রেফ নত্যাকে চোখে দেখবার জন্য।

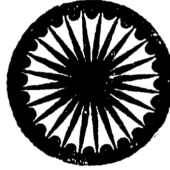
অবশ্য উভয়ের বুকের দুঃখী শব্দ শুনে দয়ালু জেন্দাকা কথা দিয়েছে, সে আপাতত যোগসূত্র বজায় রাখতে পারবে—নত্যর বার্তা লোচিনকে, লোচিনের সিদ্ধান্ত নত্যাকে।

কিন্তু যদি হুট ক'রে বিয়েটা হয়ে যায়? সেই জ্বালা লোচিন ভুলবে কোন শক্তিতে? ধ্যাৎ, এমন খুঁচিয়ে ঘা না করলেই ভালো হতো। জেন্দাকার দৌত্যে এমন একটা মিলন-ঘটনা না ঘটলে চিরা-চরিত মদে-মেয়েমানুষে খাবি খেতে খেতে মিটার লোচিন একদিন নিশ্চয় ভুলে যেত নত্যাকে। এখন আবার তার বিবেক জেগে উঠেছে, হয়তো প্রেমের কামড়ও বাড়ছে, পৌরুষের অহমিকা কিছুতেই পিছু হটতে রাজি নয়।

মার্গ-সঙ্গীতের বিষণ্ণ আলাপের সুর যেন বাজছে মিটার লোচিনের মনে, যার বিমর্ষতা এড়াতে সে শরীর সর্বস্ব পাহাড়ী মেয়েটার শরীরকে স্মৃতিপটে টেনে আনতে গিয়ে আরো আত্মগ্লানি অনুভব করে। নত্যাকে নিয়ে আরো তীব্র অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। তার প্রাণের কলরোলে কেবল একটি প্রত্যয়ই ধ্বনিত হয়ঃ নত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রমনীরত্ন এবং লোচিন একজন তাতার দস্যুর মতন সেই রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন করে এসেছে। মিটার লোচিন যতোই অমানুষ হোক, বিবেকের এত বড় সাওয়াল এড়িয়ে যেতে পারবে না। বহু নারীর শরীর ও মন পিষতে পিষতে এই প্রথম অকস্মাৎ জীবন রহস্যের প্রেমময় বদ্ধদুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং সেটা কখন? যখন সে সেই স্বর্গীয়া যুবতীকে তার দীনাবস্থার সুযোগে ছিন্ন ভিন্ন করেছে। ইস্, এখনো কানে বাজছে ওর গোঙানি, হঠাৎ চিৎকার করে ওঠাটা। এখন যদি আমি পিছিয়ে যাই, নিজের কাছেও কৈফিয়ত দেবার কিছু থাকবে না।

লোচিন কখনো অস্থির, কখনো স্বভাবজ আলস্যে যেন ভেঙ্গে পড়ছে। তার বিপুল মানসিক শ্রম ইতিলেখ সৃষ্টি করছে বরফের ওপর —বুটের ডগা দিয়ে সে বরফগলা কাদায় লিখলো ঃ

নত্য, তোমায় আমি বেহাত হতে দেবো না!



এই গ্রামের চতুঃসীমায় নত্য পেরুনিক কোনদিনই শিরোনাম নয়। সে একটি কুমারী মেয়ে, শীঘ্রই যার বিয়ে হবে। কিন্তু এই একটু আগেই আপনারা জেনেছেন, পুরুষের প্রথম উষ্ণ সহচর্যে সে তার কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছে। এখনো যন্ত্রণাময় আপন শরীরবৃত্তের রহস্যে ও সদ্যলব্ধ স্মৃতিতে নিথর প্রায়। এরই মধ্যে এক রবিবার কনে দেখার গৌরবে গাড়ি ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে গ্রামবাসীকে সচকিত ক'রে সবান্ধব পেডার গ্রেডিক এসে হাজির। বহিরঙ্গসর্বস্ব চাকচিক্য নিয়ে ডজনখানেক কৌতুহলী লোক ক্রমশ ঘন হয়ে আসে! তাদের হৃৎপন্দন বৃদ্ধি পায়, নিজেদের নগরপ্রীতি নিয়ে গুঞ্জন তোলে। সুন্দর মেটে রং-এর গাড়িখানা, ভেতরে নৃত্যরতা জ্যামিতিক আকৃতির পুতুল-সুন্দরী, গাড়ি যখন ছোটে তখন সে টুং—টাং নাচে। নত্যর তাই গাড়ির ভেতর গলা ঢুকিয়ে দিদির ভাবী স্বামীর ড্যাণ্ডিজম দেখে সবিশেষ পুলকিত। আর নত্যর মা তো এমন সাজলেন যে, বুঝি তিনিই বিয়ের কনে। দুই লাল সুতোর মতন ভ্রূ থেকে দুটো কালো রেখা প্রায় কান অব্দি টেনেছেন, বিশ বছর আগের সযত্ন রক্ষিত গাউনটা ট্রেসিং পেপারের মন পাতলা এবং তার লেসে বড় সূক্ষ্ম কারুকর্ম। সর্বত্রই একটা অলীক মাধুরী ছড়িয়ে গট গটিয়ে হাঁটলেন পেডার। একজন প্রতিষ্ঠিত পুরুষের যাবতীয় অভিব্যক্তি তাঁর ভেতর। ঈষৎ টাক, ছোট ছোট চোখের ওপর মোটা

কাঁচের চশমা, মিশকালো স্যুট, ঠোঁট বাঁকিয়ে এমন হাসলেন যেন খানিকটা গরল তাঁর গলায় আটকে আছে।

এবং বেচারি নত্য—শুধু তার প্রসাধন নিয়ে কত উপদেশ এবং কত উপদেষ্টা! ছোট ভাই বলে গেল, সোনালী ফিতের চেয়ে সবুজ রিবনে মানায় ভালো। পাড়াতুতো পিসি উপদেশ দিলেন, গালে খুব ক'রে তেল তেলে ক্রিম না ঘষলে মুখখানাকে চুপসানো বেলুনের মতন মনে হতে পারে। বড় ভাই গম্ভীর গলায় বললো, আধুনিক মানুষ পেডার স্রেডিক স্কার্টের অতখানি ঝুল পছন্দ নাও করতে পারেন। মা তিন রকম রং নিয়ে এলেন মেয়ের গালে ঘষবেন বলে। ওষ্ঠ রঞ্জনীকে খুব করে ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে দিয়ে গেল এক প্রতিবেশীনী। বাড়ির সামনে যে সমস্ত খানাখন্দ ছিল, সব বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেই তো আশ্রম প্রতিম আবাসিক গড়ন তাকে আরো ফুলে—পাতায়—লতায় মুড়ে দেওয়া হলো। ভাবী জামাইকে প্রথম অভ্যর্থনা জানতে আমরা ইত্যাকার অসংখ্য বিকার। মাথায় টুপি পরে দস্যুর গলায় থেকে থেকে হো-হো হাসির মাধ্যমে নত্যর বাবা জানিয়ে দিচ্ছেন, তিনি বড় সাধারণ নন।···

পেডার সেড্রিকের সামনে একরকম ধরে বেঁধে এনে বসানো হলো নত্যকে। নত্য নতমুখী, যেন জড়; তবু তার সরল রূপের ব্যপক ব্যাপ্তি পেডারের চশমাবদ্ধ দৃষ্টিতে মুগ্ধতা আনে; মুখ না তুললেও টের পান, তাঁর ভাবীবধূর টানা টানা বড় বড় চোখ, মাথা ভরতি চুল, টস টসে ঠোঁট মুক্তোর মতন দাঁত···। তিনি ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, এমনকি শরীরের চড়াই উৎরাই অব্দি। বুদ্ধিমান উৎসাহী পরিশ্রমী প্রতিষ্ঠিত লোকটি ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজনা অনুভব করছেন। তারপর তিনি যখন নত্যর বাঁ হাতখানা আলতো টেনে এনে একরত্তি হীরে বসানো আংটিটা অনামিকায় ঢুকিয়ে দিলেন, অন্যমনস্ক বিমর্ষ নত্যও সচকিত হয়ে ওঠে, তার রক্তে প্রবল বিতৃষ্ণা ঢেউ তুলে, কানের লতি তেতে আগুন হ'য়ে ওঠে, চোখ জ্বালা করতে থাকে, বিড় বিড়িয়ে সে

কেবল বললো, 'না—না—'। সকলেই ভাবলো, মায় পেডার অব্দি, লজ্জায় ও স্বপ্নে চুরচুর যুবতীর এ হলো অনুরাগ জ্ঞাপনের বিচিত্র ভাষা। ক্রমশ সে যখন আরো নিকটবর্তী হবে, কোথায় ফুরুৎ করে উড়ে যাবে এই জড়ত্ব এবং মৃদু গোঙানি।

চারদিকে আনন্দের চাপা হাসি এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস। আহ্! এমন সুখকর চিত্রের কোন বিকল্প হয় না। কেউ খেয়াল করলো না, দুঃখ ও বিরক্তির নোনাজলে তলিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। জেন্দাকা কোথায়? এই সব খুশি খুশি মুখের ভিড়ে সে নেই। হয়তো ক্যামেরা কাঁধে কোন বিদেশ বিভুঁই চষে বেড়াচ্ছে। মনে মনে সকলকে কাটাকুটি করলো নত্য। তার যদি শক্তি থাকতো, এখনই সুদীর্ঘ নখে সকলকে রক্তাক্ত করে তুলতো।...

বাইরে, ফুলের বাগিচায় চায়ের আসরে বসে দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে গেল।

ব্যাঙ্ক অফিসার পেডার শ্রেডিকের সঙ্গে নত্য পেরুনিকের শুভ পরিণয়ের দিন। এ যেন খচ্‌খচিয়ে ঝর্ণা কলমে একখানা পোষ্টডেটেড চেক লিখে ফেলা—গুনে গুনে মাত্র পনেরোদিন পর পূর্ণচন্দ্রের দিনে যা এনক্যাশড হবে। মাত্র পনেরো দিন। তারপর মেয়েরা পরিষ্কার ঝক ঝকে পোশাক পরে গাইতে গাইতে গির্জায় যাবে। উইডিং গাউন পরে ভাবী বরের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে নত্য এবং বুড়ো পাদ্রী ভরা কলসী থেকে জল গড়িয়ে পড়বার স্বরে ভক্—ভক্—ভক্ মন্ত্রোচ্চারণ করবেন। সব একেবারে ছবির মতন।

আকাশের ডাল অব্দি গর্জন তুলে পেডারের গাড়ি বিদায় নিলো।...

পাহাড়ের প্রাচীর ও বড় বড় সব গাছের সারিতে সঞ্চিত উত্তাপ নদীকে তার উৎসমুখে জমাট বাধতে দেয়নি। ঠিক উৎসমুখ নয়, তবে তার কাছাকাছি এবং খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে এতটা উপরে উঠে

এসেছে জেন্দাকা ক্যামেরায় 'পাহাড়তলীর শীতার্ত হৃদপিণ্ড'কে ধরে রাখবে বলে। পর পর কয়েকটা শট নেবার পর সে আনমনা। তাকিয়ে থাকলো খরস্রোতার দিকে। জল কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা। তবু তাতে পায়ের পাতা ভেজালো জেন্দাকা। ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে খুলে একটা ঝোপের গায়ে লটকে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বিকেলের আলো মরে আসতে এখনো সময় লাগবে, যদিও যেন কারণ অকারণে আলোর শক্তি ওঠা নামা করছে। চারিদিকে। কোন সচল প্রাণী নজরে আসছে না, এমনকি একটা কাঠবিড়ালীও ছুটে পালায় না। বাতাসের হিস্ হিস্ রব বড় রহস্য মনে হয়। পিছনে বরফ মাখা পাহাড় খাঁ খাঁ। ভয়ঙ্কর এক নির্জনতা গিলতে আসছে। এখন বাতাসে কোন গন্ধ নেই, অথচ অন্য ধাতুতে এখানে ফুলের গন্ধ বেহুঁশ করে রাখে। এই পথ বেয়েই শিকড়হারা পাহাড়ীরা সমতলে নেমে গেছে। অদ্ভুত যাযাবরী মন, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পথ নামলেও মুখের মিষ্টি হাসি মেলায় না। আকাশের দিকে চেয়ে অনায়াসে বলা যায়, আর দিন দুয়েকের মধ্যেই দ্বিতীয় পর্যায়ের ঝড় উঠবে, তখন জেন্দাকা তার, কাঠের আবাসে কান পেতে ঠকঠকানি শুনবে। কবে যে তারিফ করবার মতন একটা ঠাই হবে তার। আশ্চর্য, আজ ক'দিন যাবৎ ইয়াঙ্কিটার পাত্তা নেই। ফোনে রীতিমতন ইঙ্গিত দেওয়া সত্বেও এলো না। অদ্ভুত তো! হয়তো অন্যত্র কোথাও আত্মরম্ভিতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

কার্বির পর নত্য। জেন্দাকার বুকের মধ্যে একটা চিনে্ চিনে্ ব্যথা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। সম্ভবত এই প্রথম সে একটি যুবতীর প্রতি অনেকখানি আপত্যস্নেহ ও দায়িত্ববোধ অনুভব করছে। বিশেষত হু হু বাতাসময় সেই সকালে স্টুডিওতে ঘটনাটা ঘটে যাবার পর জেন্দাকার ভেতর ঘাপটি মেরে বসে আছে আশঙ্কা, কখনো কখনো বুকটা ধড়াস করে ওঠে। বড় সরল, বড় পবিত্র মেয়েটা। এযুগে অসচরাচর, শেষাবধি পারিবারিক গোড়ামির বলি না হয়ে যায়। কিন্তু লোচৈন? স্টুডিওর পথে সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে হেডলাইট জ্বালিয়ে কোন

গাড়িকে ছুটে যেতে দেখলেই মনে হয়, এই বোধহয় কার্বি অথবা লোচিন এলো। লোচিনকে কিন্তু পুরোপুরি বেপরোয়া বলে মনে হচ্ছে না, যদিও ওর মগজে দুঃস্বপ্নের কতগুলি দৃশ্য গাঁথা আছে বলে মনে হয়। একটি চর্বিহীন হাড়প্রধান যুবক ঢক ঢক করে মদ খাচ্ছে, এমন স্বরে কথা কইছে যেন বাপের জমিদারী দেখতে এসেছে, আবার সময় সময় খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে ঘর ছেড়ে ধোওয়া মোছা আকাশের তলায় দাঁড়াতেই চায় না—এই রকম একজন অতি সপ্রতিভ, খটখটে রুক্ষ যুবকের প্রেম কতখানি বাস্তব সম্মত ? অথচ, এরই মধ্যে যা হবার হয়ে গেছে—। জেন্দাকা তার জীবনে কোন পুরুষ মানুষকে নিয়ে চিন্তা করে না। পুরুষ মানুষ একটা সমস্যাই নয়। তারা পয়সা যোগাবে, প্রয়োজনে শরীর নিয়ে দানব হবে···ব্যাস। কিন্তু নত্য, আহ্, বেচারি, নত্য।···

বিবর্ণ ভেজা পাতা পায়ে দাবিয়ে ক্যামেরাটা কাঁধে তুলে নিলো জেন্দাকা। উৎরাই বেয়ে আসা, মনে হয় বুঝি পড়িমরি ছুটে চলা। সর্বত্র একটা চাপা সোঁদা গন্ধ নিয়ে শীতের চরাচর রুক্ষ উদ্ধত। কোথাও কোথাও মুক্তার ঝিলিক। সূর্য পশ্চিমের প্রান্ত রেখায় বলে পিচ্ছিল রক্ত রেখাগুলি দেখা যায়। বাতাসের দাপট কম, তবে গোত খেতে খেতে কখনো কখনো মেজাজ দেখিয়ে যায়। জেন্দাকার ক্যামেরা তার কোমরের ওপর দোলে, আর এমন একটিও কাঁচা ফ্লিম নেই, যা দিয়ে আর একটা ছবি তোলা যেতে পারে। স্মৃতি ধাক্কা মারে। বাবার পুরনো ভারী ক্যামেরাটা নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত কিশোরী লেন্সের ভেতর দিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সারিবদ্ধ গম্ভীর বিষাদ পাহাড়ের দিকে।··· না, আজ আর সে ছবি তুলবে না। কিন্তু সে স্টুডিওর দিকেও গেল না। খুব আস্তে আস্তে স্টুডিওটার প্রতি একজাতের বৃতিস্পৃহা জন্মাচ্ছে জেন্দাকার ; নিজেরই ভয় হয়, হয়তো একদিন গোঁয়ার্তুমি করে কাজটাই ছেড়ে দেবে। একটা সুন্দর সরল মুখ আসে না ক্যামেরার সামনে! সব কালো মুখোশ! প্রায় সব।···হাঁটতে হাঁটতে সে গ্রামের পথ

ধরলো অর্থাৎ সে এমন অন্যমনস্ক ভঙ্গীমায় এক সময় পেরুনিকদের বাড়িতে পৌঁছে যাবে। উৎসবের বাড়ি, ফটোওয়ালীর তলব তো হরবকত। একটি মাত্র স্টুডিও—সকলেই তার পৃষ্ঠপোষক। বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন, নামকরণ,—প্রতিটি অর্ডারই 'স্টুডিও আলফা'র প্রাপ্য। উৎসব অতি ব্যাপক ও জাঁকালো যদি হয়, স্বয়ং সাইমন তাঁর ইউনিট নিয়ে উৎসব স্থলে টলমল। গ্রুপ ছবি তোলা মহা ঝকমারি, বাড়ির রাধুনিও চাইবে একেবারে সামনের সারিতে আলো ক'রে দাঁড়াতে···একবার এক বাড়িতে ঐ রকম সময়ে একজন তার পোষা বানর নিয়ে যা কাণ্ড বাধিয়েছিল, ভাবলে আজো অনুভূতি অসাড় হয়ে আসে। শিকল ছুট বানর দাঁত খিচিয়ে ছুটে এসে ঝুলে পড়েছিল তার চুল ধরে। কী সাংঘাতিক! অবস্থা দেখে এক দঙ্গল মেয়ে পুরুষের হি-হি হো-হো··কারুর ভেতর আক্ষেপের উষ্মা নেই। সেই থেকে খুব হুঁশিয়ার জেন্দাকা। কুকুর, বেড়াল, বানর—এই সব গৃহপালিত জন্তুদের সঙ্গে নিয়ে ছবি তোলা চলবে না। অন্ততঃ সে তখন লেন্সে চোখ রেখে দাঁড়াবে না।···

পথে লোক চলাচল নেই, শীতের দাপটে ফায়ার প্রেসের সামনে সিঁটিয়ে আছে দিনে—দিনেই নিজের নিজের তল্লাশ—তদন্ত সেরে।

খানিকটা দূরে পেরুনিকদের বাড়িটা ইঙ্গিতপূর্ণ। দেখামাত্র খটকা লাগে। দ্বিধাভরে থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় খানিকক্ষণ। বেশ দ্রুতছন্দে বাড়িটার ওপর কাঁচা রং বোলানো হয়েছে। অনাদৃত গাছ-গুলিকে সাফসুফ ক'রে বহিরক্ষা হিসেবে পর পর কয়েকটা ফুলের টব। উন্মুক্ত সবুজ লনে একটি গোলাকার টেবিলকে ঘিরে চেয়ারের ছড়াছড়ি। বারেকের জন্য ওখানে দেখা দিয়ে আবার হারিয়ে গেলেন পেরুনিক পরিবারের দজ্জাল গিন্নী। উৎসব সংক্রামিত কত্তাও ভেসে উঠলেন, খরগোশের মতন নাক কুঁচকে কুঁচকে এগিয়ে আসেন, জেন্দাকাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পারিবারিক বোল্‌বোলায় স্বয়ং ডগমগ, '···আরে তুমি এমন নিযুতিপারা বাইরে একা দাঁড়িয়ে আছো কেন? ভেতরে যাও,

ভেতরে যাও···ওরা সব এসেছিল, শতচক্ষু মেলে নত্যকে পছন্দ ক'রে গেছে···প্রতিবেশীদের ভিড়ে একেবারে গিস গিসে···আগেকার দিনের মেয়েছেলেরা এমন গান ধরলো, যেন মুজরো বসেছে ··তোমাকে তো তখন দেখলাম না। কোথায় ছিলে ? বুঝেছি, বুঝেছি, রোদে বরফে ছবি তুলতে তুলতে শরীরটাকে ঝামা করে ফেলেছো। এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করো। আমি নিজেই বরং তত্ত্ব তল্লাশে লাগি। বিয়ে ছাড়া মেয়েদের গতি আছে, এ্যাঁ ?···' খুশির দমকে অজস্র বাক্য করুণাধারায় নেমে আসছে। রীতিমতন বাচাল—কী অধোগতি! আওয়াজে আকৃষ্ট হ'য়ে নত্যর মা'ও এলেন ; তিনিও আজ যেন বাতাসে উড়ছেন, কোথায় উঠে গেছে তাঁর সেই পরিচিত প্রলয়ঙ্কর মূর্তি জেন্দাকার মনে হলো, এ এক ধরণের চালিয়াতি। মহিলা স্বয়ং একটা টুল এগিয়ে দিলেন জেন্দাকাকে বসতে দেবার জন্য। তারপরই নিজের কথা সাত কাহন। অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকা অবিশ্যি আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। পেডার সেড্রিক সদলবলে এসে কনের হাতে আংটি পরিয়ে গেছেন, দিন-ক্ষণও স্থির। নত্যর সারা দেহে কি তখন প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ ফুটে ওঠেনি ? তার চোখের দৃষ্টি কি খর হ'য়ে বিস্মিত করেনি পেডার কে ? নাকি, নত্যর রূপ দেখেই মাথা ঘুরে গেল, বুক জুড়ে মাধুর্যের সঞ্চার হলো ?

না, এখন জল্পনা নিস্ফল।

নত্যর মা বলছেন ঃ

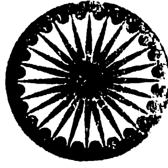
'···তুমি ছিলে না জেন্দাকা, ভিড়টা যদি দেখতে। হবে না।··· অত দামী গাড়ি কী কোন দিন এ পাড়ায় ঢুকেছে ? গাড়ির মধ্যে পুতুল, রেডিওতে গান হয় নিজস্ব ড্রাইভার আছে, বন্ধুরা এক একজন চেহারায় যেন রাজপুত্তুর ! পেডার বাবাজীবনের কৃতিত্ব শুনলে মাথা ঘুরে যাবে, অতি বড় নিন্দুকও মুখে কুলুপ দেবে ব্যাঙ্কের বড় অফিসার, প্রাসাদের মতন বাড়ি,···নত্যর বাবা দেখে এসেছেন, মস্ত বাগানে মালী কাজ করছে···ঐ সংসারে গেলে নত্যর পুনর্জন্ম হবে।···'

যার সনির্বন্ধ পুনর্জন্ম হবে, জেন্দাকা এবার তাকে দেখতে গেল।

প্রচুর রূপ-চর্চা সত্বেও, অনেক রকম কারচুপির ক্রিয়া থাকলেও সেই মুখে বিমর্ষতা ; রূঢ় ও অবাঞ্ছিত উৎসব সাঙ্গ হবার পর এখন আড়ালে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। অন্য কেউ দেখলে হয়তো ভাববে, এ হলো বিদায়-বিষাদ। সাত চড়েও যে মেয়ে রা কাড়ে না, সে এখন বুঝি সময়কে জয় করতে চাইছে। কিন্তু জেন্দাকা দেখেই বুঝলো, পর্বত প্রমাণ গ্লানির ভারে বালিশে কনুই দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে। খয়েরি রুমালটা ফোটা ফোটা লোনা জলে হলুদ।

জেন্দাকা সেই ঘরে ঢোকা মাত্র সে ঘুরে তাকালো। তার থমথমে মুখে ঈষৎ আলো ঝিলিক দিয়ে উঠলো, দুই ঠোঁটে তুললো জলশব্দ, একরকম লাফিয়ে উঠে কপাট বন্ধ করলো। তারপর যেন এক ঝাঁকুনিতেই সমস্ত সাজকে সে বৃতিস্মার সঙ্গে নস্যাৎ করে দিলো, ফিতে দুটো টেনে খুলে ফেলতেই আলুথালু চুল, আলো এবং অন্ধকারকে ফালা ফালা ক'রে জেন্দাকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। মথিত নিঃশ্বাসে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফোঁপালো ; নত্যর দুঃখের মাপজোক করতে গিয়ে চোখে জল এসে যাচ্ছে জেন্দাকারও। অনেকদিন বাদে স্ব-অশ্রুর সন্ধান পেয়ে কেঁপে উঠলো জেন্দাকা। হায়, আমি যদি নত্যর মতন এমন ক'রে কাউকে ভালোবাসতে পারতাম! সে ক্রমশঃ টের পেলো, তার পরিপার্শ্বে নত্য ছাড়া আর কেউ-ই নেই এবং সেই ধূমল কুয়াশার মধ্যে একটি ছোট্ট শিশুর গলায় নত্য বলছে :

> তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই···তাকে বলো, পরশু সন্ধ্যায় এসে আমাকে নিয়ে যেতে। আমি জানালার সামনে বসে থাকবো।··



ভিড়ভাট্টাময় পাহাড়ীদের পরিচর্যাই এখন প্রধান কাজ, কিন্তু এ কাজেও আগের মতন উৎসাহ-আমেজ পায়না লোচিন। বরং উৎসাহ বেড়েছে গোমড়ামুখো কার্বির। জলদি জলদি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, খুব খাটে শীতের মরণ-কামড় সত্ত্বেও। এরই মধ্যে একদিন মহা গেরো। রিলিফ নিয়ে পাহাড়ীদের দুটো শিবিরের মধ্যে তুমুল দাঙ্গা। একটা লাশ ও পড়ে যেতে ঝামেলার আশঙ্কায় ও ঘেন্নায় লোচিনসাহেব মেজর টুডির কাছে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলো। তার চোখে কিছুক্ষণ ধরে ভাসলো সেই দৃশ্যটা—সদ্য মৃত মানুষ ছায়ান্ধকার পথে হাত-পা খাড়া ক'রে পড়ে আছে, তালুটা চিচিং ফাঁক, রক্তে কাদামাটি বাদামী বর্ণ,··· ভিড় জমছে. অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ আসছিল···ইনেসপেক্টরের নির্দেশ-মতন লাশ তুলে নিয়ে যাওয়া হলো, সম্ভাব্য খুনীকে চিত্ ক'রে গলায় পা দিয়ে কথা আদায়ের মহড়া চললো, জেরার ঝক্কিতে ফ্যাকাশে মেরে গেল লোচিন, কার্বি, ঝিক্রোন, মুহম্মদ, মোট কথা একটা অপাংক্তেয় খুনের কারণে আধ ঘুমন্ত শহরটা প্রাণশক্তিতে ঝকঝক করতে থাকে। এই রকম একটা তুচ্ছ কারণেও লোচিন ছাপোষা, মধ্যবিত্তের মতন ঝামেলা এড়ানো ভয়কাতর লোক হয়ে উঠলো! আশ্চর্য! অথচ, এর চেয়ে সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, অত্যন্ত নির্লজ্জের মতন মিথ্যায় খাবি খাইয়েছি পুলিশ-গোয়েন্দাদের। রক্তপাত ও অত্যাচার, বুকের ওপর লাথি খাওয়া, এক হাতে মদের গেলাস ধরে অন্যহাতে মেয়েমানুষের নিতম্বে চিমটি কাটা, গোয়েন্দাগিরি, স্মাগলিং— মিটার লোচিনের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত পড়তে থাকে, সে যেন ক্রমশ পরিণত হচ্ছে বয়ঃসন্ধির গৌতম বুদ্ধে, বুকের মধ্যে কি রকম একটা হা হা করা ভাব···।

সে আলমারি থেকে লিসবনীব্রাণ্ডের বোতল এবং একটি চমৎকার

বেলজিয়াম গেলাস বের ক'রে টিনের টেবিলটার ওপর রাখে। ইদানীং সে শুঁড়িখানায় যাওয়া বন্ধ করেছে; মৌতাত যা করবার, এখানে একাকীই সারে। এক একদিন রাত্রে খাওয়া অব্দি হ'য়ে ওঠে না, হাতড়ে হাতড়ে বিছানায় ধপাস্ হয়েই দুনিয়াকে চক্রবৎ ঘুরতে দেখে। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা সব মনে আসে। স্বপ্ন দেখতে সে বরাবরই ভালো-বাসে। তবে স্বপ্নগুলি ক্ষণায়ু। একটু বাদেই বুকের মধ্য থেকে কে যেন হাঁক দেয়ঃ হুঁশিয়ার, বাস্তব অনেক কঠিন হে!

সিগ্রেটের প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করতে যাবে, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো।

বিরক্ত লোচিন কপাট খুলেই অপ্রতিভ।

জেন্দাকা। কাঁধে ক্যামেরা নেই। অবসাদ আছে শরীরে। দুই চোখের কোনে হালকা অন্ধকার।

ঃ আরে, আসতে আজ্ঞা হয় দেবী।

লোচিন পরক্ষণেই বুদ্ধিদীপ্ত উল্লাস প্রকাশ করলো।

জেন্দাকা ঘরে ঢুকে পারিপার্শ্বিকতার দিকে সন্ধানী নজর ফেলে ফেলে নাক সিঁটিয়ে বললোঃ সাত সকালে মালের বোতল নিয়ে বসেছেন! কি ব্যাপার?

জেন্দাকার প্রশ্নটা লোচিনের গভীর মর্মে প্রবেশ করলো। হেসে বললোঃ আমি এখন দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়ে আছি। পনেরো দিন। বিশেষ কোথাও যাবার জায়গাও আমার নেই। তাই বন্ধ ঘরে বোতল খুলে অচ্ছ্যুৎ হ'য়ে আছি। সকাল-সন্ধ্যা একাকার।

জেন্দাকা আরো একটু গম্ভীর হলো, চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে দিলো। লোচিন লক্ষ্য করলো, কোট ও হ্যাটের তুলনায় জেন্দা-কারের হাতের গ্লাভস দুটো পুরনো, পলেস্তারাখসা দেয়ালের মতন জীর্ণ। এত বেশি ঢিলে ঢালা পোশাক যে, যুবতীর বুকের ছাঁদটুকুও আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবে ওর কোমর ও ঠোঁটে যথেষ্ট আকর্ষণ আছে।

লোচিন শুনলো, জেন্দাকা বলছেঃ ছুটিতে আছেন। তবে ভালোই

হলো। আপনার এ সময় ছুটি নেবারও প্রয়োজন ছিল।

লোচিনের ভ্রূ কুঁচকে ওঠেঃ কেন বলুন তো?

জেন্দাকা দস্তানা পরা হাত কপালে রেখে বললোঃ বলছি···চলুন, কোথাও ঘুরতে যাই। আমার এখানে বসে থাকতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

লোচিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললোঃ হ্যাঁ, আমি বড় এলোমেলো। ছোটবেলা থেকেই সুক্ষ্মভাবে গুছিয়ে রাখা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

অবিশ্যি একদিক থেকে তা ভালোই হলো। আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার সৌভাগ্য অর্জন করলুম।

জেন্দাকা না হেসে পারলো নাঃ হুঁ, মেয়েদের মন জয় করবার মতন কথা বলতে আপনি পারেন বটে।

লোচিন চোখ বড় বড় করেঃ আপনি কি মনে করেন, কেবল বোলচালে আমি নত্যকে বেঁধে ফেলেছি?

জেন্দাকা বললোঃ অন্তত: এখনো আমার মনে হয়, আপনার জন্য নত্য যতটা আকুল, আপনি নত্যর জন্য ততটা নন।

লোচিন বিস্ময় প্রকাশ করেঃ সে কি! আর কি ভাবে বিশ্বাস উৎপন্ন করতে পারি? বন্দুকের গুলিতে আমার খুলি উড়ে যেতে পারতো, জানেন?

জেন্দাকা সংক্ষেপে বললোঃ শুনেছি।

ঃ তবে এ কথা বলছেন?

ঃ একটা কথা ভুলে যাবেন না, নত্য আপনার চেয়ে অনেক বেশি অসহায়। আপনি যদি প্রেমের কারণে জীবনের ঝুঁকি নিতে পারেন, নত্য পারে সেই প্রেমের খাতিরে আত্মহত্যা করতে। যাকগে, চলুন, আপনার সঙ্গে আজ আমার অনেক কথা আছে।

প্রবল শীতের বিরুদ্ধে পোশাকী প্রস্তুতি সেরে নিলো লোচিন।

বাইরে কিন্তু আজ ঝকঝকে রোদ। বাতাসেও আর্দ্রতা কম। অনেকেই এই অপ্রত্যাশিত সদয় প্রকৃতিকে উপভোগ করতে নেমে

পড়েছে রাস্তায়। গ্রামফোন কোম্পানীর দোকানটাতে রেডিওগ্রামে লেরিতস্থমার ভরাট গলার হৃদয় বিদারক গান চলেছে।···

হাঁটতে হাঁটতে তারা পাহাড়ী উপত্যকার কাছাকাছি পৌঁছে গেল, সেখান থেকে এক সময় জেন্দাকার আবাস অব্দি। ফিনলণ্ডীয় কুকুরটা মিটারকে দেখে প্রথমে হতভম্ব, পরে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। জেন্দাকা জিভের তলায় শব্দ তুলে ওকে সংযত করে।

এই বাড়ি, কাঠের মচ্ মচ্ সিঁড়ি, কিছু ধুলো, নেই কোন বনেদীয়ানা, কেবল কিছু শিল্পময় ছবি—লোচিন ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে বললো, 'অদ্ভুত নির্জনতা···আপনি একা বাস করেন?'

জেন্দাকা স্টোভে পাম্প দিতে দিতে ঘাড় ঘুরিয়ে মিষ্টি হাসলো, 'একা, সম্পূর্ণ একা।'

জেন্দাকা হাসলেও তার স্বর প্রমাণ ক'রে সে শ্রান্ত। ভারাক্রান্ত মন এবং সুদূর স্মৃতি কোন এক সময় তীব্র জ্বালার জন্ম দিতে পারে। একক যুবতীর যত বয়স বাড়ে ততই তো সে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য জেন্দাকা তখনো সেই পর্যায় পৌঁছায়নি। যন্ত্রণাটা তখনো নেগেটিভ ফ্লিমের মতন অস্পষ্ট, তাই সে নত্যর জন্য ব্যথিত এবং মিটারকে সে একজন প্রকৃত প্রেমিক হিসেবে দেখতে চায়।

মিটার স্প্রিং-এর চেয়ারে দোল খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলো, 'কার্বি কি আপনার এই বাড়ির হদিশ জানে?'

গরম জলে কফির গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে ব্যস্ত জেন্দাকা বললো, 'ঠিকানা বিলক্ষণ জানে। তবে আমন্ত্রণ কখনো পায়নি, পাবে না।'

লোচিন সকৌতুকে বললো, সেটা তার মন্দভাগ্য। এমন নির্জন বাড়ির যে অদ্ভুত মাদকতা।'

জেন্দাকার দৃষ্টিতে বিহ্বলতা।

তারপরই নিজের কপালে হাত রেখে লোচিন ফস করে বলে উঠলো, 'আমি কিন্তু নত্যকে নিয়ে প্রথমে এখানেই আত্মগোপন করবো।'

জেন্দাকার দুইহাতে দুই ধূমায়িত কফির কাপে ঈষৎ দোলা লাগে,

সে অস্ফুটে বললো, 'সব্বোনাশ! কী মারাত্মক প্রস্তাবনা! শেষে আমার নামে থানা থেকে হুলিয়া বের করবে ঐ ধনী ব্যাঙ্কার পেডারটা। আর পেরুনিকরা তো বন্দুক নিয়ে আমাকে খুনের তোড়জোড় করবে। না, স্যার আপনাদের মধুর মিলনের জন্য আমি অতখানি ঝুঁকি নিতে পারবো না।'

কালো কফি ও স্যাণ্ডউইচগুলি গলার কাছে দলা পাকাতে পাকাতে নামলো লোচিনের। ভীষণ খাপছাড়াভাবে ঘটনাগুলি ঘটছে বা, ঘটতে যাচ্ছে,—সে মনে করলো। আকাঙ্খার জোরেই তো সব হয় না, একটা আঙ্কিক পরিকল্পনা থাকা দরকার। নত্য বলে পাঠিয়েছে, আগামী পরশু সন্ধ্যা থেকে সে জানালার সামনে বসে থাকবে। লোচিন দড়ি ছুঁড়ে দিলেই সে বেরিয়ে আসবে। তারপর? তারপর সফলতা, নিস্ফলতা —সব কিছুর জন্য দায়ী মিটার লোচিন ভেরোভিক। হয়তো তখন মহাসোরগোল, এলোপাথাড়ি গুলি-গোলা, গালি-গালাজ···ঘাড়ের ওপর রূপসীকে নিয়ে যাবে কোথায় মিটার? সে তো আর কর্পূরের মতন নত্যকে উবিয়ে দিতে পারে না! গির্জা কিংবা, ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান অফিস অব্দি হাজির হবার আগে কোথাও তো একটু গা ঢাকা দিতে হবে। সেই জায়গাটা কোথায়?

মিটার লোচিনের মুখে এইক্ষণে বয়সের রেখাগুলি স্পষ্ট, তাকে আর তেমন চনমনে উন্মুখ বলে মনে হয় না, বরং একটা শীতল ছাপ এসে পড়েছে মাথা থেকে পা অব্দি।

জেন্দাকা বললো, 'কি ভাবছেন, প্রেমিক?'

ঃ ভাবছি তো সেই কথাটাই—নত্যকে নিয়ে কোথায় ঢুকবো? তখন ঐ অত রাতে একপাল শিকারী কুকুরের মতন মানুষগুলির সামনে দিয়ে···।

লোচিনের দ্বিধান্বিত কথাগুলি আচমকাই বৃতিষ্ণার জন্ম দেয় জেন্দাকার ভেতর, যথেষ্ট তিক্ততা ঝরে পড়ে তার স্বরে, 'আপনিও যে দেখছি সেই সব সখের প্রেমিকদের একজন। চাপা গর্বের সঙ্গে বাইরের জগত চষে

বেড়ান, অথচ একটা আত্মগোপনের জায়গা খুঁজে পাবেন না? আর দেখুন, একজন গ্রাম্য মহিলার হাতে বন্দুক দেখে আপনি যেভাবে এখনো কাঁপছেন, তাতে প্রেমিক হিসেবে আপনার কোন অম্লান ভাবমূর্তি আমি পাচ্ছি না। দরকার হলে ঐ সব সোরগোলকে পিছনে ফেলে আপনি পার্শ্ববর্তী কোন শহরে গিয়ে ঢুকতে পারবেন না?' লোচিন রীতিমতন ধাক্কা খায়। সে অবাক হয়ে জেন্দাকার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ক্ষোভের রক্তাভ প্রকাশ। বাড়িটা অসম্ভব নিঝুম।

কুকুরটা গোল গোল চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে।

লোচিন বললো, 'হ্যাঁ, করবো তো কিছু একটা ঠিকই। কিন্তু তার জন্য একটা পরিকল্পনা, একটা ছক সাব্যস্ত হওয়া দরকার। আমি তো মনে করি তারাই যথার্থ প্রেমিক, যারা প্রেমের একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতিকে নিখুঁত করে তুলতে পারে। তড়িঘড়ি সাহসিকতার নামে আদেখলাপনা দেখাবার কি কোন মানে আছে।'

জেন্দাকা চুপ ক'রে থাকে।

তবু মনে হলো, কে যেন সশব্দে হেসে উঠেছে।

লোচিন কফির কাপে চুমুক দিলো। কুকুরটা সভয়ে ও সতর্কতায় এখনো তাকে লক্ষ্য করছে। মিটার লোচিন কিছুক্ষণ জোরে জোরে পায়চারি করে। জেন্দাকার দু'চোখের যন্ত্রণা। লোচিন দক্ষিণের জানালার সামনে দাঁড়ালো। সামনে অবারিত প্রকৃতিকে দেখে তার কোঁচকানো ভুরু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। পাতলা হাসি ফোটে ঠোঁটের কোনে। তুষারের প্রলেপ মাখানো পিচ্ছিল জমিতে হাঁটি হাঁটি পা—পা একটি ছোট্ট মেয়ে যেন ব্যালেনাচের কসরৎ করছে। তর্জনী তুলে তাকে কৃত্রিম শাসন করছেন একজন ভদ্রমহিলা, যাঁর পিছনে একজন সুহেদী পুরুষ! একটি পরিবার। একটুকরো সুখ-সম্ভাবনা ঢুঁ মেরে গেল! গোঁ গোঁ বাতাসের ঝাপটা শ্রান্তিহীন। লোচিন তার মানস-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। নত্য বড় সুন্দরী এবং সে যে সাহসিকা, সন্দেহ নেই; কিন্তু সে কিছুই জানে না, কিছুই

বোঝে না; কেবল সে উৎকর্ণ অপেক্ষায় আছে, কখন লোচিন তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটবে, ছুটবে···ছুটবে কোন দিকে।

জেন্দাকার দুই চোখ উজ্জ্বল। সে নিবিষ্টভাবে দেখছে মিটার লোচিনের চিন্তাক্লান্তি। বুদ্ধিদীপ্ত সৌকর্যে ও স্বভাবসুলভ কৌতুকে কখনো কখনো জ্বলে উঠলেও লোকটা কি আদত প্রেমিক। এই তার একটা সন্ধিক্ষণ, যখন খুব ভীরু প্রেমিকও দুর্দ্দান্ত সাহসী ও বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে। অথচ এ কিনা শূন্য চোখে ভীতির শ্লেটে আঁক কাটতে বসেছে!

ঃ মিঃ ভেরোভিক, আপনি কি খুব ঘাবড়ে যাচ্ছেন।

—জেন্দাকার জিজ্ঞাসাটা তীর বেগে বিদ্ধ করলো লোচিনকে!

লোচিন ঘুরে দাঁড়ালো, 'না, আপনি আমাকে এখনো ভুল বুঝছেন। ঝুঁকির সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আমার কোন খেদ নেই। তবে অস্থির অধৈর্যে কিছু একটা করে ফেলে নতাকে চিরদিনের মতন হারাতে চাই না। পরিকল্পনা দরকার। বুঝতে পারছেন, এটা মাথা খারাপ করবার সময় নয়।'

লোচিনের বিমূঢ় ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখের ওপর সরাসরি চোখ রেখে জেন্দাকা ঠোঁট ভেঙ্গে হাসলো, 'পরিকল্পনা! করুন। তবে যেন জন ডিন—বার্কারের মতন আর একটা জঘন্য উদাহরণ সৃষ্টি করবেন না।'

মিটার হতবাক, 'কে বার্কার।'

জেন্দাকা তার অভিজ্ঞতা থেকে এক কাপুষের গল্প বললো, 'বার্কার এই পাদপ-বিরল কম বসতি এলাকার একজন পুস্তক-ব্যবসায়ী। বাবার ছিল জলসত্রের কারবার; কিছুটা লেখাপড়া শিখেছিল বলে বার্কার আর পান্থজনকে জল খাওয়াতে রাজি ছিল না। স্কুল-কলেজে বই-খাতা সরবরাহ করতো! তার চোখ আর ভাবভঙ্গী এমন ছিল যেন কোন ভালোবাসার অণ্বেষণে হন্যে হ'য়ে ঘুরছে ছোকরা। কিছুদিনের মধ্যেই তার নির্লজ্জ লেলিহ দৃষ্টি খুঁজে পেলো আমাদের স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী লিলিকে। লিলিও ওর গোঁফে-চাড়া ভাব দেখে উষ্ণ

নিঃশ্বাস ফেলতে দেরী করলো না। শুরু হলো দুর্দ্দান্ত প্রেম। ফৌজী কুর্ত্তা পরা বার্কার প্রায়ই লিলিকে নিয়ে কেবল নির্জনতা খুঁজে বেড়াতো। আর ধোঁয়াটে বাতাবরণের মধ্যে বসে কত যে চিঠি দুজন দুজনকে লিখলো, তার বুঝি ইয়ত্তা হয় না। ঐ চিঠিগুলি স্তূপীকৃত করলে আল্পসের চূড়ো ডিঙ্গিয়ে যাবে। পথিক সুজনরা তাদের চিনতো, গূঢ়-কৌতুক জাগলেও আমরা মেয়েরা ও তাদের খুব একটা বিরক্ত করতাম না।

শেষে একদিন লিলি এসে বার্কারকে জানালো, তার বাবা সপরিবারে এই এলাকা ছেড়ে অনেক দূরে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং দীর্ঘ অদর্শনে সে বেঁচে থাকবে কি ভাবে। স্পন্দমান বুক চেপে সে তার মাকে সব বলেছে। মা আবার দেরি না ক'রে তোসাখানায় ঢুকে বাপকেও বলে এসেছেন কন্যার কাণ্ডকারখানা। দু'জনে ঈষদন্ধকারে বসে অনেক বিবেচনার পর ঠিক করলেন, লিলিকে তাঁরা দুঃখ দিতে চাননা। চলে যাবার আগেই বিয়েটা দিয়ে যেতে চান। কেবল একবার পাত্ররত্নটিকে চাক্ষুষ করবার বাসনা। আর ঐ ফৌজীকুর্তা পরে বার্কার যদি একবার গিয়ে লিলির মা'র সামনে দাঁড়ায়, মা হয়তো নিজেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান অফিসে নিয়ে যাবেন। উল্লাসে, আহ্লাদে লিলির মুখ থেকে লুব্ধ শীৎকার বের হলো। কিন্তু বার্কারের মুখ তখন থেকেই কালিবর্ণ। কোন রকম হর্ষোল্লাসসূচক মন্তব্য না করে কোণ-নেওয়া বিড়ালের মতন বললো, আমি একটু নিজেকে প্রস্তুত করে নি; তারপর পরিকল্পনা মাফিক তোমার মা-বাবা দু'জনকেই কব্জা ক'রে ফেলবো। লিলিকে এড়িয়ে এরপর বার্কার খালি ভাবছে, আর ভাবছে। লিলি তাকে খুঁজে পাচ্ছে না, বন্ধুর তার নাগাল পায় না, এতবড় ভাবনায় পাহাড় বুঝি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মাথার ওপরেও ছিল না। ফৌজী কুর্ত্তায় চাকচিক্য হ্রাস পেয়েছে, মাথার চুল খাড়া খাড়া গম্ভীর স্বর রাতারাতি আনুনাসিক। দু' রাত ছটফট করে একদিন বিলকুল হাওয়া হ'য়ে গেল বার্কার। সাময়িকভাবে গা ঢাকা দিলো।

করলগ্ন কপোলে লিলি বেচারি অনেক অপেক্ষার পর স্বয়ং খুঁজতে বের হলো। হায়, পোড়াকপাল! কোথায় বার্কার? এতকাল চিত্ত বিনোদনের উল্লাসে ছিল, এখন দায়িত্বের প্রসঙ্গ উঠতেই চোরের মতন পালিয়েছে। যে লোকটাকে উচিত ছিল নিথর নিস্ফলতায় ভরিয়ে রাখা তাকেই কিনা প্রেম দিয়ে বসেছে লিলি। চোখের জল মুছতে মুছতে কত খোঁজ সে করলো! পাবে কোথায়? সেই কাপুরুষ তো হিসাব নিকাশের ভয়ে কোন অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। অথবা ছেলেরা যা করে থাকে, খুব নেশা করে নিদ্রালুচোখে সব ভুলে যাবার চেষ্টা করছে।

জায়গাটা শেষবারের মতন ছেড়ে যাবার সময় লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে লিলি জড়বৎ। কী ঘেন্না বলুন তো! লিলিরা চলে যাবার দু'দিন পরেই শ্রীমানের আবির্ভাব। উচিত ছিল, সব মেয়েরা দলবদ্ধ-ভাবে গিয়ে ওকে পিটিয়ে আসা। আমার ভেতরটা তো এখনো ওটাকে দেখলে আঁকুপাঁকু ক'রে ওঠে। আরো মজা কি জানেন? বছর চারেক আগে এক সম্পন্ন চাষীর মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে বার্কার। এরই মধ্যে তিনটে ছানার বাপ। বউ মুখরা, কথায় কথায় মেনীমুখো মরদের দিকে তেড়ে যায়, আর পতি দেবতা বই-পত্তর ঠাসা ট্রলিটা নিজের হাতে ঠেলতে ঠেলতে পরম তুষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রে থাকেন।'

জেন্দাকার বার্কার উপখ্যানের ইতি। মিটার লোচিনের ইতিমধ্যে কোন বাঙ্ নিষ্পত্তি ঘটেনি। তবে অনেকটা শিকারী শ্বাপদের মতন মুঠি পাকিয়ে ছিল। জেন্দাকা থামতেই বললো 'আমাকে আপনি বার্কার ভাববেন না। আপনার সহযোগিতা মূল্যবান, এবং তারজন্য ধন্যবাদ। তবে এটুকু জানবেন যে, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ না হলেও নত্যকে আমি কখনোই হারিয়ে যেতে দিতুম না। আপনি আশাকরি আমার দৃষ্টান্ত দেখবার পর আমরা বার্কারের গল্পটি ভুলে যাবেন।'

জেন্দাকা হাসলো, 'এ যুগের রোমিও—জুলিয়ট ?'

লোচিন তেজের সঙ্গে বললো, 'রোমাকের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয় তা-ই। আর ঝুঁকি নেবার ক্ষেত্রে আমি রোমিওর চেয়েও বেপরোয়া··· আপনাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাই।···এখন চলি।···দয়া করে নত্যকে জানিয়ে দেবেন, পরশু সন্ধ্যায় মিটার লোচিন চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছে। যাবেই।···'

লোচিনের স্বরে প্রার্থিত শপথের সন্ধান পেয়ে এতক্ষণে পাথরের কোঁদামূর্তি জেন্দাকার ঠোঁটে সহানুভূতি সূচক হাসি ফুটে ওঠে, 'আপনাদের জয় হোক।'

লোচিন কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে, কোমরে ডান হাত রেখে সামান্য ঝুঁকে বললো, 'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার মতন কোন ফোন নম্বর দিতে পারেন ?মানে যদি দরকার হয় জেন্দাকা হাসলো এ বাড়িতে কোন টেলিফোন নেই। আমাদের স্টুডিও-মালিকের খরচের ভয়ে টেলিফোন রাখাটা মনঃপুত নয়। তবে এক প্রতিবেশীর আছে , আমি বাড়ীতে থাকলে, ফোন এলে তাঁরা অনুগ্রহ করে আমাকে ডেকে পাঠান। নম্বরটি লিখে নিন—T 7038.'

'ধন্যবাদ। আজ আসছি।'

সতর্ক ও বিরাগপূর্ণ কুকুরটাকে পাশ কাটিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল লোচিন।···

তারপর দুটো দিন সে নিজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে বিধ্বস্ত। মনের পর্দায় একটির পর একটি ইস্তাহার লেখে আর কাটাকুটি করে। বেশির ভাগ সময়ই তার মনে হলো, হুটমুট এমন কাণ্ড করতে যাওয়াটা রীতিমতন হঠকারিতা ; আবার কখনো কখনো মগজে ঝিলিক মারতে থাকে জেন্দাকার বাঁকা ঠোঁটের ব্যঙ্গ হাসি এবং কাপুরুষ বার্কার।··· দুটো দিন, দুটো রাত বিপন্মুক্তির খোঁজে চূড়ান্ত অশান্তির মধ্যেই কাটলো। চোখে ঘুম নেই, প্রচুর মাল টেনেও মনে হয়, বিবেক শ্যেন-

দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, বুকেও খানিকটা সর্দি জমেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সাঁই সাঁই শব্দ। বাইরের দুনিয়াটাও কী জঘন্য! সবাই শীতার্ত, কেউ আর হাতের দস্তানা খুলতে চায় না, রাজপরিষৎ কি ভাবে সে রাজ্যের ন্যায়নীতি দণ্ডনীতি বহাল রাখছেন, খোদায় মালুম! তৃতীয়দিন সূর্য ওঠা-মাত্র সে চললো কার্বির ডেরার দিকে। রঙিন রোদের মধ্যে তুষারের ঝির ঝিরানি বাস্তবিক নয়নাভিরাম। মাত্র কয়েক গজ দূরে গুটি কয়েক চকচকে গলির গিরিচক্রের মধ্যে রিলিফ দপ্তরের ভাড়া করা আবাসে কার্বি থাকে। লোচিন দেখলো, কোয়ার্টারের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। জানালাও তাই। কার্বি কি এখনো ঘুমিয়ে?

কলিংবেলের কান্না শুনে ভেতর থেকে তেজালো স্বরে কার্বি জিজ্ঞেস করলো, 'কে? এখন ফিরে যাও। পরে এসো।'

লোচিন কার্বির হুমকি শুনে অবাক। নির্গুণ লোকটার হঠাৎ এমন বাদশাহী মেজাজ! সে আবার বেলের ওপর চাপ দেয়। কার্বি রীতিমতন গর্জে ওঠে, 'কোন বুদ্ধুরে!'

লোচিন স্বর তুলে বললো, 'আমি লোচিন দরজা খোলো, ইয়ার। আর কত ঘুমোবে? চারিদিকে খররৌদ্র।'

কপাট খুললো আরো অন্তত: মিনিট তিনেক পর। কার্বির মৌতাত বাজেয়াপ্ত। ভীষণ অসহায় ও অখুশি সে।

পুষ্টোদর কার্বির চেহারা দেখে মিটার বিস্মিত। লাল চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, দুই পা টালমাটাল। সবচেয়ে মজার, প্যান্টের বোতাম লাগাতে ভুলে গেছে। রীতিমতন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কার্বি—তুমি! এ সময়?

মিটার—ভেতরে চলো। কথা আছে।

কার্বির ইতস্ততভাব দেখে লোচিনের সন্দেহ হয়, 'কি ব্যাপার, ভেতরে কেউ আছে নাকি হে?'

কার্বি আঁতকে উঠে তোতলাতে থাকে, 'ইয়ে—মানে, শরীরটা খুব

ম্যাজমেজ করছিল···তাই একটা পাহাড়ী মেয়েকে এনেছিলাম। ওর কাছে ভালো মালিশের তেল···'

লোচিনের তুই চোখ কপালে ওঠে, ঠোঁটে অবিশ্যি কোন রকম অসূয়া বিদ্ধ হাসি নেই, 'ও গড! তাই তো বলি···কোথায় সে, দেখি কেমন মালিশ···।'

কার্বিকে এক রকম ঠেলে ভেতরে ঢুকে তাকে আবিষ্কার করলো লোচিন।

হুঁ, ঐ তো বাথরুমের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে। সেই পরিপুষ্ট যাযাবর মেয়েটা, প্রথম দিন ভবঘুরেদের শিবিরে রিলিফের গুঁড়োতুধ বিলাতে গিয়ে যার অদ্ভুত নিরেট যৌবন দেখে কার্বি ও লোচিন শির শির যৌন অনুভূতিতে কেঁপে উঠেছিল। নোংরা স্কার্ট, ময়লাজমাট দলাপাকানো লাল চুল, বাঁ দিকের কণ্ঠায় লেগে আছে খানিকটা পোড়া সিগ্রেটের ছাই, কালো চোখের নীচে অনেক কালি, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উদ্ধত ওর বিশাল বুক এবং স্বৈরিনী স্পর্ধায় ছড়িয়ে থাকা ওর মোটা মোটা তুই লোমশ পা। সরাসরি লোচিনের মুখের দিকেই চেয়ে আছে। লোচিনের রক্তে বেহালার ছড়-চমক। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললো, 'মালিশ! হ্যাঁ, এরা খুব ভালো তেল বানায় এবং তোফা ডলে ডলে দেয়।···আমিও বাতের ব্যাথায় বেশ কষ্ট পাচ্ছি কার্বি। এই মালিশটা আমার দরকার। এখনই—'

কার্বি ঢোঁক গিলে হাত নেড়ে নেড়ে যেন পোকা অথবা, বিপদ তাড়াবার ভঙ্গীমায় বললো, 'তুমি কি মেজরের কানে তুলে এ নিয়ে একটা হুজ্জুতি বাধাবে নাকি?' কার্বির উদ্বেগকে লুফে নিয়ে জিব ও ঠোঁট কাঁপিয়ে হো-হো হাসিতে ফেটে পড়লো লোচিন, 'এটা একটা কথা হলো দোস্ত? আমি কি এতটা গর্ধভ? তবে মালিশ ব্যবহার করবার আগে আমার দাবিটা তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল। আমি হলে কিন্তু অন্ধকারেই ছুটুতে ছুটতে আসতুম তোমায় খবর দিতে।'

কার্বি চাপাস্বরে বললো, 'কেন তুমি তো নিরামিষ নও। আমারই

প্রাক্তন বান্ধবী জেন্দাকাকে দিব্যি গেঁথে তুলেছো। কালকেই তো দেখলাম, গল্পে খুব মশগুল হয়ে রাস্তা পার হচ্ছো! কি ঠিক নয়?'

লোচিন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। জেন্দাকার প্রসঙ্গ ও কার্বির ইঙ্গিতে তার গা সির সির করে উঠলো। কে যেন বুকের কাছে একটা খোঁচাও মারলো। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সে বলে, 'আমার সন্দেহ হয়, তোমার মাথায় ঘুলির বদলে প্রচুর পুরু চর্বি জমে আছে। উত্তাপের দরকার। জীবনে কখনো কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছো? কখনো অনুভব করেছো, বুকের কাছে দমবন্ধ ভাব? করোনি। কেবল জানো, এইসব মালিশ। রাবিশ!'

একটু থেমে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্বরে আবার সে বলতে শুরু করে, 'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এখনো বলছি, ঐ জেন্দাকা আমার কাছে আসে স্রেফ দূতিয়ালী করতে। সে আমার প্রিয়ার বার্তা বয়ে আনে। এমন সন্দেহ বাতিক মন নিয়ে মেয়েদের কাছে তুমি কোনদিনই যথার্থ খাতির প্রতিপত্তি পাবে না।··· যাক কে, কথা বাড়িয়ে কি হবে। প্যাণ্টের বোতাম লাগাও।'

সঙ্কোচে কার্বির ডান হাতটা বেঁকে ধনুক হ'য়ে গেল—সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বোতাম আটকাতে থাকে।

লোচিন সেই সময় টলতে টলতে এগিয়ে যায় ঘরের এক কোনে রাখা টেলিফোনটার দিকে। একটা স্যাণ্ডফ্লাই এসে ঘরময় ঘুরতে থাকে। চারবার ডায়াল ঘুরিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলো মিটার লোচিন—

'·· হ্যালো, একবার অনুগ্রহ ক'রে জেন্দাকাকে ডেকে দেবেন?··· আজ্ঞে আমার নাম মিটার লোচিন ভেরোভিক···মার্কিন রিলিফ দপ্তর··· সত্যি, জরুরী···'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

কার্বি উৎকর্ণ।

পাহাড়ী মেয়েটা তখন ঘরময় হাঁটছে, হাঁটতে হাঁটতে খাট থেকে এয়ার পিলোটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো।

আবার লোচিনের স্বর ঃ

'…কে জেন্দাকা? সুপ্রভাত দেবী। আমি লোচিন…গলার আওয়াজে নিশ্চয় টের পাচ্ছেন, আমি কতখানি অসুস্থ…সিগ্রেট, লাইটার—এইগুলি অব্দি খুঁজে নিতে ইচ্ছে হয় না…ভাবছি, হাসপাতালে সিট নেবো হ্যাঁ, গতরাত থেকে এই সব উপসর্গ…জ্বর, সর্দি, সর্বাঙ্গে ব্যথা…কোন রকমে কার্বির ঘরে এসে ফোনটা করছি আপনাকে…কার্বি? কার্বির তো বাতের ব্যথা, মালিশের তেল ব্যবহার করছে, ঠাণ্ডায় শরীরটাকে গরম রাখা আর কি…'

কার্বি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো 'আমার প্রসঙ্গে আর এগুবে না কিন্তু লোচিন।'

লোচিন বলে চলেছে ঃ

'…এবার কাজের কথা। নত্যাকে বলবেন, বুঝিয়ে বলবেন লক্ষ্মীটি ·· কাল নয়…কোন রকম তাড়াহুড়োর দরকার নেই…ঠিক বিয়ের আগের রাত্রে আমি যাবো একটা গাড়ি নিয়ে…আরে এটাই ঠিক… বিলকুল পরিকল্পনামাফিক…গাড়িতে তুলে নিয়ে ত্রিয়েশতির সীমানাই পার হয়ে যাবো…ব্যাঙ্ক অফিসার আঙুল চুষবে…আপনি ওসব বার্কার-ফার্কার ভুলে যান · লোচিনের দৃষ্টান্ত দেখে স্বয়ং প্রেমিক খুঁজতে বের হ'য়ে যাবেন। হলপ করে বলছি। শপথ ক'রে বলছি।…' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কার্বির দিকে কটমট ক'রে তাকালো লোচিন, 'শুনলে তো রাস্কেল! আমি জেন্দাকাদেবীকে ফোন করেছিলাম। ওর সাহায্যে নিজের ফিঁয়াসেকে ইলোপ করবো। আর তোমারও সাহায্যের দরকার।'

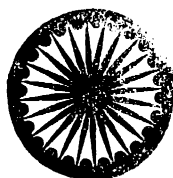
'আমি?'—কার্বি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

'পরে বলবো।'—লোচিন বললো। তারপরই তীব্র জ্বালাভরা দৃষ্টিতে তাকালো পাহাড়ী মেয়েটার দিকে। সেই দৃষ্টির তীব্রতায় মেয়েটার হাসি শুকিয়ে যায়। সে ভয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠলো লোচিন, 'আর যদি ফের এই তল্লাটে ঢুকবি তো তোর বুক দুটো কেটে ঝুলিয়ে রাখবো। বেরো, বেরো, কুত্তি…।'

মেয়েটা ছুটে পালায়।

লোচিন খামচে ধরে কাবির শার্ট। তারপর ছেড়ে দিয়ে খুব চাপা অন্তরঙ্গ স্বরে বলে, এ সব ভালো নয় কাবি, খুব খারাপ। ওদের শরীরে বিষাক্ত রোগ আছে। জেন্দাকার মতন মেয়েকে ভালোবাসতে পারলে না? মূর্খ!'

জানালা দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক সিঁদুর গোলা রোদ এসে লুটিয়ে পড়লো এই লণ্ডভণ্ড ঘরের মধ্যে।



ঘুম ঘুম মুহূর্ত উত্তুরে বাতাস, অসম্ভব শীতার্ত গ্রাম, শস্যহীন মাঠ-ময়দানের হি হি হাহাশ্বাস—সব কিছু দাবিয়ে একটা উৎসব, একটা উল্লাস, একটা হো-হো হাসি, দামাল রক্তের একটা উন্মাদনা গড়াতে গড়াতে নানান ঢঙে এখানেই কেন্দ্রীভূত। পিল পিল ক'রে মানুষ ঢুকছে পেরুনিকদের বাড়িতে, মেয়েরা, পুরুষেরা পরিজনেরা, প্রতিবেশীরা। এত বড় একটা জাঁকালো বিয়ে বহুকাল দেখা যায়নি। তিল তিল ক'রে গড়ে তোলা তিলোত্তমা, যে কিনা নিষ্পাপ কুমারী, প্রথম নিজেকে পুরুষের কাছে উন্মোচিত করবে প্রথাগত শুদ্ধতায়। গীর্জা সাক্ষী, মা মেরী সদয়া হবেন, ঈশ্বর পুত্র ভাবীকালের বীজ প্রত্যক্ষ করবেন, জীবনের বাঁকমুখ এমন মধুময় ঐশ্বর্যময় হ'য়ে থাকুক। এ তল্লাটের সেরা বাজনাদারেরা মজুদ। প্রধান বাজনাদার জো লিফটনকে দেখলেই মনে হয়, নিজের প্রতিভা প্রমাণে এই নিগ্রো ছোকরা আজ বেপরোয়া। আর সত্যি, যখন সে ক্লারিওনেটে ফুঁ দিয়েছে, সকলের বুকের রক্ত যেমন তেমন, বর পেডার সেড্রিক যেন ঝুঁটি ফোলানো লড়াকু মোরগের মতন কেঁপে উঠলো। বয়স মেঘের আড়ালে আড়ালে এতকাল যে থাবা

বসিয়েছে, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য নিজের তরফ থেকে প্রস্তুতির কোন অভাব নেই। ধবধবে শাদা পোশাকে সে বাস্তবিক মনোগ্রাহী। কনসর্টটে বিন্দুমাত্র বিষন্নতা নেই, কখনো শোনায়—নাচ, নাচ, গোল হ'য়ে নাচ; কখনো মনে হয়,—লাগাবে দাঙ্গা, লাগাবে মারদাঙ্গা। আসলে দুনিয়ার যত আহ্লাদ ও রস এখানেই চুইয়ে চুইয়ে নামছে। আগেই স্থির করা হয়েছে, বরও অনেক নিয়ে একটা বড় সড় মিছিল গ্রাম ছাড়িয়ে, শহরের মধ্যে দিয়ে ত্রিয়েশতির সবচেয়ে পুরনো গীর্জায় গিয়ে থামবে। হাওয়াগাড়ির গর্জন নেই, ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়বে না, তারা তালে তালে পা মিলিয়ে মিলিয়ে যাবে, ফুলও কিছু কিছু ছড়াবে পথে। যুবকদেরই কাছাকাছি থেকে মস্করা করবে, প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারা কৃত্রিম হুঁশিয়ারী ছুঁড়বেন। কত রকম রঙের স্কার্ট যে চলমান পতাকা হ'য়ে উড়ছে, খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা কষ্টকর। নত্যর মা তো একবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে কেঁদেই ফেললেন। নত্যর বাবা তাঁর সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে এত দ্রুত গতিতে কথা কইছেন যে, সময় সময় শব্দগুলি যেন দুর্বোধ্য বেতার-সংকেত হ'য়ে দাঁড়ায়। একবার তো তিনি ঘোষনা ক'রে বসলেন, কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে তিনি মিছিলের প্রায় সামনেই থাকবেন। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবকে এক রকম উড়িয়ে দেওয়া হলো, আজকের এমন উৎসবের দিনে বন্দুক-ফন্দুক কোন রেখাপাতই করতে পারে না।

এখনো কনে এসে বরের পাশে দাঁড়ায় নি। তবে তার সাজ-সজ্জা সাঙ্গ। সারারাত বিনিদ্র থাকায় মুখ চোখ লাল। সে তার নিজস্ব ঘরটিতে কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে চাইলো। কেউ তাকে তাই এই মুহূর্তে বিরক্ত করছেনা, আসলে যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। সমস্ত ঘরখানা কনের দৃষ্টিতে এখন যেন একটা শিল্যুয়েট ছবি। সে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছে না। চোখটা কড় কড় করছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে এক রকম হাতিয়ে হাতিয়ে সে শেষবারের মতন সেই জানালাটাকে খুঁজে নিলো, সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার কপাটটাকে

খুলে ফেলবার চেষ্টা করলো। পারলো না। অভিশপ্ত গবাক্ষ। যে ঘর তার কাছে এতদিন ছিল বড় প্রিয় রম্যকক্ষ, এখন সেটা নরক বলে মনে হচ্ছে। কাল সারাটা রাত সে এই জানালার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে ছিল। সারাটা রাত। কী আশ্চর্য সুন্দর চাঁদ উঠেছিল আকাশে। রোমান্টিকতার চূড়ান্ত রেখাকে স্পর্শ ক'রে নত্য জুলিয়েট হয়ে গিয়েছিল। সে যেন বাতাসের আনাগোনায় পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলো, শেক্‌স্‌পীয়রের রোমিও জানালার নীচে দাঁড়িয়ে জুলিয়েটকে বলছে ঃ

What light through yonder window breaks ?
It is the east, and julliet is the sun !
A rise, fair sun, and kill the enviuos moon,
Who is already sick and pale with grief.

মিথ্যা, মিথ্যা, সব মিথ্যা। জোচ্চর, ঠগ, মস্তান, কালোয়ার—বাজারী মেয়ে জেন্দাকার সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে আমাকে চুষলো। তারপর দায়িত্বের কথা আসতেই ভোঁকাটা। ছিঃ ছিঃ—এই শরীর, এই মন নিয়ে আমি কিভাবে একজন পুরুষকে সারাটা জীবন ঠকাবো? জানালার কপাট ধরে আরো কয়েকবার ঝাঁকুনি দিলো নত্য। কিছুক্ষণ ঐ কপাটের ওপরই কপাল রেখে হু হু কাঁদলো। তারপর কখন যেন সে যন্ত্রচালিতের মতন পেডার সেড্রিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাজনা বেজে চলেছে।

শোভাযাত্রাও শুরু হলো উৎসবের রঙ ছড়াতে ছড়াতে।

জেন্দাকা ভীষণ হিংস্র। আজ সে বোধহয় যে কোন যুবককে খুনও করতে পারে। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সে একটার পর একটা ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করছে! এক নম্বর, সে ভাবলো মিটার লোচিনকে সে আর একদিন তার এই বাড়িতে নিয়ে এসে কালো কফির সঙ্গে তীব্র বিষ মিশিয়ে দেবে। দুই নম্বর, কামুক মাথামোটা কার্বিকে একদিন খেলাতে খেলাতে পাহাড়ের ওপর টেনে নিয়ে গিয়ে নীচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে।

তিন নম্বর, মোটা-সোটা গোলগাল হাসি হাসি মুখ নিয়ে যে সব ন্যাকা পুরুষ তার ক্যামেরার সামনে এসে বসে, তাদের ছবি সে যতদূর সম্ভব জঘণ্য ক'রে তুলবে। চার নম্বর, সে কোন পুরুষের সঙ্গে কথাই বলবে না! ক্রমশই তার প্রতিজ্ঞাগুলি নরম ও সাধারণ হয়ে এলো। আসলে জেন্দাকা বড় অসহায় এই মুহূর্তে। ক্রমশই সে আন্দাজ করতে পারছিল, মিটার লোচিন ভেরোভিক নিকৃষ্ট স্তরের লোক। সে কেবল কাপুরুষ নয়, শয়তান! কাল সন্ধ্যায় জেন্দাকা তিনবার লোচিনের ডেরায় হানা দিয়েছে। তিনবারই ব্যর্থ। পাখি হাওয়া! সেই পুরনো গল্প। ক্ষিপ্ত জেন্দাকা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তার প্রিয় কুকুরটার পেটে লাথি কষালো। তার দুই চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলতে থাকে, 'তুই তো একটা পুরুষ। তোকে আমি দূর করে দেবো।...'

আর সেই সময় কাপুরুষ নায়ক প্রবর কি করছে? গত সন্ধ্যা থেকেই সে নিজের ঘরছাড়া। কার ভয়ে? নিশ্চয় জেন্দাকা। যুবতী মেয়ে সমানে তাকে আক্রমণ করবে, কটাক্ষ করবে, চিৎকার করে ওঠাটাও বিচিত্র ছিল না। মিটার লোচিন এখনো এমন মহিলা ধিক্কারের সঙ্গে সড়গড় নয়। সুতরাং, সে সমূহ গা ঢাকা দিলো। এই শহরেরই একটি সস্তা হোটেলে গিয়ে ঢুকলো।

হোটেলের মালিক—কাম ম্যানেজারের একটা চোখ নষ্ট, সব সময় কালো চশমা পরে শাদা দাঁত বের ক'রে হাসে।

লোচিন তার সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি বললো, আমি মাল খাবো। একটি নিরালা ঘর চাই রাতটুকুর মতন।'

কালো চশমার শাদা দাঁত ঝিলিক দিয়ে উঠলো, 'এটা কিন্তু বার নয় স্যর।'

লোচিন আর কথা না বাড়িয়ে নিজের পুরুষ্ট মানিব্যাগটা বারকয়েক শূন্যে নাচালো।

কালো চশমার হাসি বিস্তারিত হলো, বুঝেছি সব শালাই আইন মানছে।...চলুন...এগারো নম্বর ঘরখানা খাসা।'

ছোট্ট ঘর বলেই বেশ গরম। দেয়ালে কালি-ঝুলি। ফায়ার-প্লেসের সামনে ঢুলুনি-চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগলো লোচিন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বোতল এলো, গেলাস এলো, ভাজা মাংসের প্লেট এলো এবং ঐ সমস্ত সাজিয়ে চাট হিসাবে আবির্ভূত হলো একটি সস্তা মেয়ে, যার দুরন্ত গড়ন ও খুদে কটা চোখ আবছা অন্ধকারে উত্তেজনা ছড়াবার পক্ষে যথেষ্ট।

লোচিন কিছুক্ষণ সেই কটা চোখের দিকে চেয়ে শীতল স্বরে বললো, 'আমি বোতল চেয়েছি, তোকে চাইনি। ভাগ।'

নিরাশ মেয়েটা বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল। হোটেলে ঢুকে মাল খাবে. অথচ মেয়েমানুষ নেবে না—আজব।

এরপর যথারীতি লোচিন সারাটা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি।কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মালও সে খুব একটা টানেনি ! মাঝে মধ্যে উঠে গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছে। নীচেই একটা ছোট্ট পোষ্টঅফিস। মনে হয়, এখানেই যেন বাইরের জগৎ শেষ হয়ে গেছে। সবকিছু ছাপিয়ে নিজের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা অনুভব করছিল লোচিন। রাতটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে। পূর্ণিমার আগের রাতেও চাঁদ কী মহিমামণ্ডিত ! চাঁদের আলোয় ঐ দূরে গ্যারেজে লজঝড় গাড়িটাকেও ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ! এই রাত যত মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়বে, বীর লোচিন ভেরোভিক ততই এক ক্লীব কাপুরুষে পরিণত হবে। যে পুরুষ একজন সমর্পণে উন্মুখ নারীর দায়িত্ব নিতে পারে না, সে তো পৃথিবীর আবর্জনা। এমন লোকের কাছ থেকে সমাজও কোন ফায়দা তুলে নিতে পারে না। অথচ আমার মতন আত্মপ্রবঞ্চক হাজারে বিরল—সর্বত্র নিজেকে বড় ক'রে জাহির করবার অপচেষ্টা। দুনিয়াশুদ্ধ সকলে শিক্ষানবিশ এবং আমিই একমাত্র শিক্ষক। একদিন আমার বয়স হবে, চর্বির চাপে হয়তো গোলগাল হয়ে যাবো, দাঁতের রং হবে সবজে, চোখ হবে পানশে ঘোলাটে এবং তখন আমার একটা বউ থাকবে, যার টেবো টেবো বাদামি রঙের মুখে কেবলই ভেংচি। আমার আত্মহত্যা করা উচিত।

আমি মিথ্যুক নাবিকদের মতন অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প ফাঁদতে ভালোবাসি। বেশীর ভাগই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাহসিক উপগাথা, প্রাচীন নায়কদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দি আর কি! বর্বর, বর্বর! আত্মগ্লানি আমায় কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। জীবনটা তো কম সংঘাতপূর্ণ নয়, পাঁজরে এখনো ঝন্ ঝন্ ব্যথা এবং মাথাটা বুলেটের মতন। তবে কেন আমি এভাবে পিছিয়ে এলাম? কেন? কাল সকাল থেকে একটি সপ্রতিভা যুবতী আমার নামে থুতু ছিটিয়ে ছিটিয়ে হাঁটবে, রাজ্যের লোককে রসিয়ে রসিয়ে বলবে আমার ভীরুতার কথা! ছ্যা, ছ্যা, এ যে ভিক্ষে করার চাইতেও খারাপ। কোথায় উঠে যাবে সমস্ত আত্মপ্রসাদ।

কিন্তু এটাই কি সব? আমি কি নত্যার প্রেমে আবদ্ধ নই?

হায়, ঐ নত্যা—এখনো নিশ্চয় জানালার ওপর ঠায় বসে আছে এক দৃষ্টিতে দেখছে সেই ঝোপটা, পাখ পাখালির ঝাপটা থাকলেও হানাদারী শিষ তো আর বেজে উঠছে না। খোশামুদে হাসি খলখলিয়ে উঠছে নানান কোন থেকে—কাল সকালেই নত্যা সুন্দরীর নতুন জীবন। প্রত্যাশাভঙ্গের ব্যাথায়, লজ্জায়, অপমানে দারুণ লাল হয়ে উঠছে। তার স্বপ্নও বাস্তবের যুবরাজ আস্তে আস্তে একটি গুবোরে পোকাতে পরিণত, বিপদের গন্ধ পেলেই যার আত্মগোপনের ভঙ্গীমা ও কলাকৌশল অদ্ভুত ও হাস্যজনক।

আমার ভেতর প্রেম নেই, কেবল বাসনা আছে। সেই নেশাখোর গ্রীক সৈনিক, যে প্রতিদিন আমার পাঁজরে লাথি কষাতো, আমার শৈশব, যা কিনা একজন সমাজ বিরোধীরই হতে পারে, আমার প্রেমকে ভ্রূণাবস্থায় কবর দিয়েছে। বাবা ও মাকে রোজ পরস্পরের প্রতি লাথি উচিয়ে তেড়ে আসতে দেখে, প্রেম নামক কাঁচটা আমার বুকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে কবে! পরবর্তী জীবনে ক্ষণে ক্ষণে উদয় হয়েছে সেই সমস্ত মেয়েরা, যাদের এক কথায় বেশ্যা বলা চলে, যারা শুয়ে শুয়ে স্তবগানের মতন প্রেমের নামে কেবল মিথ্যা কথা বলেছে, শরীর ছুলিয়েছে এবং প্রেম-স্বপ্নকে বিষাক্ত ক'রে রেখে গেছে।

সবশেষে নত্যর মা'র হাতে উদ্ধত সেই বন্দুক, যা কিনা আমার নেশার মতন প্রেম-ভলানিকে চেটেপুটে সাফ ক'রে দিয়েছে। আমার ভেতর প্রেমিকসত্তা বলতে কিছু নেই, কৃত্রিম মাপাজোঁকা জীবনে স্রেফ ভণ্ডামি আছে।

ইস্, এই পৃথিবীতে, এই শেষযামের নিদ্রাহীন মিহিপ্রহরে আমার স্থান কোথায়? আমার ভূমিকা কি? আমি কি কোন দিন ঈশ্বরের নাম নিতে পেরেছি? আমি যখন প্রচণ্ড উল্লাসে, বিনীত নমস্কারে আর মিষ্টি কথার আপ্যায়নে ধীরে ধীরে নত্যকে একেবারে নগ্ন করে ফেললুম তখন নিজে কি বারেকের জন্যও স্মরণ করেছি পরমপুরুষকে?...নত্য, কী আশ্চর্য তরুণী। দুটি চোখ উজ্জ্বল, গাল গোলাপী, কখনো কখনো গায়ে ভেলভেটের জোব্বা। কালো নরম ফারের কলারের ওপর একটি লাল ফুল। দু-কানে হীরের দুটো ফোঁটা ঝিকিমিকি। অনাবিল লজ্জা সত্বেও দৃপ্ত সুকুমার দেহভঙ্গিমা। আমি কি তাকে হারাবো? আমি নিজে কি এই ব্যর্থতা বহন করতে পারবো। জিভে টোকা মেরে দু'বার হিসিয়ে উঠলো লোচিন!

ক্রমশঃ ভোর হলো।

হলুদ ভিনিগারের মতন খানিকটা রোদও গড়াতে গড়াতে এলো।

এতক্ষণে বোতলটাও ফর্সা এবং সুন্দর, প্রেরণাময় আত্মগ্লানিও তুঙ্গে। সারাটা রাত শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেলেও ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় লোচিন নিজেকে সুপুরুষ হিসেবেই সনাক্ত করলো। মাথার চুলগুলিকে এলোমেলো মনে হয় না, বরং কোঁকড়া কোঁকড়া ভাবটা স্পষ্ট; ভুরুর তলায় এখনো একটা গর্বের ভঙ্গি। দরজায় প্রবল শব্দ ক'রে সে গিয়ে দাপিয়ে ঢুকলো এক-চোখ ম্যানেজারের ঘরে। সে লোকটা আড়ামোড়া ভাঙবার আগেই লোচিন তার সামনে ছুঁড়ে দিলো খানকয়েক অপ্রত্যাশিত বড় অঙ্কের নোট। তারপর কোন প্রত্যুত্তর পাবার আগেই হাল্কা শরীর বাতাসে ভেসে গেল।...

হিমেল বাতাসে উড়ছে লোচিনের তপ্ত দেহ। তার বুকে এখন একশ'টা একর্ডিয়ন বাজছে। গীর্জায় যেতে হলে এই পথ ধরেই যেতে হবে। প্রলুব্ধ হবার শেষ সুযোগ। 'বিয়ে করতে চলেছে'—এমন দৃশ্য দেখবার জন্য সমস্ত মহল্লার শিশুরা নিশ্চয় হুমড়ি খেয়ে পড়বে। লোচিন সেই ফাঁকে শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবে নাকি? এখনো স্বপ্ন!···লোচিন পার হ'য়ে গেল সরু রেল লাইন। সিগনালে সবুজ আলো। বাতাসে তেমন জোর না থাকলেও তুষারপাতের বিরাম নেই। সূর্য ভেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে নাকে এসে লাগছে মিশ্র গন্ধ। কাছাকাছি এক কারকারবারীর গুদাম ঘর থেকে আসছে চামড়ার নোনা ঝাঁজ।

লোচিন হাঁটতে হাঁটতে ঘ্রাণ নিচ্ছিলো।

ক্রমশঃ সে শুনতে পেল দূরাগত বাজনার শব্দ। মুহূর্তে আর সমস্ত কোলাহল থেমে গিয়ে যেন প্রবলভাবে জীবন্ত হ'য়ে ঐ শব্দতরঙ্গই। ক্লারিওনেট ও একর্ডিয়নের সঙ্গে গম্ভীর ড্রাম। দুপ্ দাপ্ ক'রে বাজছে যেন লোচিনেরই হৃদপিণ্ডের পর্দায়। কবলতো শব্দ নয়,শব্দের সঙ্গে একটি রঙিন মিছিলও সাপের মতন বেঁকে বেঁকে আসছে। একেবারে আনকোরা দৃশ্য, যদিও এই কিছুক্ষণ আগেও লোচিন ঠিক এমনই একটি ছবি দেখবে বলে প্রত্যাশা করেছিল! পেশল হাঁসের ঠোঁটের মতন কঠিন হ'য়ে গেল তার চোয়াল, নাশা ফুলে ফুলে উঠতে থাকে, কপালে ঠিক এই সময়ই একটা নীল শিরা ফুলে উঠলো। কালো কফিন ঠেলে বেরিয়ে আসা ড্রাকুলারা বুঝি এরকমই হয়ে থাকে। সে অপেক্ষমান। ক্রমশ রঙিন মিছিলের আগুয়ান অবয়বগুলি স্পষ্ট হলো। প্রথমে নজরে এলো জো লিফটন—সহযোগীদের উৎসাহ দিতে মাথায় পালক গোঁজা নিগ্রোটা ধেই ধেই ক'রে নাচছে। নাচছে আর একটি বুড়ো সঙও, যার শাদা জোব্বার ওপর কালো রঙে আঁকা একটা ক্রুশ, ডান হাতে একটা বর্শা, দুই কানে নল খাগড়া। বাজনাদার এবং সঙদের পার হলেই দৃষ্টি স্থিরবদ্ধ পেডার সেড্রিকের ওপর এবং সেড্রিকের পাশে—

প্রকৃতই ভিরমি লাগলো লোচিনের। দাঁত কিড় মিড় করতে

থাকে, কোন একটা ব্যাপার দ্রুত শেষ ক'রে ফেলার জন্যে উদগ্রীব শিরাবহুল হাত দুটোতে খেঁচুনি লেগেছে। সে যেন কোন তুর্কী দূর্গের দেয়াল টপকে নামছে এবং নামতে গিয়ে পা বেঁধে পড়ে যেতেই সামনে দুশমনের দল। তার কানে এলো মিছিলের উচ্চ হাসির শব্দ। বুকের ভিতরটা ধক ক'রে উঠলো। শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন একটা কনকনে হিম স্রোত ওঠা নামা করতে লাগল।

ঐ তো সে। আমার নত্য। ওকে নিয়ে এরা পালাচ্ছে!

লোচিনের সর্বাঙ্গ বেয়ে আগুন ঝরতে থাকে। সে ছুটতে শুরু করে। সদর রাস্তায় না ছুটে সে পথ সংক্ষেপ করতে নেমে গেল বালি ও কাঠকয়লাময় একটা ঢালু ফাঁকা এলাকায়। খানিকটা ছুটবার পরই নুড়িভরা কবরস্থান, চারদিকে ধূসর ক্রুশের সারি। অনেকগুলি লিকলিকে কঙ্কালময় হাত যেন ধাবমান জীবন্ত লোকটাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কফিনের ভেতর ঢুকবার জন্য। লোচিন ছুটছে। শীর্ণ, ক্ষীণকায় বার্চ গাছগুলি পেরিয়ে যাচ্ছে হুস্ হুস্। গাছ-গাছালির জালি ছায়া তার মুখের ওপর। গোরস্থান পার হ'য়ে আবার পাকা রাস্তায় এবং সামনেই কার্বির কোয়ার্টার।

আজ কার্বি একা ও স্বাভাবিক।

ঃ কি ব্যাপার গুরু, সাত সকালে এমন হাঁপাতে হাঁপাতে এলে কোত্থেকে ?

ঃ ভেতরে চলো···কার্বি আমি তোমার সাহায্য চাই···বিয়ের কনেকে কিডন্যাপ করতে হবে।

ঃ কি ড ন্যা প! তাও আবার বিয়ের কনে!

কার্বির মুখে বিশাল হাঁ।

ঃ হ্যাঁ। শুয়ারের পাল আমার হৃৎপিণ্ডটাকে নিয়ে গীর্জায় যাচ্ছে। আর দেরী করলে সব বেহাত হ'য়ে যাবে।

লোচিন ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

কার্বি বললো, 'আমার কি করণীয় ?'

ঃ বিশেষ কিছু নয়। পকেটে একটা পিস্তল রেখে জীপ চালিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে ঐ মিছিলের একেবারে সামনে। আমি ভড়কি দিয়ে অপ্সরীকে নিয়ে আসা মাত্র আবার স্পীড তুলে দেবে।

ঃ তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভাগবো কোন পথে ?

ঃ ত্রিয়েশতি পেরিয়ে রীমে যাবে। সেখানে আমার এক আত্মীয়ার ডেরা আছে ঐ ডেরায় রাত কাটিয়ে গীর্জায় বিয়েটা সেরে নেবো, সরকারী অফিসে নাম লেখাবো, তারপর হনিমুন করতে চলে যাবো সিধে বেলগ্রেড।

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর আবার কি ? আইন আমার হাতে, কোনদিন যদি কেউ হামলা করতে আসে, পুলিশ দিয়ে ঠেঙিয়ে দেবো।

ঃ কিন্তু মেজর টুডি—

ঃ সে মোটাকে তুমি সামলাবে। আমার হাতে এখনো আট দিনের ছুটি। যদি না ফিরতে পারি মোটাকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলবে, সুন্দরীর সঙ্গে দীর্ঘ মিলনও খুব হ্রস্ব মনে হয়।

এই চূড়ান্ত ক্ষণেও দু'জনে একসঙ্গে অট্টহাসি হেসে ওঠে।

উৎসবমুখর উল্লসীত মিছিলটা শহরের হৃৎপিণ্ড পার হ'য়ে যাচ্ছে। পেরিয়ে গেল অ্যামেরিকান রিলিফদপ্তর ও খুদ লোচিন ভেরোভিকের কোয়ার্টার। কেউ টেরই পেল না, ভিতরে কী সাংঘাতিক একটা পরিকল্পনা ফাঁদা হচ্ছে ঐ গোটা উৎসবটাকেই তাক করে। কোয়ার্টারের সামনে জলপাই রঙের একটা জীপ গাড়ি, ছাই রঙের লিকলিকে কুকুরটা সামনের চাকা লকলকে জিভ দিয়ে চাটছে। কোয়ার্টারের দুটো জানালায় দু'জনের দু'জোড়া দৃষ্টি জ্বলছে। কার্বি উত্তেজনার গন্ধ পেয়ে উল্লসীত। আর লোচিনের দুটো চোখের অভিব্যক্তিতো রীতিমতন

ক্ষুধাত। দু'জনেরই পকেটে লোডেড পিস্তল। জানালার কপাটের ওপর নখের আঁচড় কাটছে লোচিন।

হঠাৎ দিনের আলো মরে এলো। কোত্থেকে কালো মেঘ উড়ে আসছে মাথার ওপর। তাপমাত্রাও নেমে যাচ্ছে হিমাঙ্কের নীচে! ফলত: এমন একটি জাঁকালো শোভাযাত্রা দেখবার জন্য বিশেষ কেউই ঘর ছেড়ে বের হয় নি। এমন কি, শহরের হা-ভাত ছেলে-মেয়েরাও শীতের কামড় এড়াতে সব ফার্নের ঝোপে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আছে। মিছিলের প্রায় সব মুখগুলিই অস্পষ্ট, কেবল লোচিনের চোখে চক চক করছে একটিমাত্র মুখ—অপ্সরী নত্য। লোচিন এমন ভাবে লাফিয়ে উঠলো যেন এখনই ঝাপিয়ে পড়বে ওদের ওপর। কার্বির ইশারায় সংযত থাকলো। পথে দু'চারজন রেনকোট-মোড়া পথচারীর দেখা মিললেও কোন শান্তিরক্ষক পুলিশের টিকিটিও নেই। আকাশে মেঘ, হিমেল বাতাস, পথচারীর সংখ্যা নগণ্য, পুলিশ নেই—ঘটনা ঘটবার পক্ষে অতি উত্তম সময়। দাঁতে দাঁত চেপে বিড় বিড় করতে থাকে লোচিন। পেডার সেড্রিকের চেহারা অনেকটা মেহনতী তামাটে রং নাবিকের মতন। ওর পিছনে এক প্রায় বুড়ো, ঠিক মুড়ো ঝাঁটার মতন রোগা ঢ্যাঙা, অথচ রঙিন পোশাক পরে দাপিয়ে চলেছে যেন ডুয়েল লড়বে। দলে একটা ল্যাংড়ী মেয়েও আছে, একজন মধ্য বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা দেখাচ্ছে। শালী কি রাতের খাদ্য হতে চায়? ঐ দশাসই মেয়েমানুষটা নিশ্চয় নতার মা। এমন আহ্লাদের সময়ও যেন নিদারুণ অস্বস্তিতে চোখ পিট পিট করছে। বয়সকালে কেমন ছিল, খোদায় মালুম; এখন তো দেখায় ছোটখাটো একটা বাড়ির মতন, ঝুল বারেন্দার মতন ঠেলে বেরিয়ে আছে বুক। এরই মেয়ে নত্য। আশ্চর্য বিবর্তন!

নত্য,—ঐ নরম গাল, থুতনি, শাদা শাঁখের মতন গলা—কিছুতেই ঐ ধনী ব্যাঙ্কারের নিষিদ্ধ ইচ্ছার শিকার হতে পারে না। আর ব্যাটা হাঁটছে কেমন, ছাখো। কখনো ঘাড় উঁচু কখনো আলসেমিতে বাঁকা

কোমর, কখনো যেন স্বপ্নময় ঘুমের আমেজে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা তোমায়! ইচ্ছে হচ্ছে, এখনই ঐ পোশাক খুলে উলিঝুলি হাফশার্ট ও শার্ট পরিয়ে রাস্তায় ছোটা করাই। বোকার বেহদ্দ। একটু পরেই যে ছুনিয়ার এক নম্বর গাধার মতন হতভম্ব হ'য়ে ডাক ছাড়বে, ভাবতেও পারছে না।

হিস্ হিসি্য়ে ডাকলো লোচিন, 'কার্বি।'

ছু'নম্বর জানালা থেকে কার্বি উত্তর দিলো, 'এখনো সময় হয়নি ওস্তাদ। ওরা অনন্তঃ আরো আধ মাইলটাক যাক, তারপর সেই বাঁকের মুখেই আমরা গিয়ে হামলা করবো। সময়টা ভালো। কিছুক্ষণ আগেও ছিল চনমনে রোদ। এখন যা আকাশের ভাবগতিক, বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে।'

'তা হলে তো সোনায় সোহাগা।'

—মিটারের ছুটো চোখ ঝলসে উঠলো।

বাইরের সোঁ সোঁ বাতাস এখানেও ক্রুদ্ধ বনবিড়ালীর মতন ঝাপিয়ে পড়লো।

এরা সকলেই বুঝলেন, ব্যাপারটা ঠিক হয়নি।

উৎসবের প্রাবল্যে এতখানি পথ নাচতে নাচতে যাওয়া চাট্টিখানেক কথা নয়। সবচেয়ে বড় বিপত্তি, এখানকার প্রকৃতি ও তার হিংস্র অভিব্যক্তি। এখনো গির্জা প্রায় এক মাইলটাক পথ।

কোন রকম হুঁশিয়ারী উঠবার আগেই তারা তাদের গতি বাড়িয়ে দিলো। সোঁ সোঁ বাতাস. হি-হি শীত। শারীরিক কষ্ট ধীরে ধীরে গ্রাস ক'রে নিচ্ছে মানসিক উত্তেজনাকে। অনেকেরই রাতজাগার ক্লান্তি, তদপুরি এমত পথশ্রম. নেহাৎ শুভকাজে মেজাজ বিগড়াতে নেই। বাজনা আর কতক্ষণ উষ্ণ জলের মতন সর্বাঙ্গ সিদ্ধ রাখবে? পরিবর্তে নিগ্রো বাদককেই এখনো বেস্থরো মনে হচ্ছে। কোন রকম একবার গীর্জা পর্ব শেষ হলেই হলো, এরা মদে খাবারে সোল্লাসে ফেটে পড়বে নিশ্চিত।

এমন কি, জো লিফটনেরও মনে হচ্ছে, সুরটা যেন বড় নির্বিকার হয়ে যাচ্ছে। সে আর একটা তাল ধরলো।

পাহাড়ী নদী নামে ঐ
ঝিম-ঝাম ঝিম-ঝাম…
বাতাস তাথৈ থৈ
ভুলে যাও স্তিমিত আরাম।…

বাজনার তালে তালে পা চালিয়ে তারা একটা বাঁকমুখে পৌঁছে যাবার চেষ্টা করছে, যে বাঁকটুকু পার হলেই গির্জা একেবারে নাক বরাবর।

পেডার নত্যর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'তোমার হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

নত্য জবাব দিলো না। পেডার আরো মমতা মাখানো স্বরে বললো, 'তোমার খুব শীত লাগছে?' এবারও নত্য নীরব। নত্যর ভাবানুষঙ্গের সন্ধানে ব্যর্থ পেডার নত্যর কঠিন নীরবতায় তবু থামলো না, 'আমি কিন্তু এমন হুল্লোড়ের পক্ষপাতী ছিলাম না। বিয়ে জিনিসটা হলো নীরব আনন্দের ব্যাপার, যে রোমাঞ্চের উপর ক্বচিৎ উৎসবের কিরণ বর্ষিত হয় এবং দীপ্ত হ'য়ে তরুণ-তরুণীদের চমকে দেয়, প্রাজ্ঞ বয়স্কদের টেনে নিয়ে যায় অতীতের দিকে।…এত উপাচার, এমন উল্লাসে শরীরকে কষ্ট দেওয়া—এসব আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। তোমরা চাইলে আমি আমার অফিস থেকেই গোটা পাঁচেক গাড়ির বন্দোবস্ত করতে পারতুম।'

নত্য বারেকের জন্যও মুখ তুলে পেডারের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিলো না। পেডার কি যেন ভাবতে থাকে, তার কপালের রেখাগুলি গভীরতর হয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সে এ যাবৎ অবিসংবাদিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে এবং লোকের ঈর্ষাজড়িত বাহাবাও কম পায়নি। নত্যর নীরবতায় ঈষৎ আহত হ'য়ে সে বলতে থকে, 'আমি অনেক ভেবে-চিন্তেই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। গৃহের শান্তিটাই আমার

এক্ষেত্রে একমাত্র লক্ষ্য। নচেৎ আমার বাইরের জগৎটা যেরকম প্রসারিত, একজন শিল্পপতির জামাই অন্তত হতে পারতাম। আমি চেয়েছি সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে, যা তুমি।'

আশ্চর্য, এবারও নত্যার মুখে রা নেই, ভাবান্তর নেই।

মেয়েটা বোবা হ'য়ে গেল নাকি! হাবা-গোবাও হতে পারে।

পেড্রার রীতিমন বিরক্ত।

নত্যার বাবা একটা চুরুট ধরিয়েছেন; তাঁর কাছেও ব্যাপারটা খুব রমনীয় মনে হচ্ছে না। এতটা পথ ধেই ধেই ক'রে নাচতে নাচতে গীর্জায় যাওয়া! হাড়-গোড় সব ব্যাথায় টন টন করছে। কিন্তু মনের মধ্যে যে ঠেক ছিল, নত্যার মা'র গুঁতোয় সব নড়ে গেল। তবু ভাগ্যিস পারিবারিক বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে সঙ সাজেনি; তাহলে ঘাড়ের ব্যথায় এতক্ষণে শুয়ে পড়তে হতো। নিগ্রো বাজনাদারের এলেম আছে বটে। ভগবান যে কত দম দিয়েছেন বুকে! এত ফুঁ দেবার পরও ফুসফুসটা বিদ্রোহ করেনি। তিনিও খুব জোরে ফুঁ দিয়ে দিয়ে গল গল ধোঁয়া ওড়ালেন। পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী নামকরা মাল-খোর স্মুরীকে বললেন, 'অনেকটা পথ তো হে! পথের বিস্তৃতি যেন বেড়েই চলেছে। প্রকৃতিও কেমন ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতন শত্রুতা করছেন, দ্যাখো। বৃষ্টি-ফৃষ্টি নেমে পড়লেই সব ফুর্তি বোমকে যাবে।'

স্মুরী, যে এক একসময় জাহাজের বাবুর্চি ছিল, ঠোঁট চেটে বললো, 'খুব কষ্ট হচ্ছে মাইরি। একটা গোটা বোতল না পেলে কিন্তু ভীষণ হামলা চিৎকার শুরু ক'রে দেবো।

'আশা করি, গির্জায় ঢুকেই বোতল চাইবে না।'

'আমার চোদ্দপুরুষ ধর্মস্থানে মাল টানেনি।'

হঠাৎ ওরা সবাই চমকে উঠলো আগুয়ান জীপের চাপা গর্জনে।

প্রথমেই ঘুরে তাকালো জো লিফটন—তার মনে হলো, একটা সবুজ রং সামিয়ানা বাতাসের তাড়নায় উড়ে আসছে।

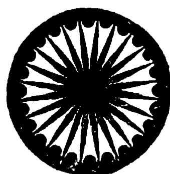
একগাল চুরুটের বাদামী ধোঁয়া ছেড়ে চোয়াড়ে মুখ ঘোরালেন নত্যর বাবা, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন, ব্যাটা কেমন স্পীড তুলে আসছে, ছাখো। আমাদের নাকাল হতে দেখেই যেন ফুর্তিতে গতি বাড়িয়ে দিলো।'

নত্যর মাও ঘুরে দেখলেন, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় খুব জঘন্য এঞ্জিন। গতির চেয়ে গর্জন বেশী।'

স্মুরী বললো, 'আমাকে তুলে নিয়ে যাও বাপ। আর হাঁটতে পারছি না।' পেডার সেড্রিক একপলক মুখ ঘুরিয়ে দেখেই ঘাড়ের ওপর দৃষ্টি রাখলেন। মোমের মতন ত্বক বটে একখানা। বুদ্ধি-টুদ্ধির ব্যাপারে সন্দেহ জাগলেও রূপ অসামান্য। একবার বিছানায় নিয়ে তুলতে পারলে জীবনের স্বাদ বদলে যাবে …।

গাড়িটা এসে থামলো হুড়মুড়িয়ে।

এবং তারপরই বিপর্যয়। ট্রয়ের রাজকুমার ঝাপিয়ে পড়লেন গ্রীসের রাণীকে তুলে নিতে। সকলে হতবাক এবং সবচেয়ে আশ্চর্য, রাণীর তরফে কোন প্রতিবাদ নেই। বরং স্বৈরিনী স্পর্ধায় উঠে বসলেন দস্যুর রথে।…



আমি এই অব্দিই পরিষ্কারভাবে জানি অর্থাৎ এই পর্যন্তই মিটার লোচিন ভেরোভিক তার প্রেম-অধ্যায়কে ক্রমান্বয়ে পরতে পরতে খুলে দেখিয়েছে। তারপরই হঠাৎ হিমেল স্তব্ধতা।

অবিশ্যি সে কবুল করেছে, সেদিন ঐ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কাবির

সহায়তায়ঃনত্যকে সে একরকম অনায়াসেই গাড়িতে তুলে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

সোজা পালিয়ে গিয়েছিল বেলগ্রেডে। যাবার পথে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার বাড়ীতে পলাতকার সঙ্গে মধুময় নৈশযাপনের অভিজ্ঞতাও তার হয়েছে।

তারপর গীর্জায় ধর্মমতে বিয়ে হলো এবং আইনমতেও তারা স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হলো।

পেডার সেড্রিক খুব একটা দাপাদাপি করেনি সম্ভবত নিজের সামাজিক ও বাণিজ্যিক সম্মানের কথা ভেবে; তাছাড়া, দুর্ঘটনাটি ঘটে যাবার সময় নত্যর চাপা উল্লাস তার নজর এড়ায়নি। নত্যর বাবা-মা'ও যূথবদ্ধভাবে হামলা চালাতে আসেননি।

তবে?

তবে কেন মিটার লোচিন এমন ছন্নছাড়া একক জীবনে নিজেকে খতম ক'রে দিচ্ছে এবং কেনই বা তার ভিতর পকেটে নত্যর একটা পুরনো, কিন্তু বিরল সুন্দর ছবি সযত্নে রক্ষিত?

এ ধাঁধার কোন সদুত্তর আমার জানা নেই।

'তারপর কি হলো? তোমার সঙ্গে নত্যর পারিবারিক জীবনের কি হলো?'

লোচিন আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, দৃষ্টিতে সেই তীব্রতা ও হাহাকার অকল্পনীয়। আরো মর্মান্তিক তার সেই বিষণ্ণ হাসি ও উক্তি, 'লেখক, আমি যে কোন ধাতুর লোক দেখতেই পাচ্ছো। এমন মানুষের সংসারে কখনো বউ টিকতে পারে?'

আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলাম, 'নত্য তবে কোথায়? সে কি তোমায় ত্যাগ করেছে। সে কি বেঁচে আছে?'

এই দুটি প্রধান প্রশ্নের কোন উত্তর মিটার লোচিন ভেরোভিক আজ পর্য্যন্ত আমাকে জানায় নি।

গী দ্য মপাসাঁ

জোয়েত

[ফরাসী]



ভাষান্তর ঃ

শেখর সেনগুপ্ত



কাফে রিচি থেকে ওরা দু'জন তখন নেমে এসেছে পথে।

আলোচনারত জঁা ছ সারভিনি ও লিয়ঁ সেভেল।

সারভিন সেভেলকে বললো, 'এখন একা থাকা মানেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়া। তার চেয়ে বরং এসো, সচেষ্ট প্রেরণায় দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাই।'

সেভেল সায় দিলো, 'সেটাই ভালো। হাঁটতে আমার ভালই লাগে।'

'এখন মাত্র এগারোটা, সারভিনি বললো, 'রাত গভীর হবার অনেক আগেই আমরা আমাদের গন্তব্যে পেঁাছে যাবো। ধীরে সুস্থে হাঁটা যাক।'

কাঠের পাটাতনে পেরেক ঠোকার শব্দ তুলে তারা অলস-মন্থর ছন্দে আভিজাত্যপূর্ণ পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করলো। দু'পাশের ঘন গাছ-গাছালি নির্বাক নিশ্চুপ হলেও চলমান জনতার উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে, চাপা গুঞ্জন, কাশির আওয়াজ, কখনো ক্বচিৎ দমকা হাসি হুল্লোড়। এই বিশাল পরিধির প্রাকৃতিক কাফেতে গ্রীষ্মের প্রতিটি রাত এক একটি জমাটি পরিবেশ। ইতি উতি দু'দশ জন দল পাকিয়ে মদ্য পানের আসর গড়ে তুলেছে, গুটিসুটি এগিয়ে আসা সুন্দরীদের সুবাসে তাদের নেশা আরো চড়ে, গোল-টেবিলগুলি বোতল ও পান-পাত্রসহ অদ্ভুত জীবন্ত।

কাফের উজ্জ্বল আলো এতদূরেও বিচ্ছুরিত। সাঁ সাঁ ধেয়ে যায় এক্কাগাড়ি,শক্ত-সমর্থ কোচয়ানের হাতে ঘূর্ণায়মান চাবুক, গাড়ির লাল—নীল— সবুজ আলো চকিতে সৃষ্টি ক'রে গেল এক রঙদার পটভূমি। খট-খট খটা-খট ডাকসাইটে ছুটন্ত অশ্বের অপসৃয়মান ছায়া—একেবারে স্নায়ুপীড়ক চলচ্চিত্র।

দুই ইয়ার হাঁটছে যেন পা গুণে গুণে।

অঙ্গ-পতঙ্গে নিশ্চিন্ত বিলাস। পরণে সান্ধ্য পোশাক, হাতে ঝুলছে ওভারকোট, বোতামে লটকানো ফুল, একদিকে হেলানো টুপি; তারা দুই ভোজনতৃপ্ত যুবক, কোন রকম অস্বস্তিকর তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাদের বিব্রত করেনি, নিজেদেরই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে-দেওয়া তামাক-পোড়া ধোঁয়ার মতন তারা অনায়াস লঘু। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই এদের দু'জনের দোস্তি পরতে পরতে ঘনত্ব লাভ করেছে, দু'জন দু'জনের কাছে খুবই অকপট—যথেষ্ট লজ্জার কথাও একজন অপরজনকে উচ্চকিতস্বরে জানিয়ে দিতে পারে। অতলান্ত অন্ধকারের গভীরে একজন ক্রমশ অসহায়ের মতন নামতে আরম্ভ করলে, দ্বিতীয়জনও নির্দ্বিধায় তাকে অনুসরণ করবে।

জাঁ দ্য সারভিনির দৈহিক গড়ন নাতিদীর্ঘ, ছিপ্ ছিপে মাথায় ঈষৎ টাকের আবির্ভাব, পাতলা ঠোঁট, চোখের দৃষ্টি জোরদার, রাতজাগা পাখিদের মতন লঘু চপপটে। আবাস প্যারিসে, দেহ ছিপ ছিপে হলেও নিয়মিত শরীর চর্চায় মজবুত; শোনা যায়, সে নাকি অফুরাণ দম নিয়ে এখনো অনেকটা পথ ছুটতে পারে, হাড়-কাঁপানো শীতে স্বচ্ছন্দে ঘোরা-ফেরা করতে পারে, অসি চালনায় এলেম আছে, প্রতিদিন তুর্কী রীতিতে স্নান সারে, দামী সুগন্ধ ব্যবহার করে থাকে এবং ইত্যাকার নিয়মগুলিকে লালন করতে তার কোন বিকার নেই। অত্যন্ত ক্ষোভের মুহূর্তেও সে নিজেকে সংযত রাখতে জানে, স্বর কখনো কর্কশ হয় না। কখনো কখনো বিমর্ষ হয়ে পড়লেও ক্লান্তি তাকে গ্রাস করে না, অবয়বে পাণ্ডুরতা এলেই শারীরিক সক্ষমতা তার হ্রাস পায় না। স্বভাবতই খুব বেপরোয়া যদিও মন সহানুভূতিপূর্ণ। বন্ধু-মহলে তার এই হাসি-খুশি মেজাজ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অর্থকৌলীন্যের সুনাম আছে। সামগ্রিকভাবে সে জনপ্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন। তার চরিত্রে নাগরিক আধুনিকতা লক্ষনীয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির সঙ্গে এসে মিশেছে সন্দেহ পরায়ণতা—কোন কিছুকে যাচাই না ক'রে সে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে নারাজ। অস্থিরতার সঙ্গে

সাহসের সংমিশ্রণ। বিবেচনাশক্তি সত্ত্বেও ঈষৎ খেয়ালী। সে সব কিছুই করতে পারে, আবার পারেও না। সংস্কারবাদী হয়েও বিশ্বপ্রেমিক। আয় বুঝেই তার ব্যয়, সঞ্চয়ের গুরুত্বকে সে কখনো অস্বীকার করে না। শরীর বাঁচিয়ে তবেই ফুর্তি। কখনো অস্থির, কখনো শান্ত হিম। সুখের খোঁজে সে প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় ; আবার জোর ক'রে নিজের ওপর কোন কিছুকে সে আরোপ করে না।

তার বন্ধু লিয় সেভেলেরও ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ঈর্ষনীয়। চেহারাখানা এমন পেশীবহুল ও অতিকায় যে মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত কোন লোক অস্বস্তি বোধ করতে পারে। কিন্তু পথে বের হলে মেয়েরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার নিটোল পেশীকে মনে মনে পরিমাপ করবে ঠিকই। মানুষ হিসেবে সে আবেগ-প্রবণ আর যে কেতায় সে তার আবেগ প্রকাশ করে থাকে, তা প্রায় প্রবাদের সামিল। প্রচুর সুন্দরীর স্বপ্নভঙ্গের গৌরব সে অর্জন করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে সাত-পাঁচ কথা বলতে বলতে তারা বঁদেভিলে পৌঁছে গেল। তখন সেভেল জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, ঐ মহিলা কি জানে যে, আজ আমিও যাচ্ছি তার কাছে তোমার সঙ্গে ?'

সারভিনি মৃদু হেসে বললো, 'মারসিঅনেস্ ওবারদিকে সেটা পূর্বাহ্ণেই জানাবার কোন দরকার নেই। যে কোন আগন্তুকই তার কাছে মাননীয় অতিথি। সে নিজেই জেনে নেবে, তুমি কে। গাড়ির একটা বিশেষ কোনে বসবার আগে তুমি কি কখনো ড্রাইভারের অনুমতি চেয়ে নাও ?'

বিস্মিত সেভেল বললো, 'মেয়েটার আসল পরিচয়টা একটু খুলে বলবে কি ?'

'খ্যাপা বাতাসে উড়ে আসা দামী রত্নের মতন হঠাৎ আবির্ভূতা এক রমণী,' বন্ধু প্রাঞ্জল হলো, 'খুব চতুর, বয়সও কম হলো না, কিন্তু শয়তানী শরীরের বাঁধন এমন রেখেছে যে, কম বয়সী কোন ছোকরার

পক্ষেও নৈর্ব্যক্তিক থাকা সম্ভব হয় না। ঈশ্বর জানেন, কবে ও এই পৃথিবীতে এসেছিল এবং কিভাবে নিজেকে এমন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে! অবিশ্যি এ সব নিয়ে আমাদের মর্মপীড়ার কোন মানে হয় না। দৈহিক সেই ব্যাপারটা বাদ দিলে সে এখনো যেন কচি কুমারী। লোক মুখে শুনেছি, তার বালিকা-বয়সের নাম ছিল ওকতেভি বারদিন, বর্তমানে যার সংক্ষিপ্তকরণ দাঁড়িয়েছে—ওবারদি! কামনা চরিতার্থ করবার মতন মহিলা বটে। তুমি যদি তাকে জপাতে পারো, সে তোমায় বিবিধ প্রক্রিয়ায় এমন যৌনতৃপ্তি দেবে যে বহুকাল সেই সুখ তুমি ভুলতে পারবে না। আবার তুমি যদি পরিশীলিত আলোচনায় তৃপ্তি পেতে চাও, তার ব্যবহার ও জ্ঞানের পরিধি তোমাকে আশ্চর্য করে দেবে। মনে হয়, তোমার জাঁদরেল স্বাস্থ্য নিয়ে তুমি সহজেই ওকে আকর্ষণ করবে; পুরুষ মানুষের বিরাট স্বাস্থ্যের প্রতি ওর একমাত্র দুর্বলতা। ব্যাপারটা হবে হারকিউলিসের সঙ্গে মোনালিসার যোগাযোগের মতন তাৎপর্যপূর্ণ! অবিশ্যি তোমাকে যে সেখানে খদ্দেরের ভূমিকা নিয়েই যেতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইচ্ছে জাগে তো, বিছানার কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো, আর যদি তা না চাও, কেতাদুরস্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় সুন্দরীর সঙ্গে সময়টা চমৎকার কাটিয়ে দাও।...

আজ ঠিক মনেও নেই, কবে কোথায় প্রথম তার সঙ্গে আমার মুলাকাৎ। হয়তো উইলো, ম্যাগনোলিয়া, ডগউড ইত্যাদি গাছের ছায়ায় এবং ফুলের কেয়ারীতে ঘেরা কোন রংদার জুয়ার আড্ডায় তার প্রতি আমি প্রথম আকৃষ্ট হই। জানোই তো, লোভী পুরুষদের কাছেই মেয়েরা সহজে নিজেদের সমর্পণ করে থাকে। আর পিছনে লেগে থাকতে পারলে যে কোন বিসদৃশ পুরুষও তার স্বপ্নের রাণীকে শেষ অবধি প্রার্থিত স্থানে নিয়ে যেতে পারবে। ওখানে যে সব ডাকসাইটে মানুষের সমাগম হয়, তাদেরকে আমার বেশ আকর্ষক মনে হয়! তারা কারুর তদ্বির তদারকের ধার ধারে না, এক একজন স্বয়ং সম্রাট।

প্রায়শই তারা বিদেশী, অভিজাত পরিবারের সদস্য, অবিশ্যি তাদের ঐ ভিড়ে জনা কয়েক বিদেশী গুপ্তচরের উপস্থিতিও আশ্চর্যের নয়। মামুলি উস্কানিতে তারা নিজেদের বংশ কৌলীন্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে শুরু করে, বুক চিতিয়ে নিজেদের পদমর্যাদা ঘোষণা করে—ওরা সব ধুরন্ধর দুঃসাহসী ইস্কাবনের টেক্কা, মিথ্যার তুবড়ি ফাটাতে ওস্তাদ।

আমার যে শুধু ওদের ভালো লাগে, তাই নয়, আমি ওদের যথেষ্ট সম্মানও দিয়ে থাকি। আলো-ছায়ায় ঘুর ঘুর তাদের সঙ্গিনী ও অর্ধাঙ্গিনীরাও এক একটি ডানাকাটা পরী, যাদের ক্ষীণ কটি, ভারী নিতম্ব ও পৃথুল স্তন কখনো বয়স বাড়তে দেয় না, যদিও চোখে অসংযত জীবন-যাপনের ছাপ, উচিত ছিল যাদের জীবনের অর্ধেকটা কোন চরিত্র সংশোধনী বিদ্যালয়ে কাটিয়ে দেওয়া।···

মারসিঅনেস ওবারদি এইসব শ্রীমতীদেরই একজন। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতি গায়ে এবং স্লাউচ টুপি মাথায় চাপিয়ে যখন সে তার বাগানে পায়চারি করে, দূর থেকে দেখলে তাকে হঠাৎ কোন প্রাগৈতিহাসিক গ্রীক-নায়িকা বলে ভ্রম হবে। বয়স পড়তির দিকে, যৌবনের ধরেছে ভাঁটার টান, তবু যা আছে যে কোন তরুণের মাথা চিবিয়ে খাবার পক্ষে যথেষ্ট। মক্ষীরাণীর মতন এক একবারে এক একটি পুরুষকে একেবারে নিঙড়ে চুষে খাবে। ওর আবাস মানেই ফুর্তির হাট। বসেছে সেখানে জুয়ার আড্ডা, চলছে নাচ গান, জমে উঠেছে সান্ধ্যভোজের বিরাট আসর।'

'মনে হচ্ছে, তুমি যেন ওর প্রেমে পড়েছো।'—সেভেল মন্তব্য করলো। সারভিনির দৃষ্টি শানিত হয়ে ওঠে, 'মোটেই নয়। তেমন সম্ভাবনাও নেই। আমি যাই তার মেয়ের আকর্ষণে।'

'ও! তা হলে তার একটি মেয়েও আছে!'

'আরে, সে-ই তো মুখ্য আকর্ষনীয়া! আহ! সে যে কী রূপ, ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না! দীর্ঘাঙ্গ ফুটন্ত কিশোরী—মাত্র আঠারোতে

পা দিয়েছে। তার মা ঈষৎ শ্যামলী হলেও সে কিন্তু দারুণ অগ্নিবর্ণা! জানি না, কোন সুদর্শন রাজপুরুষের ঔরসে তার জন্ম! ওর হাসি দেখলে যে কোন তিক্ত মানসিকতার ও তীব্র বিবমিষাপূর্ণ পুরুষও মুগ্ধ হবে ; অমন প্রাণময়ী মেয়ে তমাম ফ্রান্সে তুমি খুঁজে পাবে না ; নাচের আসরে ওর জুড়ি হতে পারাটা এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। কোন ভাগ্যবান যে তাকে প্রথম পূর্ণভাবে উপভোগ করবে, ভগবান জানেন। আমার মতন আরো অন্ততঃ দশজন প্রার্থী ঘুর ঘুর করছে তার পিছনে।

ওবারবি জানে, তার মেয়েই এখন আসল মূলধন। আর কয়েক বছরের মধ্যেই তার নিজের চোখে তো প্যাশনে ওঠে আসবে। সুতরাং, এখন থেকেই সুকৌশলে আস্তে আস্তে মেয়েকে বিখ্যাত ক'রে তুলছে। সামনে মেয়েকে রেখে ধনাঢ্য খদ্দেরদের পাকড়াচ্ছে সে। কিন্তু আসল বেলা খুব হুঁশিয়ার—কারুর দিকেই মেয়েকে পুরোপুরি ঠেলে দিচ্ছে না! মনে হয়, মস্ত দাঁও মারবার তালে আছে—হয়তো আমার চেয়েও পয়সাওয়ালা ছোকরাকে পাকড়াবার স্বপ্ন দেখছে। তবে আমিও তোমাকে বলে রাখছি, সুযোগ যদি একবার পাই ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই।

রূপসী কন্যাটির নাম জোয়েত। প্রথম দর্শনেই আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। বিচিত্র রহস্যময়ী। আজো ওকে ঠিক চিনতে পারলুম না। এখনো মনে হয় ওর মতন নিষ্পাপ, অনাঘ্রাত কুমারী আর হয় না! আবার কখনো সন্দেহ জাগে, ও বুঝি তার মায়েরই মতন ছেনাল-স্বভাব। চলো, একবার চাক্ষুষ করলেই আমার কথার সত্যতা মালুম হবে।...'

সেভেল অট্টহাসি হেসে উঠে, 'তুমি দেখছি মেয়েটার প্রেমে বিলকুল তলিয়ে গেছো।'

'না, না, তেমন দুরাবস্থা আমার হয় নি। তবে ওর অনন্য সাধারণ যৌবন আমাকে প্রলুব্ধ করে, সময় সময় কামনার তাড়ানায় অস্থির হয়ে উঠি। কিন্তু এটাও বুঝি যে, জোয়েত একটি মারাত্মক ফাঁদ মাত্র. কুল

[illegible] মতন [illegible] বেরিয়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত মানুষের কাছে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল যেমন রমনীয় আমাব কাছেও জোয়েত ঠিক তাই। মোহাবিষ্ট অন্তরে ওর দিকে গুটি গুটি এগিয়ে যাই, কিন্তু মন সর্বদা সন্দিগ্ধ—মেয়েটা আমাকে লেজে খেলাচ্ছে না তো? ওর সান্নিধ্যে এলে মন গলে যায়, আবাব সময় সময় নিজেকে প্রতাবিত বোধ ক'রে খুব বিবক্ত হই। কখনো মনে হয়, সুন্দবী বড সবল, আবাব পবক্ষণেই মন সন্দেহে দুলে ওঠে। এ এক অস্বাভাবিক চবিত্র, কিছুতেই মুঠোব মধ্যে আটকাতে পাবছি না।'

সেভেল তৃতীযবাব তাব মন্তব্য জানায, 'তুমি মজেছো দোস্ত, তোমাব আব উদ্ধাব নেই। জোযেতেব কথা বলতে গিযে একেবাবে যে ক্রুবাদুবেব চাবণ গীতি গাইতে শুরু কবলে। আত্মানুসন্ধান কবো, ঠিক মালুম হবে, মন তোমাব কাব প্রতি অসহ্য অনুবাগে জ্বলছে।

'বেশ তবে তাই। ওকে ভোলা আমাব পক্ষে সম্ভব নয। এটা যদি প্রেমেব লক্ষণ হয, আমি প্রেমে পড়েছি। অহবহ জোযেত আমাকে ঘিবে বেখেছে। সময় সময় আমাব ভেতব যে ক্লান্তি নেমে আসে, তার কাবণ ঐ কন্যা। কিন্তু একটা কথা সত্যি—আমি কখনো ওকে বিযে কববাব স্বপ্ন দেখি না।'···ব্যবহাবটা ওব গণিকাসুলভ কমনীয, কিন্তু এ যাবৎ শবীব দেবাব মতন কোন পবিস্থিতিকে সে পাত্তাই দেয়নি। দশ জনের সামনে এমন ব্যবহাব কববে যেন সে আমাব বিবাহিতা স্ত্রী। অথচ নির্জনে, যখন আমি তাকে শরীব দিয়ে পিষে ফেলতে উন্মুখ, সে এমন উপেক্ষার ভাব দেখাবে যেন আমি তার অনুজ অথবা বেতনভুক নকব।

আমি তখন জ্বলে উঠি। ধারনা কবি, মা'ব মতন জোয়েতেবই অসংখ্য নাগর ইতিমধ্যে জুটে গেছে। কিন্তু অনুসন্ধানেব প্রত্যয় জন্মে, জোয়েত এখনো অনাঘ্রাত এবং ভীষণ রহস্যময়ী। তখন আবার নতুন উৎসাহে ওকে জপাবার চেষ্টা করতে থাকি।

মেয়েটা একেবারে বইয়ের পোকা। গল্পের বই পেলেই খুশিতে

উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, দুনিয়া ভুলে যায়। আমি আপাতত ওকে শুধু বই যুগিয়ে যাচ্ছি, আমাকে ও ডাকে 'লাইব্রেরীয়ান' বলে। প্যারীর প্রকাশকরা যত নতুন বই ছাড়েন বাজারে, তার প্রতিটিকে আমার সংগ্রহ করতে হয় নিছক ওকে খুশি করবার জন্য। মনে হয়, যত রাজ্যের ভালো-মন্দ বই পড়েই ওর মনটা এমন অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। হাজার পনেরো উপন্যাস-পাঠের মধ্য দিয়ে যার জীবন দর্শন গড়ে ওঠে, তার মানসিকতা কি কখনো সুস্থ হতে পারে ?

তবু ধৈর্য ধরে আছি। বলতে পাবো, চার ছিটিয়ে টোপ-গাথা বড়শি ফেলে বসে আছি—কখন এসে সে ঘুব ঘুর করতে কবতে এক সময় টোপটি গিলবে! বিয়ে করবো না নির্ঘাৎ। তবে প্রচণ্ড প্রেম-পীড়নে ওকে প্রথম উদ্ভাসিত করবো। তাবপর অসংখ্য ও ক্রমশ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত ওর গুণমুগ্ধদের ভিড়ে হারিয়ে যাবো। যেদিন বুঝবো, এ মেয়ের কাছে থাকা উচিত নয়, সবার আগে আমিই কাট মারবো। বিবাহিত জীবন জোয়েতের নসীবে নেই। ওবারদি ওরফে ওকতেভি বারদিনেব মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে কোন আহাম্মক ? কেউ করবে না। প্রথমতঃ, ওর কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। গণিকা যতই বনেদী হোক, মেয়ের জন্য সুপাত্র খুঁজে পাবে না। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত ছাপোষা কোন লোকও পয়সা ও রূপের লোভে ঐ মেয়েকে তার গৃহিনী করবে না, যেহেতু মধ্যবিত্তের সামাজিক সন্মান বোধ উপরতলার লোকদের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র. অন্ততঃ বেশ্যাবাড়ির জামাই হবার চেয়ে তাদের কাছে মৃত্যু শ্রেয়। তৃতীয়তঃ, জোয়েতের মা খুঁজবে ধনী পাত্র, যা তার মেয়ের কপালে কোন দিনই জুটবে না।

আর একেবারে গরীব লোকদের কথা বলছো ? তারা ভয়ে ও পথ মাড়াবেই না। তাই জোয়েতের পক্ষে সম্ভব একমাত্র সন্ন্যাসিনী হওয়া। কিন্তু মঠবাসিনী হবার মতন মানসিকতা তার নয়। অতএব পথ তাকে একটাই বেছে নিতে হবে এবং তা হলো শরীর বেঁকে-চুরে পুরুষদের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা। আজ না হলেও একদিন তাকে সেখানে অনিবার্য

তারে নেমে আসতে হবেই। এটাই তার নিয়তি। রূপসী কিশোরী একদিন যৌবন পাবে এবং তার শরীরে সেই যৌবনের ঢল নামবো আমি।

ধান্ধাবাজ কেবল আমি একা নই. পকেটভর্তি টাকা নিয়ে আরো কয়েকজন সেই বাসনায় ঘুর ঘুর করছে। একজনের নাম মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো, জাতে ফরাসী ; একজন রাশিয়ান, যে নিজেকে প্রিন্স ক্রাভালো বলে জাহির করে ; অপব এক প্রণয়প্রার্থী কাভেলিয়ার ভলরেলি, ইতালিয়ান। প্রত্যেকেই প্রেমে পাগল, ছুটছে—ছুটছে রেসের ঘোড়ার মতন, কে যে বাজি মাৎ করবে, দৈব জানে! এছাড়া ময়দানে আরো জনা কয়েক অপটু খেলোয়াড়ও রয়েছে।

মারসিঅনেস্ কিন্তু খুব সতর্ক—সর্বদা চোখে চোখে রাখে মেয়েকে। তবু ওরই মধ্যে মনে হয়, আমাকে যেন সে একটু বেশি প্রশ্রয় দেয়। কেন না, সে জানে, আমি প্রকৃতই মালদার পার্টি। অন্যদের পকেট সম্পর্কে তার ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। তাদের আবাসটি এক কথায় অপূর্ব। বিনা আমন্ত্রণে যাচ্ছি বলে এতটুকু অসুবিধে হবে না। যত রাজ্যের অস্পরীরা নিজেদের রূপের ডালি মেলে আছে চড়া দাম পাবার আশায়। পরিবেশ কিন্তু দারুণ সম্ভ্রান্ত এবং অনভিজ্ঞ লোকেরা ঐ স্থানের মাহাত্ম্য ধরতেই পারবে না।…'

বলতে বলতে ওরা এসে গেল সাঁজেলিজির মোড়ে। এই সেই জায়গা, যেখানে মানুষ প্রায়শই এক অশ্রুত সঙ্গীতের সন্ধান পায়। কেউ কেউ আকাশকুসুম স্বপ্নের জাল বুনে চলে। মানুষ তার মুক্তি-মূল্য দিতে আসে এখানেই!

এখন মৃদু বাতাস আলতো পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আবছা আবছা অন্ধকারে কারা যেন সব আলাপরত।

সারাভিনি বললো, 'শোন, তোমাকে কিন্তু ওখানে আমি কাউন্ট সেভেল বলে পরিচয় করিয়ে দেবো। নতুবা, একজন সাদামাটা

সেভেলকে কেউ পাত্তা দেবে না। যে মানুষের বর্ণবিন্যাস নেই, সে ওখানে অপাংক্তেয়।'

সেভেল সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানায়, 'না কখনো নয়। আমি ওসব ফালতু উপাধি বয়ে বেড়াতে পারবো না, একটি দিনের জন্যও নয়। দোহাই, কিছু বলো না।'

সারভিনি হাসে, 'ভয়ের কি আছে? আর ওখানে বিবেককে প্রশ্রয় দেওয়াও হাস্যকর। আমারও ঐ জায়গায় একটা মিথ্যা পরিচয় আছে —ডিউক দ্য সারভিনি। এই মিথ্যা পরিচয়ের জন্য আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও অপদস্থ হ'তে হয়নি। বরং এরকম একটা ধাপ্পা না দিলে আসরে কল্কেই পেতাম না।' তবু সেভেলের খুঁতখুঁতানি দূর হয় না, 'বাপু, তুমি বড়লোকের ছেলে, তোমার ও সব ভড়ং মানায়। আমার কাছে নিজের সাধারণ পরিচয়টাই সর্বোত্তম।'

সারভিনি তখনো যুক্তি দেখাচ্ছে, 'বুঝতে পারছো না কেন, ঐ জায়গাতে ভড়ংটাই আদৃত, ছাপোষা মানুষের জায়গা সেটা নয়।··· ব্যাপারটা আমার উপরই ছেড়ে দাও। তোমাকে আমি বানিয়ে দেবো উত্তর মিসিসিপির জাঁদরেল কাউন্ট। কেউ সন্দেহ করবে না। সম্মানও বেড়ে যাবে শতগুণ।'

'না, ভাই, আমাকে এমন যাত্রাদলের রাজা হওয়ার হাত থেকে রেহাই দাও।'

'ধ্যাৎ, তোমাকে আর বোঝানো গেল না। জানো তো, এমন অনেক দোকান আছে, যেখানে মেয়েরা ঢুকলেই একগুচ্ছ ভায়োলেট উপহার পায়। এখানেও সেটাই রেওয়াজ, তবে একটু অন্যভাবে। আমি ঘোষণা না করলেও ওখানকারই কেউ তোমায় কাউন্ট উপাধি দিয়ে বসবে।'

ইত্যাকার আলোচনায়রত তারা দু'জনে একসময় সেই প্রগাঢ় সবুজ সুন্দর অতিকায় অট্টালিকার সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে

জনাকয়েক উর্দিপরা পরিচারক ছুটে এসে তাদের অভিবাদন জানায়, হাতের ছড়ি ও কোটগুলি তুলে রাখে। এই জাতের নগরমনস্ক আদব কায়দায় সেভেল মুগ্ধ না হয়ে পারেনা। না, সত্যি এখানে দার্শনিক চেতনায় আক্রান্ত হ'য়ে নিষ্ঠাবান থাকবার কোন মানেই হয় না। ঐ তো অদূরে, সবুজ লনে রাশি রাশি ফুল এবং তীব্র মাদকতাপূর্ণ প্রচুর সুন্দরীরা। বাতাসে সুগন্ধ মঁ মঁ। বিষণ্ণতা বিপন্নতার কোন স্থান নেই। মনে হয়, এখানকার একটি মানুষও বিচ্ছিন্ন, বিপন্ন, দিশেহারা বা আত্মকেন্দ্রিক নয়। কোন রকম অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাদের মনকে ক্ষিপ্ত করে রাখেনি, আত্মার গভীরে লালিত কোন অসুখ তাদের গম্ভীর তথা অসামাজিক ক'রে রাখেনি।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ লন থেকে উঠে এসে তারা বিভিন্ন ঘরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

বাহারে দাড়ি সমেত সৌম্যদর্শন বিপুলদেহী একটি লোক এগিয়ে আসে, ঈষৎ ঝুঁকে সেভেলের পরিচয় জানতে চায়, "আপনার নাম?"

সামান্য হকচকিয়ে জবাব দিলো সেভেল, "মঁসিয়ে সেভেল···।' মুহূর্তে উচ্চকিত স্বর ধ্বনিত হলোঃ আমাদের নতুন বন্ধু মঁসিয়ে ব্যারণ সেভেল এসেছেন আমাদের পুরনো বন্ধু মঁসিয়ে ডিউক সারভিনির সঙ্গে।

লিপস্টিক কুমকুমে রাঙা গুটি কয়েক ফুলটুসি চিকন মোলায়েম স্বরে আনন্দ প্রকাশ করলো নতুন বন্ধুর আবির্ভাবে।

বেশিরভাগ সুন্দরীদের সমাবেশ এক নম্বর ঘরে। প্রত্যেকেই যতটা সম্ভব বুকের বাঁধন খুলে নিজের যৌবনকে হাট ক'রে দেখাতে চায়। স্বচ্ছ বসন ভেদ ক'রে শরীরের তরঙ্গায়িত খাঁজগুলি অতিমাত্রায় স্পষ্ট।

সামান্য অপেক্ষার পর দেখা গেল তাকে।

গৃহকর্ত্রী খবর পেয়ে মুখে ভেলানো হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে এলো এদের দু'জনের দিকে। তার ঐ হাসিকে যে কেউ নির্মল হৃদয়বৃত্তির

পরিচয় বলে ধলে ধরে নিতে পারে। চমকে দেবার মতন রূপ বটে একখানা। ফ্রান্সের ইতিহাসে যে সমস্ত অনন্ত যৌবনাদের ইতিবৃত্ত আমরা পাই, এ যেন তাদেরই শেষ সংস্করণ। রাশি রাশি মেঘবরণ কুন্তল, যেখানে মুখ গুঁজে যে কোন সংসারত্যাগী পুরুষ সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যাবে। তার স্তন বিশাল হলেও সুছাঁদ—তপ্ত মানুষের দীর্ঘ কালাতিপাতের আধার। চর্বিহীন কোমরের পরই নিতম্ব যেন প্রতিমুহূর্তে হিল্লোলিত,—এমন নিতম্ব যার, কেয়ামতের দিন অব্দি সে কখনো মিলনে ক্লান্তি অনুভব করবে না। শিল্পীর তুলিতে আঁকা যেন দুটি চোখ—সেখানে কারুর প্রতি উপহাস নেই, সকলকেই খুশি করবার প্রযত্ন প্রয়াস। বাঁশির মতন নাক—ক্রিয়াচার লগ্নে এর স্ফীতি হয়তো আরো সুন্দর। কণ্ঠস্বরে মনোবৃত্তিরই লীলা খেলা, বুঝি মধু নামছে চুইয়ে চুইয়ে। এমন রূপ যার, বয়সও তাকে সহজে গ্রাস করতে পারে না। আপন যৌবন সৌষ্ঠবকে সে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে. নিজের পরিস্ফীত দৃঢ়তায় আরো অনেকগুলি বৎসর হয়তো সে এমন মোহাবিষ্ট ক'রে রাখবে বিভিন্ন তরুণ আগন্তুকদের।

সারভিনি তার হস্তচুম্বন করলো। সোনার শিকল দিয়ে সাজানো সৌখিন পাখা সমেত সুন্দরী তার একখানা নিটোল হাত বাড়িয়ে দেয় সেভেলের দিকে, বললো, 'ব্যারণ, স্বাগত। আমার প্রীতি পূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ করুণ। ডিউকের বন্ধুদের জন্য এ ঘরের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে।'

বিশালদেহী স্বাস্থ্যবান যুবক সেভেলের দিকে সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার রাঙা ঠোঁটের উপর খুব সুক্ষ একটি কালো দাগ—সরু গোঁফের ছায়া। সম্ভবত কোন আমেরিকান অথবা ভারতীয় প্রসাধন ব্যবহারের ফলে সমবেত খেতাবধারীদের নাকের সামনে একটি বিজাতীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে।

অভিজাত চেহারার লোকেরা ক্রমশই এসে জটলা পাকাচ্ছে

ইতিউতি। ওবারদি গলার স্বরে মাতৃসুলভ গাম্ভীর্য এনে সারভিনিকে বললে, 'পাশের ঘরে আমার মেয়ে অপেক্ষা করছে। তুমি তার সঙ্গে দেখা করো।'

বলেই সে অন্যান্য অভ্যাগতদের দিকে এগিয়ে যায় এবং যাবার আগে মর্মান্তিক কটাক্ষ ও চোরা হাসি উপহার দিয়ে যায় সেভেলকে। সারভিনি তার বন্ধুর হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়, "তুমি এখানে নবাগত। দেখতেই পাচ্ছো, চারিদিকে মালে মালময়—কোনটা বাসি, কোনটা একেবারে তাজা টাটকা। তবে হ্যাঁ সব মেয়েরই এক দর। উনিশ-বিশ নেই। বাঁ দিকে বসেছে জুয়ার আড্ডা। পয়সার হরির লুট!

আর ঐ কোনের ঘরটি নাচের আসর। ওখানে কোন সামাজিক বন্ধন-টন্ধনের মূল্য দেওয়া হয় না। এমনকি, বিবাহিতদেরও বিবাহিত বলে গন্য করা হয় না। ওখানেই লালিত হচ্ছে আমার আশা। বাৎসল্য রসের আধিখ্যেতাও দেখতে পাবে। দেখবে, মেয়ের জন্য মার কত দরদ। সব ন্যাকামি। চলো, দেখবে।"

তারা তরতরিয়ে এগিয়ে চলে, সুন্দরীদের অভিবাদন জানায়···প্রায় পনোরো জোড়া নারীপুরুষ জোড় বেঁধে নেচে চলেছে···অনাবৃত দেহ প্রদর্শনে মাতা ও কন্যাদের প্রতিযোগিতা চলেছে।

হঠাৎ এক দীর্ঘাঙ্গী রূপসী চারদিক আলো ক'রে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, গলার স্বর তুলে বলে, "এই যে মাস্কেদ! কেমন আছো, প্রিয়?"

সেভেল অনুভব করে, সে তার জীবনে এমন সদ্যফুটন্ত ফুল এর আগে কখনো দেখেনি। সর্বাঙ্গে তার অপূর্ব দ্যুতি, গাত্রবর্ণ স্বর্ণসমান, ঈষৎ রোমশ ত্বক পুরুষের কাম-বহ্নিকে দ্বিগুণ করে তোলে। সহজ স্বচ্ছন্দ তার চলার গতি, গলার স্বর মায়েরই মতন মাদোকতাপূর্ণ। প্রথম দর্শণেই যেন এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা স্মৃতির দর্পণে ছাপ রেখে যায়। "মাস্কেদ, মাস্কেদ—" আবেগে সে বলে, "কি খবর তোমার?"

অপ্রতিরোধ্য আবেগে সারভিনি তার করমর্দন করে, "মামজেল জোয়েত, এসো পরিচয় করিয়ে দি—এ আমার বন্ধু, ব্যারণ সেভেল।"

অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে নবাগতকে সে অভ্যর্থনা জানায়, বলে, "খবর শুভ তো? আচ্ছা, আপনি কি বরাবরই এমন লম্বা?"

বেমক্কা এই অভদ্র উক্তিতে বিরক্ত হয় সারভিনি, ঝাঁজালো গলায় বলে, "না' না. তোমার মাকে খুশি করবার জন্য ও আজ এতটা লম্বা হ'য়ে এখানে ঢুকেছে।"

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর কিশোরীর মিষ্টি গলায় কিন্তু উচ্ছ্বাস বাধনহীন, "খুব ভালো কথা! তবে আমার কাছে যখন আসবেন, তখন একটু ছোটখাটো চেহারা নিয়েই আসবেন। আমি আবার মাঝারি চেহারার লোকদেরই পছন্দ করি কিনা। যেমন ধরুন, এই মাস্কেদ—মাথায় প্রায় আমারই সমান।" তারপর সারভিনির দিকে চেয়ে এক চিলতে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "চলো, আমরা দু'জনে জুড়ি বেঁধে নাচি।"

সারভিনি, যে সম্ভবত এই প্রস্তাবের আশায় ওৎ পেতেই ছিল, আর কোন বাক্যব্যয়ের ঝামেলায় না গিয়ে ওর সরু কোমর জাপটে ধরে। তারপর যেন ঘূর্ণি ঝড়ের মতন কয়েকটা পাক খেয়ে ঢুকে গেল নাচের আসরে।

এ যেন নিছক সামাজিক নাচের আসর নয়। নৃত্যের নাম ক'রে হয়েছে বন্য রণভূমি। বহু নর-নারী উদ্দাম মানসিকতায় সামিল হয়েছে এর। রক্তের ডাক যখন তুঙ্গে ওঠে তখন বুঝি এরা অপরকে খাবলে-খুবলে শেষ ক'রে দিতে চায়। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, প্রতিটি ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে ঐ নাচ জন্ম দেয় কামনাকে—রক্তে আগুন ধরায়, দুটি দেহ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর···দারুণ শক্তিতে সারভিনি জোয়েতকে জাপটে ধরে আছে নিজের শরীরের সঙ্গে···আহ্।' কী নরম বুকের অস্পষ্ট স্পর্শ, যদি নিতম্বের কাছাকাছি হাতটা নিয়ে যাওয়া যেতো! কিন্তু জোয়েত হুঁশিয়ার আছে এবং ঠিক সেই কারণেই তার পদযুগল কখনো ছন্দচ্যুত

হচ্ছে না। এ নাচ যেন চলবে অনন্ত কাল ধরে, ওদের ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। অন্য সকলে নাচ থামিয়ে এক সময় নিথর, সবিস্ময়ে দেখছে সারভিনি—জোয়েত যুগলনৃত্য। এক সময় ওরাও থেমে যায়। গোটা হলঘর ফেটে পড়ে সমবেত করতালিতে। তখন দেখা গেল, জোয়েত যেন লজ্জায় ফাগরক্তিম, তার নীল চোখ দুটিতে সংকোচ।

আর সারভিনির রীতিমতন হাঁপ ধরে গেছে, একটা কপাট চেপে ধরে দম নিচ্ছে।

প্রথম মুখে খুললো জোয়েত, "তোমার শক্তি সীমিত মাস্কেদ।" সারভিনি হাসে, তার দৃষ্টিতে এখন মাতালসুলভ লোভ ও কামনা।

জোয়েত যেন তাকে আরো উস্কে দেয়, 'পারো, এখন আবার ধূর্ত বিড়ালের মতন আমার ওপর লাফিয়ে পড়তে?···না, থাক, চলো দেখি, কোথায় রয়েছেন তোমার বন্ধু।"

সারভিনি জোয়েতের হাত ধরে টলতে টলতে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

•

পরিবেশটা নতুন ও অভিনব ঠেকলেও সেভেল তার অস্বস্তি কাটিয়ে তুলেছে এবং ক্রমশ ক্রমশ তার কাছেও সময়টা মধুময় ও রঙিন হ'য়ে ওঠে। তার সঙ্গিনী আর কেউ নয়, স্বয়ং মারসিঅনেস ওবারদি। সেভেলের বিশাল বুক বাতাসে আরো স্ফীত হয়। তার কখনো কখনো মনে হয়, সারভিনির ব্যাখ্যা বুঝি ভুল—মারসিঅনেসের মতন সুশিক্ষিতা সুন্দরীর সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্প করাটাও সৌভাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু কিছুক্ষণ ঘনিষ্ঠ আলাপনেই পারস্পরিক মুগ্ধতা ভিন্নতর গতিতে ছুটে যেতে চায়। মারসিঅনেস যখন পাশে বসে কথা বলছে, সেভেলের দৃষ্টি বার বার ছুঁয়ে যাচ্ছে মহিলার অর্ধউন্মুক্ত বুককে—কোন কুমারীর বুকও এর চেয়ে রহস্যময়? আবার সেভেল যখন কথা বলছে, মারসিঅনেস হরিণ-চোখে পরিমাপ করছে, যুবকের চাপা ও দৃঢ় ঠোঁট পাতলা লম্বা

গোঁফ, বিশাল বুকে লোমশ তপ্ততা, এবং দুই শক্তিশালী জানুর মধ্যবর্তী, প্রচণ্ড সক্ষমতা। সত্যি কথা বলতে কি, বেশ কিছুদিন পর মারসিঅনেস আর একবার প্রকৃত উত্তেজনা অনুভব করছে।

যদিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা, সেভেল মুগ্ধ হয়ে শুনছে ওবারদির প্রতিটি কথা। কোন নারীর কণ্ঠস্বর যে অহরহ এমন তাৎপর্যময় বোধ হতে পারে, তার ধারণা ছিল না। ওবারদি যদি কেবল রূপবতী হতো, সেভেলের আকর্ষণ নিশ্চয় এমন তীব্র হতো না। সামনাসামনি পাশাপাশি নয়ত কোনাকুনি—যেদিক থেকেই তুমি তাকে দেখো না কেন, এই স্বর সুগন্ধ ও রূপ তোমাকে মুগ্ধ ক'রে রা· এই সময় বাগানের মাঝামাঝি এলাকায় সারভিনিকে দেখা গেল। সারভিনিকে দেখে ওবারদি উচ্ছল হ'য়ে উঠলো, "এই যে ডিউক শোন। ক'দিন যাবৎই আমার মাথায় একটা সুন্দর পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে। পরিচিত পরিবেশ ভালো, কিন্তু দীর্ঘকাল তার সঙ্গে লেপ্টে থাকলে সকলের মুখেই একসময় জিঘাংসু হাসি ফুটে ওঠে। তাই তো মাঝে মধ্যে আমি ডুব দি। এবারও আমি মাস কয়েকের জন্য বোগিভাঁতে একটা বাড়ি ভাড়া নিচ্ছি। তুমি তোমার এই চমৎকার বন্ধুটিকে নিয়ে মাঝে মধ্যে সেখানে যাবে। আগামী সোমবার আমরা রওনা দিচ্ছি, তোমাদের নিমন্ত্রণ রইলো শনিবার। কেমন? দারুণ আনন্দে ছুটির দিনটা মাৎ করে দেবো আমরা। আসছো তো?"

সারভিনি তার পার্শ্ববর্তীনী জোয়েতের রক্তাভ মুখের দিকে তাকালো। জোয়েত সহজ ভঙ্গিমায় তার মার প্রস্তাবকে সমর্থন জানালো, "মার প্রতিটি পরিকল্পনা অপূর্ব। জন্মাবধি আমাদের এখানে কোন চন্দ্র স্বভাব লোক আমি দেখিনি। সুতরাং, মতামতের তোয়াক্কা না রেখেই ধরে নিতে পারি, তোমরা নিশ্চয় যাচ্ছো। গাঁয়ে যাবো, হল্লা করবো, কানছাপানো জুল্‌ফি ফুর্তিবাজেরা গান গাইবে—গোটা দিনটা একটা সুখের স্বপ্ন ও স্মৃতি হয়ে থাকবে।" মেয়ে যখন সেই দিনটার ছবি আঁকছে, মারসিঅনেস একটা হাত ঘাড়ের পিছনে এনে

শরীরটা আর একটু বেপরোয়া ক'রে তুলে সেভেলকে বললো, "আপনার কিন্তু আসা চাই।"

সেভেল সম্মতি জানায়, "আমি খুশিই হবো।"

বাতাসের সান্নিধ্য ও পরশ সেভেলের বুকময় চাপ চাপ রোমরাজিতে ঈষৎ শিহরণ তুললো। সে অস্পষ্ট অনুভব করছে, ওবারদির উষ্ণ নিঃশ্বাস। না, কোন ধুন্ধুমার নাটকের তুরন্ত মহড়া নয়, এক গোপন যুদ্ধের অশ্রুত দামামা তার বুকের ভেতর বাজছে। শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান পুরুষের ভিতর এমনি ভাবেই গোপন কামনা শিকড় নামায়। সে যদি কখনো প্রকৃত নীল নির্জনে এই বয়স্কা অনন্তযৌবনের পাশে বসে থাকে, নিজেকে সংযত রাখতে পারবে কিনা, সন্দেহ।

অনিঃশেষ উৎসাহে এখনো জোয়েত কলকলিয়ে বলে চলেছে, "··· গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধির মতন আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখবে। আর আমাকে নিয়ে আমার গুণমুগ্ধদের মধ্যে আরো বেড়ে যাবে প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা···" সারভিনি কোমরে হাত রেখে বললো, "সে আর বলতে! সকলের ঈর্ষার শেষ কারণ কিন্তু এই শর্মা—তোমার মাস্কেদ।"

সেভেল জোয়েতকে প্রশ্ন করে, "আপনি আমার বন্ধুকে সব সময় মাস্কেদ বলে ডাকেন কেন?"

কোমরের কার্নিশে হাত রেখে সরলতার ভান করে জোয়েত, "যারা ম্যাজিক দেখায়, তারা ছোট ছোট মটরদানাকে বলে মাস্কেদ। ও ঠিক সেই মাস্কেদ। মনে হয়, এই তো হাতের মুঠোয় রয়েছে। অথচ, কোন ফাঁকে হাত থেকে টুপ ক'রে গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।"

সেভেলের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে জাজিমের মতন নরম ঘাসের ওপর পা ঘষতে ঘষতে ঈষৎ অন্যমনস্ক মারসিঅনেস বললো, "পুরুষরা কি সত্যি তাই নয়?"

সেভেলের মনে হলো, মারসিঅনেসের টানা টানা দুই চোখ যথার্থ আর্দ্র।

জোয়েতের স্বরে আবার আব্দার অনুযোগ, "এবার কিন্তু চট্ ক'রে পালিয়ে যেতে পারবে না, মাস্কেদ।"

সারভিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "না, না, অমন ভুল আর কখনো হ'বে না। তোমার সঙ্গে দিনও কাটাবো, রাতও কাটাবো।"

সঙ্গে সঙ্গে যেন জোয়েতের অন্তরিন্দ্রিয়ে হুঁশিয়ারী বেজে ওঠে, কথায় অবিশ্যি কৌতুক মেশানো ত্রাস, "না মশাই, সেটি হচ্ছে না। দিনের বেলা যেমন-তেমন; রাতে আমার ধারে কাছে কারুর ঘেঁষবার অধিকার নেই।"

"কারণ?"

অকুতোভয় জবাব, "কারণ, কোন পুরুষের নগ্ন শরীর একখানা দর্শনীয় বস্তু হিসেবে গন্য হতে পারে না।"

মারসিঅনেস্ ক্ষোভের সঙ্গে অস্থিরতায় ডান তুলে ধমক দিলো, "আঃ! এ আবার কি ধরণের কথা! সংযত হ'য়ে কথা বলতে শেখো, জোয়েত!" সারভিনি ও সায় দিলো, "ঠিক বলেছেন। ওর জিহ্বা বড্ড ধারালো।" জোয়েত যেন সামান্য আহত হলো, ছায়ায় ঘন কালো তার দুই চোখের পাতা তির তির কাঁপতে থাকে, কিছুক্ষণ থম মেরে থেকেই ঝাঁজালো স্বরে বললো, "আমাকে কেউ আপমান করবার চেষ্টা করোনা।" তারপরই দূরে দূরে মাকড়শার জালের মতন চক্রাকার সমাবেশের দিকে চেয়ে চিৎকার ক'রে তার আর এক বান্ধবকে আহ্বান জানালো, "কাভেলিয়ার—একবার এদিক এসো তো—আমাকে এরা অপমান করছে।"

ডাক শুনে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ছিপ ছিপে একটি যুবক এগিয়ে আসে, কৌতুকের হাসি হাসবার চেষ্টা করা সত্বেও তাকে কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়, "অপরাধী কে?"

সারভিনির দিকে আঙ্গুল তুলে বললো জোয়েত, "এই সেই লোক। অবশ্য আমি ওকে একটু বেশীই ভালোবাসি, কারণ লোক হিসেবে সারভিনি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী রংদার।"

কাভেলিয়ার তার অভ্যেসমতন কান চুলকে বললো, "আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি তোমাকে তুষ্ট করতে। হয়তো দক্ষতায় ঘাটতি আছে, কিন্তু আন্তরিকতা সন্দেহাতীত।"

মোটা ধোঁয়াটে গোঁফ সুস্বাস্থ্যের অধিকার অন্য কে একজন এই সময় গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে, "অনুগতের অভিবাদন নাও মামজেল জোয়েত।"

উৎসাহের প্রাবল্যে চেঁচিয়ে ওঠে জোয়েত, "আরে, মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো যে!"

সেভেলের সঙ্গে এর পরিচয় করিয়ে দেয়, "এ আমার অন্যতম অনুরাগী বন্ধু ; যেমন চেহারার বহর, তেমনি বুদ্ধি।···রীতিমতন একজন ফিল্ডমার্শাল, দড়াম ক'রে রেঁস্তরার দরজা খুলে ফেলতে ওস্তাদ।

কিন্তু মাথায় আপনি ওর চাইতেও উঁচুতে ; কেবল ও কেন, দৈর্ঘ্যে আপনি সকলকেই পরাজিত করবেন। সুতরাং, আপনাকে আমি কি নামে ডাকবো ? হুঁ, মনে পড়েছে—আপনার নাম দেওয়া হলো জুনিয়র রোদস্। দেবতা রোদস্ নিশ্চয় আপনার জনক ছিলেন।··· যাক, চলুক আপনাদের সব গুরুগম্ভীর আলোচনা। আমি চললুম। গুডনাইট।"

জোয়েত ছুটে গেল বাজনার দিকে।

ওবারদি ফিসফিসিয়ে বললো, "তোমরা ওকে সব সময় বড় জ্বালাও।

মেয়েটার মেজাজও তাই হয়ে উঠেছে খিটখিটে, কতগুলি বদঅভ্যাসও গড়ে উঠেছে।"

সারভিনি মন্তব্য করে, "তার মানে ও এখানে যথাযথ শিক্ষা পায় নি।"

জবাবে মাদাম উদাসী হাসি হাসলো।

বুকে অনেকগুলি সম্মানের চাকতি ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখ একজন লোক এই সময় এই দিকেই এগিয়ে এলো।

তাকে দেখেই মাদাম স্বাগত জানায়, "হ্যালো প্রিন্স, আজ আমার ভাগ্য সত্যি প্রসন্ন।"

খানিকটা দূরে সরে এসে লোকটিকে দেখিয়ে সারভিনি সেভেলকে বললো, "প্রকৃতপক্ষে এই লোকটাই আমার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। নাম ক্রাভালো।···আর যাই হোক, জোয়েত দেখতে বড় খাসা।"

সেভেলের জবাব, "রূপের কথা যদি বলো, মা এখনো মেয়ের চেয়ে কম নয়। মা'টির নেক নজর লাভে আমি ইতিমধ্যেই সফল হয়েছি।"

সারভিনি বললো, "বোকা। মাদাম আগেই তোমার সম্পর্কে সব জেনে নিয়ে তবেই গুটি গুটি এগিয়ে যাচ্ছে।"

এরপর দুই ইয়ার গেল জুয়ার আসরে। পিঠ সোজা ক'রে, পিঠ বেঁকে চুরে, ঘাড় নুইয়ে চটকদার খদ্দেররা জুয়ার দান ছুঁড়ছে। বিজয়ে মুখগুলি উদ্ভাসিত। পরাজয়ে কী কুৎসিত মুখ! ঝনাৎ ঝনাৎ পয়সা ছুঁড়ে দেবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে···হরেক দেশের হরেক জুয়াড়ীদের মধ্যমনি এক অতিকায় লোমশ পুরুষ, প্রতিবার বাজি ধরবার সময় যার থলথলে চোয়ালের ওপর একটা নীল শিরা তির তির ক'রে নড়ছে।

সারভিনি সেভেলকে জিজ্ঞেস করলো, "দোস্ত, খেলবে নাকি এক দান?"

"এমন ভিড়ে কোনদিন খেলিনি! সুবিধে করতে পারবো না। পরিবেশটা রপ্ত হোক, পরে একদিন এবং কপাল ঠোকা যাবে।"

"তাই ভালো। চলো, এবার ফেরা যাক।"

দু'জনে সেই জমকালো আবাস ছেড়ে নেমে এলো। উচ্ছ্বসিত হুল্লোড় ধ্বনি অনেকদূর অব্দি তাড়া ক'রে আসছে। সেভেল ঈষৎ আচ্ছন্ন—অনন্ত যৌবনার দীপ্ত অক্ষি এখনো তার দৃষ্টির সামনে ভাসছে।

সেভেল জিজ্ঞাসা করলো, "এই চিত্তাকর্ষক প্রাসাদটির মালিকানা কার ?"

পাতলা কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে সারভিনি বললো, "ঠিক বলতে পারবো না। সম্ভবত,আমি তোমার কৈশোরে অনেকবার এই বাড়িটার পাশ দিয়ে ছুটে ছুটে গেছি, একবারও মুখ তুলে দেখিনি। বড় হ'য়ে জেনেছি, এক ধনী প্রবাসী ইংরাজের বিলাস-ভবন ছিল এটি। তিনি চলে গেলেন আর ওখানে আসর পাতলো মারসিঅনেস!···মারসি-অনেস—কত পুরুষের হৃৎপিণ্ড যে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে ? খুব অস্থির স্বভাবের। কখনো অভিজাত লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাতায়, কখনো আবার নীচ ও হিংস্র জুয়াড়ীদের সঙ্গে ঢলাঢলি করে। জানি না, আগামী শনিবার আমাদের জন্য কী অনবদ্য অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে !

বগিভাঁ চমৎকার গ্রামাঞ্চল, সেখানে জোয়েতের রহস্যময় মানসিকতাকে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করবার চেষ্টা করবো আমি। সম্ভব হলে আরো ঘনিষ্ঠ হবো, একটি উঠতি যুবতী কতক্ষণ একজন পুরুষের উষ্ণতাকে উপেক্ষা ক'রে থাকতে পারবে ? কোন এক মুহূর্তে নিশ্চয় তার রক্ত চলকে চলকে উঠবে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। আমি সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।"

"আমার অবিশ্যি উৎসাহের কোন কারণ নেই", সেভেল বললো, "আমি কেবল সেই মহিলার সঙ্গে বিবিধ আলোচনায় নিস্তরঙ্গ সময় কাটিয়ে দেবো।"

আবার তারা ফিরে এলো সাঁজেলিজিতে। মাথার উপর বিশাল আকাশে নক্ষত্রের বুটিদার কারুকার্য। কিছুদূরে আবছা অন্ধকার বেঞ্চের ওপর এখনো এক জোড়া তরুণ-তরুণী খুব ঘনিষ্ঠ।

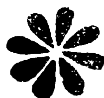
সারভিনি আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকে, "যদিও প্রেম বড় নরম জীবনের সম্পদ এবং মানুষের চলমান সময়ে তার আবির্ভাব অনিবার্য, তবু এর ফলশ্রুতি বড় জঘন্য ! এ যেন একই ঘটনার

পুনরাবৃত্তি, ঠিক বেহালার ছড়-চমকের মতন, তবু এক ঘেঁয়ে নয়। চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে, এর চেয়ে সাদামোটা জিনিস আর হয় না ; তবু মানুষ তার কল্পনা দিয়ে এই যান্ত্রিক-প্রায় ব্যাপারটাকে দূর নক্ষত্র লোকের স্বপ্ন ক'রে তুলেছে…"

একটু থেমে সে আবার বলতে থাকে, "…যে মুহূর্তে দেহ এসে পড়বে, মানুষ টের পাবে, তার কল্পনা কতখানি নিরেট বস্তু নিয়ে। তবে, হ্যাঁ, বস্তু যতই নিরেট হোক, কোন নারীর প্রেমিক হবার ক্ষেত্রে একটা গৌরব আছে। জোয়েতের প্রথম প্রেমিক হ'য়ে আমি সেই গৌরব অর্জন করতে চাই। আমার ধারণা, এই অভিজ্ঞতাটা অনবদ্য হবে।…আমাকে বাজি জিততেই হবে…প্রথম তোপের সক্ষমতা!…"

রয়েল রোডের মোড়ে এসে তারা বিচ্ছিন্ন হলো।

বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলো সেভেল।



রূপসী ওবারদির নতুন নিলয়ের নাম ভিলা প্রিতেমস্।

এক পাহাড়ী অধিত্যকায় অনুপম অবস্থান। গ্রাম, পাহাড়, নদী ও বনের ওপর দিয়ে বাতাস ছুটতে ছুটতে যে গান গায়, এই ভিলার বাসিন্দারা কান পাতলেই তা শুনতে পাবে।

বাংলোর চারদিকে সবুজ বাগান, বাগানটা আবদ্ধ হয়ে আছে খয়েরী রং প্রাচীরে এবং যেন প্রায় প্রাচীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রবহমান নদী যেন এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে মার্লির দিকে।

ভিলার বিপরীতে গাছ-গাছালিতে আচ্ছাদিত সবুজ দ্বীপ ক্রেসি স্বপ্নময়, রহস্যময়।

বাগানে—পাতা চেয়ার-টেবিলগুলি নদীর দিকে ঘোরানো, কপাট খোলা থাকলে এবং ওখানে আসন নিলে দ্বীপ ও ভাসমান কাফেলা গ্রেনোইল নজর কাড়ে।

এ যেন পরিবেশ সুমসাম, বিচিত্র নীরবতা নেমে এসেছে মাটির বুক অব্দি। ঝুপ্ ক'রে ডুব দিলো সূর্য, নদীর জল তখনো রক্তে গোলা। সূর্য হয়তো এখন অন্য কোথাও উদিত হবে। এখানে ঘুমের লগ্ন।

খাবার টেবিলে সমবেত এরা খুশিতে ডগমগ ; কোন দুশ্চিন্তা নেই, বুক ভরে গ্রহণ করে মিষ্টি সুবাস। এমন গ্রামীন পরিবেশে স্বাধীনতার সুখ পরিমাপের বাইরে। সংখ্যায় তারা চারজন ; মারসিঅনেসের হাত সেভেলের মুঠোয় এবং জোয়েতের হাত ধরা পড়েছে সারভিনির হাতে।

মেয়েদের সেই শহুরে কৃত্রিমতা এখানে কম। বিশেষত ; জোয়েত যেন এখানে পা দিয়েই বিলকুল বদলে গেছে,—তার উপর ছায়া ফেলেছে অপরিচিত বিষাদ ও গাম্ভীর্য।

সেভেল ওকে প্রশ্ন করে, "তোমাকে এখানে এমন গম্ভীর দেখছি কেন ?"

জোয়েত ম্লান হাসলো, "পরিবেশের গুণ বলতে পারেন। সত্যি আমার ভেতর একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, মানে আমি নিজে তা অনুভব করতে পারছি ! আমি যেন আর আগের জীবনের খেই খুঁজে পাচ্ছি না, পাবো না। ধাতু বদলের মতন আমিও কি বদলে যাচ্ছি। আমি কখনো পাগলের মতন ব্যবহার করি, আবার কখনো শববাহীর মতন নিশ্চুপ। সময়ের তাগিদে আমি যে কোন কাজ করতে পারি। হয়তো আমি খুনও করতে পারি।...

সকালে উঠেই আমি বুঝতে পারি, সারাটা দিন কেমন কাটবে। পর পর কি করবো, সব আমার মনে গাঁথা। মনে হয়, স্বপ্নে বুঝি আমি নির্দেশ পেয়েছি। কিন্তু আসলে সদ্যপঠিত কোন বইয়ের ভাব আমার ওপর তখন সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছে।"

জোয়েত থামলো। আজ তার রূপে আরো মাদোকতা। শাদা উলের পোশাক, হরেক অলঙ্কারে দেহ মোড়া। বক্ষআবরনীর বৈশিষ্ট্য স্তনযুগলের দৃঢ়তাকে আরো উর্ধমুখী করেছে, ঘাড়-গলার ত্বক চিক চিক

করছে। পোশাকের চেয়েও শুভ্র তার গাত্রবর্ণ, স্বর্ণাভ কেশরাশি তরঙ্গায়িত।

সারভিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে বললো, "দিনের চেয়ে রাতে তুমি আরো সুন্দরী। আমার স্বপ্ন, এই রূপকে সব সময় নিজের চোখের সামনে ধরে রাখা।"

সচকিত জোয়েত বললো, "তাই বলে চূড়ান্ত কিছু চেয়ে বোসো না মাস্কেদ। দুর্বল মুহূর্তে হয়তো রাজিও হয়ে যেতে পারি।"

মারসিঅনেসের আনন্দ আর ধরে না। স্বচ্ছ কালো পোশাকের অন্তরাল থেকে পরিস্ফুট তার শরীরের প্রতিটি খাঁজ লোভনীয়। ভরাট স্তনের ওপর দৃঢ়বদ্ধ কাঁচুলিতে রক্তাভ আভাস, এলায়িত কৃষ্ণকুন্তলে একটি রক্তগোলাপ। তার যত আগ্রহ সেভেলকে নিয়ে! আর সেভেলও পুলকিত এই চিরায়ত যৌবন মূল্যবান নারীর সঙ্গ পেয়ে। সেভেল তাকে একটি নেকলেস উপহার দিতে সে তার হাত দুটোকে প্রায় বুকের ওপরই চেপে ধরলো। এবং তখন থেকেই সেভেলের রক্তে অসংখ্য, অগুণিত আগুনের ফুলকি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। চিন্তিত ব্যক্তির ভনিতায় গালে হাত বোলাতে বোলাতে নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করছে সেভেল। একথা সত্যি, সে তার বিশাল শরীর নিয়ে অনেককাল উপবাসী রয়েছে। তাছাড়া, নারী-সঙ্গের বিস্তৃত অভিজ্ঞতাও তার নেই! একটা অতিকায় আগ্নেয়গিরি বহন ক'রে চলেছে, জীবন্ত আগ্নেয়গিরি —যার জ্বালামুখ থেকে যেকোন মুহূর্তে উত্তপ্ত লাভা নির্গত হতে পারে।

খাবার টেবিলে মাছ আসবার পর সারভিনি মুখ খুললো, "এই যে নির্জনতা, এর একটা স্বকীয় মাহাত্ম্য আছে। আমার তো মনে হয়, কথা বলার চেয়ে না বলে মানুষ মানুষের বেশী অন্তরঙ্গ হতে পারে। তাই না মাদাম?"

মারসিঅনেস সায় দিলো, "তোমার কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। শান্তি ও সুখ নীরব চিন্তাতেই আসে। সকলে মিলে একই সুখের কথা ভাবছি – খুব ভালো লাগে।"

কামার্ত দৃষ্টিতে মারসিঅনেস আবার সেভেলের দিকে তাকায়।

সেভেলও তার চোখে চোখ রাখে। টেবিলের নিচে অলক্ষ্যে তাদের দৈহিক সংস্পর্শ ঘটে যাচ্ছে সময় সময়।

সারভিনি আবার সোচ্চার হলো, "মামজেল জোয়েত, তোমার খুশি খুশি ব্যবহার দেখে, সন্দেহ হচ্ছে, তুমি কারুর প্রেমে পড়েছো। কে সেই বিরল ভাগ্যবান? প্রিন্স ক্রাভালো?"

নামটা শুনতেই ক্ষোভে বিরক্তিতে জোয়েত লাল হ'য়ে ওঠে, "তুমি কি আমার সঙ্গে নোংরা ইয়ার্কি করছো, মাস্কেদ? প্রিন্স! ব্যাটা রাশিয়ান মোমে তৈরী একটি প্রাণহীন পুতুল। সব সময় কেবল আদব-কায়দা দেখাতে চায়। অথচ ওর একমাত্র কৃতিত্ব হচ্ছে—অনেকদিন চুল ছাঁটার প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পেয়েছিল।"

"উত্তম! তাহলে লিস্ট থেকে প্রিন্সের নামটা কাটা গেল। এবার আসছে ভাইকোৎ পীয়ারো। সে-ই কি তোমার স্বপ্নের পুরুষ?"

এবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো জোয়েত, "কেন, আমাকে কি কোনদিন ওর কানের কাছে ফিস ফিসিয়ে কথা বলতেও দেখেছো?"

সারভিনি মাথা হেলায়, "না, তা দেখিনি। সুতরাং দু'নম্বর লোকটি বাতিল। বাকি রইলো কাভেলিয়ার ভলরেলি, যাকে স্বয়ং মাদামও একটু নেক নজরে দেখেন!"

আবার হাসির দমকে দুলে উঠলো জোয়েত, "লাসরিমোম! হা ভগবান। রামগড়ুরের ছানাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবে জোয়েত! না, মাস্কেদ, আমি তোমার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে পারছি না। ও তো একজন ভাড়াটে শবযাত্রী। ফ্রান্সের কোন বিখ্যাত লোক মারা গেলেই ও সেই শোক যাত্রার সামিল হবে। ও যখন আমার দিকে তাকায়, আমি নিজেই যেন শব হ'য়ে যাই।"

"ইস, তিন বেচারাই বাতিল হ'য়ে গেল। তবে কি তুমি আমার এই ব্যারণ-বন্ধু সেভেলকে মনে মনে কামনা করো?"

"জুনিয়র রোদস? অতবড় একটা পালোয়ানের সঙ্গে কখনো আমার খাপ খায়?"

"তা হলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, তুমি এই অধমের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেছো। কারণ, সম্ভাবাদের তালিকায় একমাত্র আমিই বাকি থাকছি। তোমায় যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো।"

"আহ, মাস্কেদ," উচ্ছ্বসিত জোয়েত্ত বললো, "তোমাকে আমার খুবই পদন্দ প্রিয়। কিন্তু তার অর্থ প্রেম নয়।...তবে বন্ধু হতাশ হও না।...অপেক্ষা করো, আর আগ্রহ দেখাও, সবুরে ঠিক মেওয়া ধরবে গাছে...আরো অনুগতা চাই তোমার..."

"আমি তো তোমায় সবই নিবেদন করতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে "

"কি তার আগে?"

"তার আগে তোমার প্রেমের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি চাই।"

"ধরেই নাও আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"কিন্তু—"

"থাক, আজ আর এ প্রসঙ্গে নয়।"

"তথাস্তু।"

অস্তমিত সূর্যের আভায় নদী রক্তাভ। মারসিঅনেসের মাথায় গোঁজা গোলাপটা যেন আরো লাল। অদূরবর্তিনী জোয়েতের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে দূর দিগন্তে।

সেভেলের খেয়াল হলো, মারসি-অনেস যেন তাকে চোখ দিয়ে ইশারা করছে। কাছে আসতেই মালুম হলো, অনুমানটা তার ভুল নয়। সেভেল কাছে আসতেই সে ফিসফিসিয়ে বললো, "চলো, একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই।" সেভেল পরিষ্কার দেখতে পেলো, মহিলার চকচকে

মুখাবয়বে দ্রুত কামনার ছায়া বিস্তার। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সেভেলের পাথর কঠিন বুক ও মজবুত কোমর দেখলো। তারপরই গুটি গুটি হাঁটতে শুরু ক'রে সামনের দিকে। আলো-ছায়ার খেলায় তার সুছাঁদ পাছার ছন্দ দেখে সেভেল নিজের উষ্ণতাকে অস্বীকার করতে পারে না। সেভেল কিছুটা পথ তাকে অনুসরণ করতেই মারসি-অনেস ঘুরে দাঁড়ায়, সেভেলের ডান হাতখানা চেপে ধরে। সেভেল ঈষৎ কেঁপে ওঠে, তারপর অনিবার্যভাবেই মারসিঅনেসের নরম মাংসল হাতে সে নিজের আঙ্গুল চেপে চেপে অদৃশ্য রেখা আঁকতে থাকে। এক একটা রেখাপাত এবং সঙ্গে সঙ্গে মারসিঅনেসের তপ্তশ্বাস নিম্নাঙ্গের কোন একটি স্থানে আলতো স্পর্শ লাগাবে।

কিন্তু তার আগেই হঠাৎ সেভেলের হাতটাকে সরিয়ে দিলো মারসি-অনেস. চাপা স্বরে বললো, "জোয়েত।"

চমকে ঘুরে তাকালো সেভেল।

তার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিম স্রোত নেমে যায় যেন।

জোয়েত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাদের দিকে। সাংঘাতিক মর্মভেদী দৃষ্টি! কি আছে ঐ দৃষ্টিতে? ঘৃণা? বিস্ময়? অভিমান? ক্রমশ-ক্রমশ যৌবনপ্রাপ্ত কুমারীর দৃষ্টিতে তার মা ম্লান, কুৎসিৎ হ'য়ে যাচ্ছে।...'

হয়তো মা ও ঐ প্রায় অপরিচিত লোকটার দিকে আরো কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টি নিয়ে চিত্রার্পিত হ'য়ে থাকতো জোয়েত। কিন্তু তার চমক ভাঙ্গালো সারভিনি। একরকম ছুটতে ছুটতে এসে ছুঁয়ে দিলো জোয়েতকে, "কি ব্যাপার! এমন পুতুলের মতন স্থির দাঁড়িয়ে আছো যে!"

"দেখছি।"

"কি দেখছো?"

"দেখছি এই সুন্দর প্রকৃতি এবং দিশেহারা মানুষকে।"

"তুমি কি দার্শনিক হ'য়ে গেলে ?"

"না, মাস্কেদ। আমি যেন কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠছি।"

"দূর বোকা মেয়ে, তোমার জীবনে দুঃখ বলতে কিছু থাকতেই পারে না।···জোয়েত, ভাখো, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা দু'জনে ঐ দ্বীপটাতে ঘুরতে যাবো।"

চকিতে জোয়েতের খুশিভরা সম্মতি, "চমৎকার প্রস্তাব। শুধু আমরা দু'জনে যাবো। আর কেউ নয়।"

"হ্যাঁ, শুধু আমরা দু'জন।"

আবার জমাট নির্জনতা! কালিগোলা অন্ধকারে আর সমস্ত রঙ-বৈচিত্র্য স্থানে স্থানে মরে হেজে গেছে। সান্ধ্য গাম্ভীর্য কেবল চরাচরে নয়, মানুষের মনেও। শহরে এ সময় যে হুল্লোড়, এখানে তা অকল্পনীয়। একটা গ্রাম্য মানুষ খোলা গলায় গাইতে হেঁটে যাচ্ছে নদীর পাড় ধরে ধরে। ওর কাঁচা-পাকা লোম, পুরু গোঁফ নির্বিকার সরলতার চিত্ররূপ।

জীবনের এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে দুটি নারী ও দুটি পুরুষের মুখেও ভাষা নেই। পরিচারকের দলও অদ্ভুত নির্বাক।

বহুক্ষণ পরে জোয়েত জিজ্ঞেস করলো, "আমরা এখানে কত দিন থাকবো ?" মারসিঅনেস জবাব দিলো, "যতদিন ভালো লাগবে।"

দূরে দূরে ঘরে ঘরে জ্বলে উঠছে বাতি। আলোর রঙ শিথিল, বিষ লের বাতি নিশানা ক'রে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে থাকে পতঙ্গের দল। ওদের জ্বালায় রসিয়ে রসিয়ে ভোজন সারা গেল না, মদের গেলাসেও পোকা পড়ার ভয়। তাড়াতাড়ি একরকম অন্ধকারেই তাই খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলতে হলো।

জোয়েত বললো, "খাবার পর্ব বেশ চটপট চুকে গেল। চলো, এবার দ্বীপটা ঘুরে আসি।"

মারসিঅনেস শুনতে পেলো কথাটা। জোয়েতের প্রতিটি পরি-

কল্পনারই অবশ্য হালহদিস তার অজানা থাকে না। বললো, "এখন দ্বীপে যাবে ?

জোয়েত জোর দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, যাবো।"

মারসিঅনেস শান্ত স্বরে বললো, "সঙ্গে দেশচরা মানুষ সারভিনি আছে বলেই আমি অনুমতি দিচ্ছি। আমরা যাবো তোমাদের সঙ্গে ফেরীঘাট অব্দি। ফিরতে বেশী রাত করবে না কিন্তু।"

ওরা চলেছে অন্ধকার চিরে। অন্ধকারে মারসিঅনেসের মাথায় শাদা গোলটুপিটা স্পষ্ট। নিশুতিসময়ের নির্জন পথ ঠিক দূরগামী সড়ক নয়, যেন যে কোন মুহূর্তে এই অপ্রশস্ত পথটা শেষ হ'য়ে যেতে পারে। ক্রমশঃ এই চারজনে দুটো বৃত্ত রচনা ক'রে এগিয়ে চললো। একটা বৃত্তে সদ্যযৌবনপ্রাপ্তা জোয়েত ও সারভিনি; অন্যটিতে কালের চাকায় অভিজ্ঞ মারসিঅনেস ও বিশালদেহী সেভেল।

মারসিঅনেস আর সেভেলের কণ্ঠস্বর আবছা আবছা ভেসে আসছে। ওদের উচ্চারিত শব্দ হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামার মতন। আবার অদূরে নদী আছে বলেই গুরু গুরু গম্ভীর ডাক আরো দূরের ধ্বনিপুঞ্জের সঙ্গে একাকার। অসংখ্য নক্ষত্র খচিত আকাশ নদীর জলে প্রতিবিম্বিত। গোটা নদীতট জুড়ে ব্যাঙের ডাক এবং আকাশে নাইটিঙ্গেল পাখির মধুর সুরতান।

চলতে চলতে হঠাৎ জোয়েতের খেয়াল হলো, "আরে! মা আর সেই লোকটা তো আসছে না! কোথায় গেল ওরা ?"

চনমনে উল্লাসে সারভিনি বললো, "নিশ্চয় নিঃশব্দে একসময় পিছু-পানে ফিরে গেছে। তোমার মার বোধহয় ঠাণ্ডা লাগছিল।"

তারা আবার হাঁটতে আরম্ভ করে।

কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায় নদীরই গর্ভে একটি সরাইখানা, যার উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধায়। মারতিনেত নামক এক জেলে এই সরাইখানার মালিক।

ঘাটে একটা বড় সড় নৌকা বাঁধা। তাতে ওরা লাফিয়ে উঠে পড়ে। মাঝির খোঁজে হাঁক পাড়তে থাকে সারভিনি। ঘর থেকে ছুটে আসে মাঝি। লগির এক ঠেলায় নৌকা একেবারে মাঝ-নদীতে। জলের ছলাৎ-ছলাৎ রব। আকাশের নক্ষত্র নদীর বুকে চিক চিক করে, প্রসারিত হয়, তলিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গেল দ্বীপ। আদাড়ে শেয়াল ডাকে। বাদাড়ে পতঙ্গদের বিলাপ। কেবল মুখে প্রত্যাশা ঝকমক কোন মানুষের উপস্থিতি এই মুহূর্তে টের পাওয়া যাচ্ছে না।

ওরা নৌকায় দুলতে দুলতে নরম মাটিতে লাফিয়ে নামলো। কী বিশাল বিশাল গাছ! গাছ গাছালির মধ্য দিয়ে তারা হাঁটতে থাকে। অজস্র পাখিরা এসে বিশ্রাম নিচ্ছে ঐ সব গাছের আশ্রয়ে। পায়ের তলায় হিমেল মাটি। এখানে অপার শান্তি—অগাধ শান্তি। দূরে—অনেক দূরে কে বুঝি পিয়ানো বাজাচ্ছে। আশ্চর্য অর্থবহ সেই সুর তরঙ্গ।

সারভিনি জোয়েতের একখানা হাত ধরলো, তারপর আস্তে আস্তে জড়িয়ে ধরলো ওর কোমর, মৃদু মৃদু চাপ দিতে থাকে নরম মাংসে, ফিস ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কি ভাবছো, জোয়েত?"

জোয়েত যেন ঈষৎ চমকে ওঠে, "কৈ! কিছু না তো! আমার খুব ভালো লাগছে!"

"তুমি কি আমার কথা একদম ভাবো না?"

"ভাবি মাস্কেদ, একটু বেশীই ভাবি। থাক না এখন ও সব কথা। এই বিচিত্র আরণ্যক রাজ্যে ওসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।"

সারভিনি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না। জোয়েতের ওপর ক্রমশই তার চাপ বাড়ছে। জোয়েতকে প্রবল ভাবে নিজের শরীরের সঙ্গে লেপ্টে রাখতে চাইছে।

জোয়েত বাধা দিচ্ছে, কিন্তু পেরে উঠছে না।

সারভিনির তপ্ত হাত জোয়েতের পিঠে ওঠা-নামা করছে, কিন্তু ঠিক

বুকের ওপর হিংস্র হ'য়ে উঠবার সুযোগ পাচ্ছে না। এখনো প্রতীক্ষা করতে হবে! এখনো!

আবার সারভিনি কাঁপা গলায় ডাকে, "জোয়েত।"

"বলো।"

"আমি তোমায় ভালোবাসি, জোয়েত। আমি তোমায়—"

"ও রকম ক'রে বলো না মাস্কেদ···না, না, হাতটা এখানে এনো না।"

"কবে থেকে আমি তোমার প্রেমের প্রতীক্ষায় রয়েছি। আজ একটু সুযোগ দাও। দাও—"

"না-না। তুমি কেবল তোমার সুন্দর সুন্দর কথাগুলি বলো। আমি শুনবো।"

জোয়েত আলাদা হ'য়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সারভিনির বন্ধন বড় কঠিন! কামনাতপ্ত পুরুষের বন্ধন থেকে নারীর মুক্তি পাওয়া সহজসাধ্য নয়। দু'জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যেন মাতালের মতন পরস্পরের অক্ষম শক্তিকে যাচাই করছে।

সারভিনি ঠিক সাহস পাচ্ছে না। অথচ, এমন একটা সুযোগের প্রতীক্ষায় সে অনেকদিন যাবৎ রয়েছে।

জোয়েতের ঠিক সম্মতি আছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। এই সময়ে কুমারী মনের হদিশ মেলা দেবতারও অসাধ্য। সারভিনি বাতুলের মতন তাই বলে চলেছে, "কথা তুমি বলো জোয়েত···আমি তোমার বুকে কান পেতে, কোমরে মুখ রেখে শুনবো···"

তারপর আচমকা সারভিনি তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। সে সপাটে জপাটে ধরে জোয়েতকে বুকের সঙ্গে লেপ্টে ধরে, দু'হাতে জোর ক'রে তুলে ধরে জোয়েতের মুখ, ঠিক ঠিক ঠোঁটের নাগাল না পেয়ে সুন্দর মরশুমী ফুলের মতন ওর ছোট্ট কপালে চুমু খায়।

ললাট-চুম্বনে যথার্থ শিহরণ উঠবার কথা নয়। কিন্তু জোয়েতের মৃদু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, "এই! কি অসভ্যতামি করছো!"

সারভিনি অনুভব করে, প্রতিবাদ মৃদু অর্থাৎ, জোয়েত একেবারে রেগে যায়নি। তার সাহস ও উৎসাহ আরো প্রবল হয়ে ওঠে, তার বেষ্টনি এবার গ্রাস করে নেয় জোয়েতের নরম ঋজু ঘাড়কে, গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুলে নাক ঘষতে ঘষতে বার কয়েক ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়।

এবারে কিন্তু প্রতিবাদের অভিব্যক্তি অনেক বেশি বাস্তব ও তীব্র। জোয়েত তার কনুই দিয়ে সারভিনির বুকে ধাক্কা মারে।

ততক্ষণে সারভিনির রক্তে আগুন ধরে গেছে। শব্দহীন চাপা নিঃশ্বাস তার ঠিক সেই পুরুষের, ইতিহাসে যারা কখনো কখনো নারীকে সোহাগ জানাতে গিয়ে পাশবিক হ'য়ে উঠেছে।

জোয়েতকে উল্টে পাল্টে বুকের ওপর প্রায় তুলে ধরলো। ওর বগলের নীচে হাত ঢুকিয়ে আবার মুখখানাকে টেনে আনলো নিজের মুখের খুব কাছাকাছি। তারপরই চুম্বন। অসম্ভব তপ্ত কামার্ত চুম্বন। সেই প্রথম।

আনন্দে প্রায় শরীরপাতের মতন অবস্থা সারভিনির। তার মাথা ঘুরছে। আর সেই সুযোগে নিজেকে মুক্ত ক'রে পালালো জোয়েত। দুপ্ দুপ্ পায়ের শব্দ, মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে পলাতকার বিপন্ন শরীরী ঘ্রাণ। মুহূর্তে অনেক দূরে চকিতে হারিয়ে যাচ্ছে হরিণীর অাস্যমান ছায়া। বংশপরম্পরা কুটুম্বিতে গাছ গাছালির দল তাকে সস্নেহে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় দিশেহারা সারভিনি।

কিছুক্ষণ সে ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নেয়, অপেক্ষা করে।

কিন্তু জোয়েত ফিরে এলো না দেখে হাল্কা স্বরে ডাকে ঃ জোয়েত।

কোন সাড়া নেই।

নিরেট জমাট অন্ধকার। দৃষ্টির গতি সীমিত। চিন্তিত সারভিনি ঝোঁপঝাড় সরিয়ে সরিয়ে উঁকি মারে। ক্ষয়া খর্বুটে একখণ্ড পাথরের সঙ্গে ঠোক্কর লাগে। ব্যথায় সামান্য কঁকিয়ে ওঠে সারভিনি।

কোথাও জোয়েত নেই।

কোথায় গেল মেয়েটা ?

সারভিনি এবার ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার স্বর উঁচুতে তুলতে থাকে ঃ

জো-য়ে-ত !

মাম জেল জো-য়ে-ত !

কোন প্রত্যুত্তর নেই। ক্ষীণ প্রতিধ্বনি। বন থেকে নদীর দোরগোড়া অব্দি ভয়ঙ্কর নীরবতা। এমনকি পাখিরাও ডাকে না। অন্ধকারে চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাচ্ছে সারভিনি। তার ক্লান্ত স্বর ছড়িয়ে পড়ছে ঃ জোয়েত ! মামজেল !

মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে। না, কোথাও কোন সাড়া নেই। অদ্ভুত নির্জন ভূতুড়ে দ্বীপ। হাঁটতে হাঁটতে সে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ায়। এখানে সে দাহুরী পাখির করুণ কান্না শুনতে পায়। গোটা বনজ দ্বীপ সে পাতি পাতি ক'রে খুঁজেছে। কোথাও সে জোয়েতের সন্ধান পেলো না। অন্ধকারকে সাক্ষী রেখে প্রায় বিলাপ ক'রে ওঠে সে, "জোয়েত, সাড়া দাও। আমি আর পারছি না। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা মাত্র করছিলাম। জোয়েত, সাড়া দাও।"

তবু সাড়া নেই।

হতাশ, ম্রিয়মান, ঈষৎ শঙ্কিত সারভিনি নদী পেরিয়ে এপারে উঠে এলো। চোখের সামনে কাফে লা গ্রেনোইলের আলো। ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। রাতের বয়স এখন মধ্যযৌবন। তা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সে জোয়েতের সন্ধানে ঐ জঙ্গলময় দ্বীপে চক্কর কেটেছে। নিশ্চয় জোয়েত তাকে ফাঁকি দিয়ে ফিরে এসেছে ঘরে। ভয়কম্পিত অন্তরে ভিলায় প্রবেশ করে সারভিনি।

বাড়ির এক চাকর হলঘরে টেবিলের ওপর হাত পেতে ঘুমোচ্ছিলো। সারভিনি তাকে ঠেলে তুলে জিজ্ঞেস করে, "জোয়েত কি ফিরেছে ?"

"হ্যাঁ, স্যর, তিনি তো রাত দশটার সময়ই ফিরে এসেছেন।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সারভিনি। নিজের ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো।

কিন্তু ঘুম আর আসে না। জোয়েতের পাগলামির চেয়েও সেই জ্বালাময় চুম্বন তাকে উত্তপ্ত মস্তিষ্ক করে রেখেছে। আচ্ছা, জোয়েত কি চায়? অতক্ষণ ধরে শারীরিক ঘর্ষণেও তাকে কাবু করা গেল না! একটি কুমারী মেয়ের ভেতর উত্তেজনা জাগাতে অতটা কসরৎ করতে হবে কেন? বড় রহস্যময়ী মেয়ে। এই রহস্যই পাগল ক'রে দিচ্ছে সারভিনিকে। নারী অভিজ্ঞতা তো সারভিনির এই নতুন নয়। এর আগে বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে আনবার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। কিন্তু জোয়েত তো তাদের মতন নয়, সে অনন্যা। এমন একটি মেয়ের ভালোবাসা পাবার জন্য পৃথিবীতে অনেককাল বেঁচে থাকা যায়।

রাত একটা।···

রাত দুটো!···

ঘুম নেই।

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে কে! গুমোট গরম আর লোনা ঘাম। সব কিছু মিলিয়ে একটা অপরিচিত রাত হাঁ ক'রে গিলতে আসছে। সারভিনি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা খুলে দেয়। আঃ! যেন এক ঝাঁক পাখির ডানায় ভর ক'রে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকলো এ ঘরে। সে বুক ভরে দম নেয়। নিঝুম কালো রাত তার চরিত্র বদলালো না।

কিন্তু না, রাতে বৈচিত্র্য আছে। হঠাৎ সারভিনি খেয়াল করলো, বাগানে এক বিন্দু জোনাকি আলো জ্বলছে। নির্ঘাৎ এই রাতে ওখানে বসে বসে কেউ সিগ্রেট টানছে। সেভেলই হবে।

খুব নীচু গলায় সারভিনি ডাকে, "লিয়।"

জবাব আসে, "কে?"

"আমি সারভিনি। বসে থাকো, আমি যাচ্ছি।"

শরীরে একটা আবরণ চাপিয়ে বেরিয়ে এলো সারভিনি। বাগানে একটা লোহার চেয়ারে গা এলিয়ে সিগ্রেট টানছে সেভেল।

"এত রাত অব্দি এখানে বসে আছো?"

"বিশ্রাম নিচ্ছি।"—সেভেলের মুচকি হাসি।

"তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান। আমি এতক্ষণ হতাশার দেয়ালে কপাল ঠুকছিলাম।"

"কি বলছো তুমি ?"

"ঠিকই বলছি বন্ধু···জোয়েত অন্যজাতের মেয়ে। ওর মায়ের মতন আদৌ নয়।"

"কি হয়েছে খুলে বলো।"

সারভিনি তার অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলে। "···ঐ মেয়ে আমাকে নাকাল করে ছাড়ছে। আমার চোখ থেকে ঘুম চলে গেল। নারী কী রহস্যময়ী ! অথচ, দেখো···সাধারণভাবে জোয়েত কত সাদাসিধে, কিন্তু আসলে ওর মনের তল খুঁজে পাবে না। ও আমার বুদ্ধিনাশ ঘটাবে।···"

সেভেল একটু নড়ে চড়ে বসে, "খুব হুঁশিয়ার, বন্ধু—ও তোমাকে ঠিক বিয়ের ফাঁদে জড়াবে। ইতিহাসের পাতা ওল্টাও, এ ধরণের বহু দৃষ্টান্ত নজরে আসবে। পড়োনি, সাধারণ ঘরের মেয়ে মাদমোয়াজেল দ্য মঁতিজেল একদিন এই কৌশলেই সম্রাজ্ঞী হ'য়ে বসেছিলেন ? তুমি আবার দ্বিতীয় নেপোলিয়ন না হ'য়ে যাও।"

সারভিনির ধূসর চোখও ঝিলিক দিয়ে ওঠে, "না, সে গুড়ে বালি। আমি সম্রাটও নই, নির্বোধও নই। গণিকার মেয়েকে নিয়ে যৌন-ফুর্তি করা যায়, ঘর বাধা যায় না। যাক, তোমার কি ঘুম পেয়েছে ?"

"না।"

"তবে চলো, নদীর ধারে একটু বেরিয়ে আসি।"

"চলো।"

দুই বন্ধু নদীতট বরাবর মার্লির দিকে এগিয়ে চললো। রাতে জলের একটা আলাদা আলো আছে, মনে হচ্ছে যেন একটা ক্ষীণ ছুঁচলো আলোক-রেখা ছোটাছুটি করছে।

তখন গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্রাহ্মমুহূর্ত।ঘু প্রকৃতিমের অতলান্তে। আসন্ন

উদয়-লগ্নে সূর্য কোন সাক্ষী প্রার্থনা করে না। নাইটিঙ্গেল আর ব্যাঙেরাও ঘুমিয়ে আছে।

সেভেল তার পিঠের কাঁপন টের পায়।

সারভিনি দার্শনিক সুলভ ভাবনায় ভাবিত। সে বলতে থাকে, "এই উঠতি কিশোরী আমার মাথায় আগুন ধরিয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মে প্রেম চলে না। অঙ্কশাস্ত্রে একের সঙ্গে এক যোগ করলে দুই হয়; আর প্রেমশাস্ত্রে একের সঙ্গে এক যোগ করলে একই হবে। কিন্তু আমার ও জোয়েতের বেলায় ব্যাপারটা হচ্ছে একেবারে উল্টো। এখানে উত্তর 'এক' হচ্ছে না, হচ্ছে 'দুই'। কোন এক রমনীর সত্তার সঙ্গে এক হ'য়ে যাবার অনবদ্য অভিজ্ঞতা কি তোমার আছে? এ শুধু দৈহিক সঙ্গম নয়, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। নর ও নারীর সেই সর্বাত্মক মিলনই বিধাতা পুরুষের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তবে চূড়ান্ত মিলন বুঝি কখনোই সম্ভব নয়। কি এক সূক্ষ্ম বেদনাময় ব্যবধান থেকেই যাবে। আকাশের তারাদের কাছে হয়তো বা একদিন পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে, কিন্তু তারাদের সঙ্গে পৃথিবীর যে ব্যবধান তা কোনদিন ঘুচবে না।"

"আমার মাথায় ও সব গভীরতা ঢোকে না," সেভেল বললো, "নারীর মনে বা, চোখে কি আছে আমি তা বুঝবার চেষ্টাই করি না। তার বাইরে টুকুতেই আমি খুশি।"

সারভিনি। কিন্তু আপন মনে বলেই চলেছে, "জোয়েত—এক বিরাট প্রহেলিকা। জানি না, কাল সকালে আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে।

নদীর চিরন্তন শব্দ ধারাবাহিক—গভীর ও গম্ভীর বাতাস, ঘড়ির কাঁটা হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতনের সঙ্গে সমান্তরাল। কাফের পিছনে কিছু মোরগের কোঁ কোঁ রব। অন্তিম লগ্নে নক্ষত্রমালা আরো উজ্জ্বল। একটা রাতচরা পাখি হঠাৎ নদী ছুঁয়ে হারিয়ে গেল। বালুতট ছেঁড়া খোঁড়া, মরা শামুক ও ঝিনুকের খোলা।...ক্রমশ আকাশ পরিষ্কার। নীল আকাশে উষার আবির্ভাব। দূর অন্যান্য গ্রাম্য আস্তানা থেকে

পশুদের ডাক ভেসে আসে। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাখিদের কাকলি।

শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে হাসলো সেভেল, "সারাটা রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিলুম। এবার আমাদের ফেরা উচিত।"

সারভিনি যখন তার ঘরে ফিরে এলো, পূবাকাশে তখন গোলাপী আভা। কপাট বন্ধ ক'রে বিছানায় নিজের শ্রান্ত শরীর এলিয়ে দেয়। মুহূর্তে অপ্রতিরোধ্য ঘুম তাকে অধিকার করে।

ঘুম ভাঙলো যেন কিসের শব্দে। শব্দটা হচ্ছে খিড়কিতে। কপাট খুলতেই বিস্ময়—হলুদ পোশাক প'রে জোয়েত সমানে ঢিল ছুঁড়ছে জানালার শার্শি তাক করে। সারভিনিকে জানালার কাছে দেখতে পেয়েই নেচে ওঠে, "এই যে মাস্কেদ, এত বেলা অব্দি ঘুম! বলিহারি তোমায়। কাল সারারাত ধরে কি কম্ম হয়েছে? কোন এ্যাডভেঞ্চার করে এসেছো নাকি?"

"দাঁড়াও, আসছি। মুখে-চোখে জল দিয়ে আসছি।"

"তাড়াতাড়ি। দশটা বাজে। এগারোটায় কোন ভদ্রলোক ব্রেকফাস্ট সারে না।"

বাগানে নেমেই দ্রুত পায়ে জোয়েতের কাছে চলে গেল সারভিনি। ততক্ষণে শ্রীমতী জোয়েত তার হাঁটুর উপর একখানা বই খুলে পাঠে নিমগ্ন। সারভিনি তার পাশে গিয়ে বসতেই এমন সহজ সরল ভাব দেখাতে শুরু করলো যেন গতরাতে অনভিপ্রেত কিছুই ঘটেনি। বললো "শোন মাস্কেদ, আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। মা প্রায়ই বলেন, গ্রেনোইলে নাকি কোন ভদ্রঘরের মেয়েরা যায় না। কিন্তু আজ আমি ওখানেই যেতে চাই। তুমি আমায় নিয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে নদীতে নেমে খুব হুল্লোড় করবো।"

জোয়েতের প্রসাধনী গন্ধ, যা তার মার মতন উগ্র নয়, আবিষ্ট

ক'রে রাখে জোয়েতকে। ওর নির্মল মুখখানা এখন সারভিনির ঠোঁটের নাগালের মধ্যে। আবার সেই অনুভূতি—ইন্দ্রিয়ের অসংযত তাড়না।

"তুমি আমায় নিয়ে যাবে তো মাস্কেদ?" জোয়েত আব্দার ধরলো, "মা আবার গরম একদম সহ্য করতে পারে না। আর আজ যা উত্তাপ, মনে হয় না, দুপুরে সে ঘর ছেড়ে বের হবে। তোমার বন্ধুকে মার প্রহরায় রেখে আমরা দু'জনে বন দেখার ছলে সোজা চলে যাবো গ্রেনোইলে। কি মজা যে হবে!"

ওরা হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে প্রাচীরের প্রান্তে, গেল নদীর কিনার অব্দি। এখন নদীর বুকে প্রখর আলোর ঝলকানি। দূরে ঝুল ঝুল কুয়াশাও লক্ষনীয়। কয়েকটি হাল্কা ও মাল বোঝাই বোট জল কেটে পার হচ্ছে।

স্টিমবোটগুলির সাইরেন বেজে ওঠে থেকে থেকে। ছুটির দিন রবিবারে দূর—দূরাঞ্চল থেকে রেলগাড়িতে চেপে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে এই প্রাকৃতিক রাজ্যে খুশীর মৌতাত ভোগ করতে।

বেশির ভাগই শহরের বনেদী ঘরের পুরুষ ও মহিলারা, যাঁদের বৈভবের দিকে স্থানীয় মেহনতী লোকেরা করুণ মিনতিভরা চোখে চেয়ে থাকে।…ব্রেকফাস্টের কর্কশ ঘণ্টাধ্বনি এইসব মুহূর্ত্তের তন্ময়তাকে বরবাদ ক'রে দিলো! ওরা দু'জনে ফিরে আসে। খাবার টেবিলে কঠিন নীরবতা।

জুলাই মাস। নিদাঘের তপ্ততা সত্যি অসহনীয়। শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হাসি-মস্করার কোরাস-ধ্বনি হঠাৎই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু জোয়েত, যে কোন নীরবতার তোয়াক্কা করে না, খাবার টেবিলে বসেই নাটকীয় ভঙ্গীমায় বললো, "এই গরমের হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় হলো গাছের ছায়ায় ছায়ায় চরে বেড়ানো।"

মারসিঅনেসের মুখে এই প্রথম বিরক্তিসূচক বলিরেখা ফুটে ওঠে, "কি যা তা বলছো!"

জোয়েত দমে যাবার পাত্রী নয়, "তোমার আপত্তি থাকলে ঘরে বসে থাকো। ব্যারণও থাকবেন। মাস্কেদ আর আমি চলে যাবো ঐ পাহাড়ী বনগুলির মধ্যে। ওখানে গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে কবিতার বই পড়বো। ইস্, মানুষ যদি এমন বনের সঙ্গে খেলা করতে পারতো, কত মুশকিলের আসান হ'য়ে যেতো!"

তারপর সারভিনির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, "কি, সাড়া দিচ্ছোনা যে?"

"আমি তোমার ইচ্ছার দাস।"

ছুটে গেল জোয়েত তার টুপিটা আনতে।

"মেয়েটার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে"—অবসাদে শিথিল অঙ্গ ছড়িয়ে দিলো মারসিঅনেস। তার একখানা ধবধবে হাত সেভেলের বুকের কাছাকাছি। সেভেলের ইচ্ছে হলো ঐ হাতে চুমু খেয়ে কবুল করে, "আর আমি যে তোমার ইচ্ছার দাস।"

যাবতীয় নীরবতাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে জোয়েত গান গেয়ে ওঠে। আঙ্গুলের ডগায় গোলাকার টুপিটা ঘোরাতে ঘোরাতে ফিরে আসছে সে।

আবার ওরা পাশাপাশি। সারভিনি ও জোয়েত। মাটির রঙ কোথাও সোনালী, কোথাও খয়েরী, কোথাও শাদা ঘড়ির মতন। হাঁটছে তারা খা খা রোদ্দুরের মধ্য দিয়ে গাছের ছায়ার দিকে। কিন্তু এখনো সময় হয়নি গ্রেনোইলে যাবার। নদীর পুল পেরিয়ে তারা গিয়ে ঢুকলো আর একটি কৃত্রিম দ্বীপের অভ্যন্তরে, ঝর্ণার ধারে বেড়ে ওঠা বিশাল উইলো গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলো আয়াস করে। জোয়েতের হাতে একটা বই। মাস্কেদের দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বললো, "তুমি পড়ো মাস্কেদ, আমি শুনি।"

আবার সারভিনির রঙিন প্রজ্ঞা মিলিয়ে যায়, তার স্বরে হতাশা, "আমি পড়তে জানি না, জোয়েত।" জোয়েতের নীল চোখে বিস্ময়,

"ছিঃ! এভাবে হতাশ হতে হয়? তুমি তো আদর্শ প্রেমিক এবং আদর্শ প্রেমিকরা কখনো কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা করে না। নাও, পড়ে যাও আমি শুনি।"

বইটাকে জোয়েতের কাছ থেকে নিতে হলো সারভিনিকে। কিন্তু মলাটের উপর নজর আসতেই চোখ চড়কগাছ। কবিতা নয়, নাটক নয়, নভেল নয়, এক ইংরেজ বিজ্ঞানীর লেখা কীটতত্বের বই, "পিপিলিকার ইতিবৃত্ত"!

সারভিনি হাসবে, না কাঁদবে, ভেবে উঠতে পারে না।

জোয়েত তাগাদা দেয়, "কই পড়ো।"

সারভিনি বললো, "তুমি আমার সঙ্গে কেবল তামাশাই করে যাবে?"

"সে আবার কি গো?" জোয়েতের দুই চোখ আরো তীব্র নীল হয়ে ওঠে, "জ্ঞানের পিপাসায় ছটফট করাটাই তো জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। আমি দোকানে গিয়ে পিঁপড়ের ওপর সবচেয়ে দামী বইখানা কিনে নিয়ে এলাম। ভাবলাম, এই দুপুরে ঘাসের বিছানায় শুয়ে ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে বুদ্ধিমান জীবদের কথা শুনবো। ব্যাপাররটা কি মজার নয়?"

সারভিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, "হুঁ খুব মর্মান্তিকভাবে মজার।"

সে পড়ে শোনায়ঃ

"...দৈহিক সাদৃশ্যের দিক থেকে বানরজাতীয় প্রাণীরাই হচ্ছে মানুষের নিকট আত্মীয়। কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা ও প্রাত্যহিক জীবন-শৃঙ্খলার দিক থেকে পিপিলিকাদের স্থান মানুষের পরেই। মনুষ্যসুলভ নিপুণতায় তারা তাদের আবাস নির্মাণ করে, চলন-উপযোগী পথ প্রস্তুত করে, গোষ্ঠী সুবিধার্থে দাসপ্রথাকে মদত দেয়..."

একটানা পড়তে পড়তে একসময় বিরক্ত সারভিনি বললো, "অনেকক্ষণ তো ঘ্যানর ঘ্যানর ক'রে পড়লুম। এবার শান্তি দাও।"

ইতিমধ্যে জোয়েত একটি ঘাসের ডগায় সঞ্চরণমান একটি পিঁপড়েকে নিবিষ্ট একাগ্রতায় দেখতে শুরু করেছে। তার ব্যবহারে

বিস্ময়ের সঙ্গে অদ্ভুত মমত্ববোধও লক্ষনীয়। জোয়েত নীচু হয়ে কীটটিকে চুমু খেতে যায়।

কিন্তু পিঁপড়েটি মুহূর্ত্তে তার গাল বেয়ে চুলের মধ্যে ঢুকে গেল।

বিব্রত জোয়েত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একশেষ। সারভিনি হো হো ক'রে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে জোয়েতের থোকা থোকা চুল সরিয়ে সেই কীটটাকে উদ্ধার করে এবং জোয়েতের মাথায় আবেগে চুমু খায়। বাধা দেয় না জোয়েত।

চুলের নিবিড় অভ্যন্তরে বিন্যস্ততা এনে উঠে দাঁড়ায় জোয়েত, বললো, "উপন্যাসের চেয়েও উপাদেয় এই পিঁপড়ে উপাখ্যান। চলো এবার গ্রেনোইলের দিকে।"

গ্রেনোইল একটি উদ্যান বিশেষ, যেখানে নর-নারীর অবাধ মিলন বিখ্যাত। নিতান্ত রিক্ত চেহারার যুবতীও ওখানে তার সঙ্গী জুটিয়ে নিতে পারে। আবার যে কোন হেলা-ফেলা পুরুষও পারে কোন এক অপরিচিতার মুখ থেকে নিজের প্রশস্তি শুনতে।

সেই বিশেষ জায়গায় গিয়ে তারা দেখলো, ইতিমধ্যেই সেখানে বহু প্রেমিক-প্রেমিকার সমাবেশ ঘটেছে। সব জোড়ায় জোড়ায় জড়াজড়ি ক'রে বসে আছে, কেউ কেউ গাছের আড়ালে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ছে, পরস্পর পরস্পরের ঠোঁটে ডুব দিয়েছে, পারি-পার্শ্বিকতার কথা ভুলে বিলকুল দেহের সঙ্গে লেপ্টে রেখেছে। নদীতে একাধিক পালতোলা সৌখীন নৌকা, যদিও মাঝি মাল্লার গানে বেদনাহত উপলব্ধি। যৌবন ডগমগ যুবক-যুবতীর হাঁটছে পাশাপাশি। মন উজাড় ক'রে প্রেমালাপ চলছে তাদের। তারপর কাম যদি রাক্ষসীয় হিংস্রতা প্রাপ্ত হয়, গোপন কক্ষ ভাড়া নিতে পারবে।

একটা প্রকাণ্ড নৌকা ভিড়লো এই ঘাটে। বজরা থেকে ঢুলু ঢুলু আঁখি যে লোকটি নেমে এলেন, তাঁকে দেখলেই মনে হয়, ইনি সেই সমস্ত অভিজাতদের একজন, যাঁরা এখনো কাঙালী মেরে কাছারি গরম ক'রে

থাকেন। ওঁর পিছন পিছনে এক দঙ্গল মেয়েমানুষ পাল্লা দিয়ে পাছা দোলাচ্ছে।

ইতি উতি সুরাপানের আসর, পুরুষ ও নারী সমানে মদ্য পান করছে, হৈ-হুল্লোড়ে মাটি ও আকাশ কম্পমান ; কে একজন ওরই মধ্যে বেহালা বাজাচ্ছে, আর একজন ক্যানাস্তারা পিটিয়ে সৃষ্টি করছে বিকট আওয়াজ। সুন্দরীরা আকণ্ঠ নেশা ক'রে দিশেহারা,—বুকের বাঁধন আলগা ক'রে পুরুষদের দেখায় নিজেদের পুরুষ্টু স্তন, নিতম্ব দুলিয়ে দুলিয়ে পাছার বিশালতায় তাক লাগিয়ে দেয়। মাথায় জোকারের টুপি, পরণে সামান্য নেংটি—অর্ধ উলঙ্গ এক যুবক একরাশ ঘূর্ণায়মান যুবতীর সঙ্গে মহড়া দিচ্ছে। তাদের হো-হো খিল-খিল হাসিতে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। আর কি সব অশ্লীল খিস্তি। সাঁতারের পোশাক প'রে নর-নারীর উদ্দাম জলকেলি, জাপটাজাপটি এবং খিস্তি খেউড়!...

সমস্ত রকম বিচার-বুদ্ধিকে হনন ক'রে এই সমস্ত দৃশ্য যে রকম অদ্ভুতভাবে স্নায়ুকে উত্তেজিত করছে, কিছুক্ষণ প্রত্যক্ষ করবার পরই সারভিনির তা আর ভালো লাগছে না। তার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে।

কিন্তু সে অবাক হচ্ছে, এই পাশবিক পরিবেশে জোয়েতের কি ফুর্তি! সে যেন এখন অনেক বেশি অলীক ও চতুর। নীচুস্তরের নর-নারীর কাণ্ড কারখানায় সে সোল্লাসে হাততালি দিতে থাকে। মনে মনে সারভিন জোয়েতের রুচির নিন্দা না ক'রে পারছে না। ও এমন কেন? কেন এমন উল্লাস? হঠাৎ কি ওর ভেতর রক্তের দোষ প্রবল হয়ে উঠলো? যে মেয়ের পিতৃপরিচয় নেই, তার রুচি কোন এক সময় নিম্নখাতে বইতে শুরু করবেই। সারভিনি ভ্রূকুটিকুটিল সম্যক্ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবার চেষ্টায়। আর জোয়েত কিছু কিছু কুৎসিৎ দৃশ্যের ধারাবিবরণী দিচ্ছে যেন, বিশেষত ঐ সমস্ত মেয়ের দেহে যৌবন ও চুলের প্রশংসায় তার উৎসাহের অন্ত নেই। মদ্যপায়ীদের বেলেল্লাপনা, গেলাস ভাঙ্গা, তার ভিতর খুশির শিহরণ জাগাচ্ছে। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো জোয়েত, "মাস্কেদ, আমার যে কি মজাই লাগছে!"

সারভিনি অন্তর্লোকের অনপনেয় সংস্কার ও প্রতিবাদে কঠিন, গম্ভীর।

জোয়েত বললো, "মাস্কেদ, আমরা নদীতে স্নান করবো।"

"যেমন তোমার অভিরুচি।"

স্নানের পোশাক প'রে তারা নদীতে নামলো, সাঁতার কাটতে শুরু করলো। অনেকটা মাল গলাধঃকরণ করে আরো ক'জন নামলো ঠিক ঐ মুহূর্তেই।

একা স্বর্ণাভ জোয়েতই যা দেখাচ্ছে, ফুর্তিবাজরা বুঁদ হ'য়ে যাবে। সত্যি সত্যি জলকন্যা হ'য়ে গেল, উপুড় হয়ে চিৎ হয়ে হিংসুটে মেয়েদের মুখ বুড়ীর মতন থমথমে করে দিলো। যখন সে দু'হাতে জলে কেটে তরতরিয়ে এগিয়ে যায়, তার অনাবৃত পিঠে সূর্যের আলো চিক চিক করে। আবার যখন সে চিৎ সাঁতারে ভাসমান, তার পৃথুল ভেজা বুকে নীল কেলেঙ্কারি। কখনো বা সে অতিকায় মাছ—ডুব দিয়ে তলিয়ে গেল, আর ওঠেনা, ওঠেনা···। এই দামাল মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ক্রমশই বেদম সারভিনি, সে যেন একটা মধ্যাহ্নের পাপ গল্পের এক অসহায় সাক্ষী—নিজের অক্ষমতায় রাগ হচ্ছে তার। না, জোয়েতের দোষ নয়, আমিই বয়সের কামড়ে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছি।

জলের বুকে জলপদ্মের মতন দেহ ভাসিয়ে জোয়েত তাকিয়ে আছে ঝলসানো নীল আকাশের দিকে। সারভিনি চোখ সরিয়ে নিতে পারে না, আবার তার দৃষ্টি লুব্ধ—সিক্ত চিক্কণ তনু, জলের কৃপায় ওর দেহের মূল্যবান রেখাগুলি অনেক স্পষ্ট। কেবল এই রূপ দিয়েই জোয়েত একদিন দুনিয়া জয় করতে পারবে—বহু কৃতিমানুষ নিঃশব্দে নতজানু হয়ে তার অনুগ্রহ চাইবে।

অনিবার্য কামনায় ছটফটিয়ে ওঠে সারভিনি, যদিও ঐ পানকৌড়ি-সঙ্গিনীকে নিয়ে তার কি করণীয়, ভেবে উঠতে পারছে না।

সেই সময় জোয়েত ধীরে ধীরে চলে এলো সারভিনির খুব কাছাকাছি। ওর লাল টুকটুকে হ্রস্ব পোশাক যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

অদূরে সন্তরণরত এক যুবক কি যেন বলে ওঠে এবং জোয়েত তাকে ছুঁড়ে দেয় এক টুকরো আহ্লাদী হাসি। তারপর সারভিনির দিকে চেয়ে বলে উঠলো, "ভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে আছো। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? চুক-চুক-চুক···প্রিয় মাস্কেদ, স্নানের পর তোমার মাথা, যার আধখানা চকচকে, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে।"

বিদ্রূপের চাবুক খেয়ে তেতে উঠলো সারভিনি। এতক্ষণের অক্ষম আক্রোশ ও ব্যর্থ কাম তার ভেতর একটা তেজালো সামর্থ্য এনে দিলো, তার বন্যভাব ও হিংস্রতা এক সঙ্গে গর্জন তোলে ঃ জোয়েত!

স্বরের তীব্রতা বেমানান। কেউ কেউ চমকে তাকালো

জোয়েত কিন্তু ঠোঁট উল্টে হাসলো, "তুমি ফতুর হয়ে যাচ্ছো।"

মরীয়া হ'য়ে সারভিনি বললো, "এই জীবনটাই বুঝি তোমার কাম্য?"

জোয়েত উদ্ধত সরলতায় বললো, "কোন জীবন?"

"ন্যাকামি করো না। আজ আমি স্পষ্ট তোমাকে চিনতে পারলাম। এই জন্যই বুঝি এখানে আসবার জন্য রক্ত উথাল পাথাল করছিল?"

"কি বলছো?"

"ঠিকই বলছি। আমার কথা ঠিকই বুঝতে পারছো।···ঢের হয়েছে, এবার পোশাক বদলে ফিরে চলো।"

স্নানের পোশাক জমা দিয়ে এসে জোয়েত আবার সারভিনিকে বললো, "তুমি আমার কথায় রাগ করছো। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সারভিনি জোয়েতের বুকের দিকে তাকালো। সত্যি কি ওখানে সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাম ভাব জেগেছিল? তবে কেন কাল রাতে?··· সন্দেহ ও দুর্বোধ্যতায় একটা তীব্র আনন্দও অনুভব করে সারভিনি।

খুব দ্রুত ভাবান্তর ঘটে যাচ্ছে তার। মস্তিষ্ক ঠিক ঠিক কাজ করছে না কেন? প্রকাশ্যে বললো, "অনেক ফুর্তি তো হলো, এবার ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে চলো।"

"কিছুই বুঝছিনা ছাই।"

"খুব বোঝ। তবে একথা জেনে রেখো, আমি তোমাকে ছাড়বো না।"

"কি করবে আমাকে নিয়ে?"

"কেন, কাল রাতেই তো টের পেয়ে গেছো, আমি কি চাই।"

"কি চাও? এ মা, আমি একদম ভুলে গেছি।"

"ভুলে গেছো? ঘটনার সারার্থ হলো, আমি তোমাকে প্রেম জানাবো।"

নিঃসাড়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলো জোয়েত, মাটির দিকে চোখ রেখে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি, মাস্কেদ?"

"হুঁ, আমিই।"

কেমন যেন ভয়ে শাদা হ'য়ে গেল জোয়েত, "বিশ্বাস করি না।"

"ভগবানের দিব্যি।"

"প্রমাণ দিতে পারো?"

"এর চেয়ে বড় প্রমাণ আমি দিতে চাই না।"

"না, প্রমাণ দিতে হবে।"

"কাল রাতে সেই সময় প্রমাণ চাইলেই পারতে। অনভ্যাসের দরুণ তোমার হয়তো কষ্ট হতো। কিন্তু ঐ কষ্ট হচ্ছে অগাধ আনন্দের সোপান।"

জোয়েতের মৃদুস্বর, "কাল রাতে তোমার বাসনা আমি ধরতে পারিনি। তবে আমার ভেতর অগাধ অসহায় ভয় ঠিকই ছিল।"

সারভিনি বিরক্তি প্রকাশ করে, "যত সব বাজে কথা।"

জোয়েত হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকায় সারভিনির মুখের দিকে, পরিষ্কার উচ্চারণ করলো, "এ কথাগুলি কেবল আমাকে বললেই হবে না। আরো একজনকে জানাতে হবে।"

সারভিনি একটু থমকায়, "আর কাকে জানাতে হবে ?"

"অবশ্যই আমার মাকে।"

একটা পাথরচাপা পাখি বুঝি ডানা ঝাপটালো। সারভিনির ভেতর হুঁশিয়ার শয়তানটা সজাগ হয়ে ওঠে। বৃদ্ধবর সেভেল তবে ঠিকই বলেছিল। নাচাতে নাচাতে বিয়ের ফাঁদ অব্দি। না, জোয়েত, তুমি যতটা সরলতার ভান করো, আসল রূপ তোমার তা নয়।

প্রকাশ্যে সারভিনি বাঁকা হাসি হাসে, "তোমার মাকে! শর্তটা খুব বড় হ'য়ে যাচ্ছে না কি ?"

সারভিনির উত্তর শুনে বিবর্ণ হয়ে গেল জোয়েত। তাকে বুঝি ছুঁড়ে দেওয়া হলো অসীম আকাশ থেকে একটা ছোটখাটো পাথুরে পরিমণ্ডলে, যার অন্য নাম বাস্তব। তার উন্মার্গগামী পুরুষসঙ্গী শেষাবধি দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সারভিনির মুখের দিকে চেয়ে বললো, "মাস্কেদ, তুমি যদি ভালোবেসে আমাকে বিয়ে করতে চাও, মায়ের অনুমতি তোমাকে নিতেই হবে!"

সারভিনির মনে হলো, দুই থাবায় জোয়েতের উদ্ধত মুখটা চেপে ধরে। তার মনে হলো, জোয়েত অতিরিক্ত স্পর্ধা দেখাচ্ছে। আর তার নিজেরও এই মেয়েটির মনস্তত্ব বুঝতে ভুল হয়েছিল। রহস্যের কালো ঢাকনাটা খুলে যেতেই ভয়ঙ্কর ও অবাস্তব সাপটা ফণা তুললো।

মেজাজ হারিয়ে গর্জন ক'রে উঠলো সারভিনি, "তুমি কি আমাকে তোমার আর সব চাটুকারদের মতন গর্দভ মনে করো নাকি ? তোমার চালাকি আমি ঠিকই বুঝি।"

"এতে তুমি চালাকির খোঁজ কোথায় পেলে ?"—জোয়েতের স্বর অনেকটা করুণ, অসহায়।

সারভিনি আরো হিংস্র হয়ে উঠলো, "জোয়েত, তোমার ক্রমাগত ন্যাকামি এক ঘেয়েমির মতন লাগছে। যতই সরল কিশোরীটি সাজবার চেষ্টা করো না কেন, ওসব আর তোমায় মানায় না। আমি তো

আমার কথা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছি,—তোমার প্রতি আমার প্রেম অটুট। এ কথাটা নিশ্চয় বোঝ। সেই সঙ্গে এই বাস্তববোধও নিশ্চয় তোমার আছে, আমাদের প্রেম মানে গির্জায় গিয়ে হাজির হওয়া নয়।"

এর চেয়ে রূঢ় আঘাত জোয়েত কখনো পায় নি। সে টকটকে মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সারভিনির দিকে। নিজেকে খানিকটা সংযত ক'রে মৃদু হাসবার চেষ্টা করে সারভিনি। কিন্তু ততক্ষণে আহত জোয়েত দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। একটা খিঁচ ধরা যন্ত্রণা মুহূর্তে তার শরীরময়। সারভিনি তাকে ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করতেই সে ছুটতে আরম্ভ করে। কিছু ক্লান্তি আর উদ্বেগ নিয়ে পিছনে চিত্রার্পিত সারভিনি শুনতে পেলো, জোয়েত ছুটতে ছুটতে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বাগানে প্রজাপতিরা ঢুকছে, উড়ছে, ফুলে-ফুলে বসছে। অনেকটা যেন প্রজাপতিরই খোঁজে প্রথমে বাগানে এলো, সেভেল, তারপর মারসিঅনেস। মনে মনে গত দু'দিন যাবৎ যে নিষেধের পরোয়ানা ছিল, তা অনেক শিথিল হয়ে পড়েছে। মারসিঅনেসের দুটি চোখ বুঝি কাঁচপোকা, নিঃশব্দে ফুলের সমারোহ দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে সেভেলের হাতে নিজের হাত গুঁজে দেয়, খুব মৃদু স্বরে বলে, "ব্যারণ।"

"হুঁ।"

"খুব নিরিবিলি…।"

"সুন্দর ও নিরিবিলি বাগানে তুমি একটি পরী…।"

মারসিঅনেসের ভিতর তৃপ্তি পাক খায়। একটি দারুণ স্বাস্থ্যবান যুবক তার হাতে ক্রমশই তীব্রভাবে চাপ দিচ্ছে। গত রাত থেকেই মনে মনে তারা সাহস সংগ্রহ করেছে, ঘনিষ্ঠতর থেকে ঘনিষ্ঠতম হবার উদগ্র বাসনায় মারসিঅনেস বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে, আর সেভেল সারাটা রাত বিনিদ্র অবস্থায় বাগানে ও নদীর ধারে পায়চারি ক'রে বেড়িয়েছে। সুতরাং ঘটনা ঘটবেই। অভিজ্ঞা মারসিঅনেস অনেকদিন পর

সত্যিকারের রোমাঞ্চ অনুভব করছে। সেভেল বক্তৃতার ঢঙে মোটা ঘাড় সমেত মাথাটা দোলাচ্ছে। কোন রকম চাটুবাদ আর দম্ভ নেই লোকটার —মারসিঅনেস প্রকৃতই মুগ্ধ। বাইরে পৃথিবী নিঃসাড়, মুমূর্ষু। হাতে হাতে বেষ্টনী রচনা করে কেবল এরা দু'জনেই সুন্দর বেঁচে থাকতে চাইছে। গোলাপ কাঁটার স্পর্শ এড়িয়ে মারসিঅনেস ঠিক সেভেলের পাশে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু ঠিক এখনই অদূরে সারভিনি—

ক্লান্ত, কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত সারভিনি আসছে।

মারসিঅনেস কিন্তু সরে গেল না। সারভিনি কাছে এলে বললো, "কি ব্যাপার? রোদে ঘোরাঘুরি ক'রে জোয়েত তো অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। মুখচোখ লাল। বিছানায় পড়ে আছে। একটু দেখে এসো। তখনই বারণ করেছিলাম, রোদে টো টো করিস না। কে কার কথা শোনে। আর তোমারও বাপু বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।"

জোয়েত ডিনার খেতেও এলো না।

জানিয়ে দিলো, তার খিদে নেই এবং সে একটু একা থাকতে চায়।

রাত দশটার ট্রেন ধরে সেভেল ও সারভিনি ফিরে গেল। যাবার আগে জানিয়ে গেল, আগামী বৃহস্পতিবার আবার তারা মানিকজোড়টি হ'য়ে ফিরে আসবে।

…ওদের বিদায় দিয়ে শিথিল দেহ এলিয়ে খোলা জানালার সামনে একাকী বসে রইলো মারসিঅনেস।

বিচিত্র দিনটা হিম-নির্জন রাতে পরিণত হলো। এখন মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখছে বিষণ্ণতা। এখন নিজের মুখোমুখি হবার লগ্ন।

গ্রেনোইলের নাচ-গানের হিল্লোসিত শব্দ তরঙ্গ বাতাসের হাত ধরে ভেসে আসছে এতদূর অব্দি।

সারাটা জীবন ধরে প্রেম প্রেম ছলনা আর শরীর বিলিয়ে এসেছে যে অনন্ত যৌবনা অশ্বশক্তিসম্পন্না নারী, সেই বহুবল্লভা মারসিঅনেসের

মনেও একটা বিষাদ, শূন্যতা পাক খায় ; ক'দিন যাবৎই সে ভয়ঙ্করভাবে কামনা করেছে শক্তিমান পুরুষ সেভেলকে। এই রকম কামনায় যখন সে জর্জরিত হয়, মারসিঅনেস তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারে না,—তখন তার পুরুষ চাই-ই।

সে জন্ম গণিকা। নিজের অফুরাণ কাম-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে ; শুরু করেছিল সমাজের নিম্নতল লোকদের নিয়ে, ক্রমশ আকর্ষণ করতে পেরেছে সমাজের ধনী-মানী সম্ভ্রান্তদের। এ ব্যাপারে সে পশুসুলভ শক্তি ও বুদ্ধির অধিকারিনী, বিবিধ প্রকার চুম্বন ও সঙ্গম-রীতিতে যে কোন পুরুষকে পাগল করে দিতে পারে। অজস্র পুরুষ আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে দৈহিক মিলনে তৃপ্ত হয়েছে, অজস্র পুরুষ! কিন্তু মারসিঅনেস কখনো কারুর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েনি, আবার কারুর প্রতি বিরূপও হয়নি। এই সহজাত নির্বিকারত্ব শ্রেষ্ঠ গণিকার মানসিকতা। মুসাফির যেমন সরাইখানায় ঢুকে খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার করে না, মারসিঅনেসও তেমনি সঙ্গী নির্বাচনে কখনো খুঁত খুঁতে নয় ; যার পুরুষাঙ্গ আছে, সেই কাম্য। সে জানে, এটাই তার জীবিকা এবং জীবিকার জন্য বিভিন্ন রুচির মানুষকে সম সঙ্গম তৎপরতার সঙ্গেই গ্রহণ করতে হবে। তার চিত্ত সদাই প্রসন্ন, অসীম তার ধৈর্য।

তবু ব্যতিক্রম আছে বৈকি। কোন কোন অতিকায় পুরুষ সময় সময় তার নিস্তরঙ্গ রক্তেও তুফানবার্তা বয়ে আনে। সে তখন সত্যি জ্বলে ওঠে, অসহ্য সুখে সে জ্বলতে থাকে, এবং কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে স্বর্গীয় বিরহে কষ্ট পায়। তার ঐ নিরেট ব্যবসায়িক মনেও স্বপ্ন ও কল্পনার জাল বিস্তারিত হয়। তখন সে মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনা করে, আকাশভরা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে সারাটা রাত জেগে বসে থাকে, তার প্রাজ্ঞ মনেও রং লাগে। তেমনি এক পোচ রং দাগিয়ে দিয়ে গেল সেভেল। সেভেল এখনো তাকে বিছানার ওপর তুলে নেয়নি। কিন্তু ওর মধুর আচরণ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষালী চেহারা মারসিঅনেসের মনে

যুগপৎ প্রেম ও কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সেভেলের ভাবনায় মারসিঅনেস এখন বিভোর।···

পিছনে কার পায়ে শব্দ। কয়েকটা আয়না, পারস্যদেশীয় শ্বেত পাথরের টেবিল, দামী কার্পেট ইত্যাদি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে এলো। মা মুখ ঘুরিয়ে মেয়েকে দেখলো। ঠিক যেন তারই মতন বিষণ্ন শিথিল যৌবনা জোয়েত জানালায় ভর দিয়ে উদাসী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আকাশের পানে। ওর পোশাকগুলি কেমন যেন বহু ব্যবহারে নোংরা, দুই চোখ ক্লান্তিতে রক্তাভ।

জোয়েত আবার এসে মার কাছে দাঁড়ালো, গম্ভীর গলায় বললো, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে, মা।"

মারসিঅনেস চমকালেন। এই কন্যা তার বড় গর্বের বস্তু। এক প্রবাসী সুদর্শন বিত্তবান ইংরেজের চুইয়ে নামা মধু সংগ্রহ করে মারসি-অনেস ওকে তিল তিল ক'রে তিলোত্তমা বানিয়েছিলে। তাই এই স্নেহে, মমতায়, অহঙ্কারে কোন খাদ নেই। কিন্তু তবুও কন্যার প্রতি তার স্নেহ যথার্থ নিঃস্বার্থ নয়। সমস্ত ইতস্ততা অতিক্রম করে জোয়েত যে ক্রমশই তার ব্যবসায়ের মূলধন হ'য়ে উঠছে। এই রেশমী চুল রূপসী মেয়েকে সামনে রেখে চলছে তার নিজের পড়তি যৌবনের ছলা-কলা। আরো কিছুদিন পরে অস্পষ্ট চাঁদের রেখা আরো স্পষ্ট হবে—স্বয়ং জোয়েত রপ্ত করে নেবে মার সমস্ত যাদুমন্ত্রগুলি। এবং তখনই মারসিঅনেসের মুক্তি। আর! মুক্তি—মুক্তির কথায় যেন কতগুলি শিশুফুল তাকে ছুঁয়ে গেল। সে শিউরে উঠলো। সে প্রৌঢ়া হবে, বৃদ্ধা হবে, শারিরীক আস্তরণে ফাটল ধরবে···সে তখন পালাবে, সুইজারল্যাণ্ডের কোন বরফ কঠিন আবাসে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করবে আমৃত্যু।

মারসিঅনেস বললো, "বলো।"

জোয়েত দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, "আজ কিছুক্ষণ আগে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে।"

"কি ঘটনা?"

"মঁসিয়ে দ্য সারভিনি বললো, সে নাকি আমার প্রেমে পড়েছে।"

মারসিঅনেসের বুকের ভেতরটা দুলে ওটে। সেই লগ্ন-কাল আগতপ্রায়। জোয়েতের অভিষেক হবে এবং বানপ্রস্থে যাবে মারসি-অনেস।

খুব ফিস ফিসিয়ে, মেয়ের কানের কাছে মুখ এনে মারসিঅনেস জিজ্ঞেস করলো, "কথাটা সে কিভাবে পাড়লে?"

জোয়েত মার পায়ের কাছে বসে, নরম আদুরে গলায় বললো "ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।"

বিস্ময়ে টান টান মারসিঅনেস জোয়েতের চিবুকে হাত ছুঁইয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "সারভিনি! সারভিনি এ কথা বলেছে! তোমার মাথা খারাপ হয় নি তো?"

জোয়েতের দৃষ্টি কঠিন হ'য়ে আসে। গভীর অনুসন্ধিৎসায় সে তার মায়ের মুখের ভাষা পড়তে থাকে অসহনীয় তীব্রতায়। তারপর ভীষণ গম্ভীর অপরিচিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, "আমার মাথা খারাপের কি লক্ষণ তুমি দেখলে? মঁসিয়ে দ্য সারভিনি কি আমার পানিপ্রার্থী হতে পারে না?"

প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় ঈষৎ হকচকিয়ে গেলো মারসিঅনেস, তারপর নিজের স্বরে মহানুভবতার স্বাদ এনে বললো, "তোমার কোথাও ভুল হয়েছে, বাছা। হয়তো তুমি শুনতে ভুল করেছো অথবা, সারভিনির বক্তব্য ধরতে পারোনি। শোন, মঁসিয়ে দ্য সারভিনি প্রকৃতই বনেদী ধনী পরিবারের ছেলে; আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওরা প্যারিসের গোঁড়া পরিবারভুক্ত। সে কখনো তোমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিতে পারে না।"

জোয়েত কোনক্রমে উঠে দাঁড়ালো, তাকিয়ে থাকলো বাগানের দিকে, যেখানে পরতে পরতে লুটিয়ে পড়ছে চাঁদের আলো। অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করলো, "কিন্তু ও যে বললো, আমাকে ভালোবাসে।"

মারসিঅনেসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, "ছাখো, প্রেম-ভালোবাসা—এই সব শব্দের অর্থ এক একজনের কাছে এক এক রকম। সময় ভেদে, পাত্র-পাত্রী ভেদে এদের অর্থও বদলায়। তাই কেউ যদি তাৎপর্য ধরতে ভুল ক'রে বসে, তাকে দুঃখ পেতে হবেই। আসল কথা এ ধরণের অলীক রূপকথাকে বুকে পুষে রাখবার মতন অপরিণত বয়স ও বুদ্ধি নিশ্চয় তোমার নয়। সারভিনি নিজের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তার বিয়ে হবে সেই রকম মেয়ের সঙ্গেই, যার অর্থ-প্রাচুর্যের সঙ্গে পারিবারিক সুনামও প্রচুর। তোমার রূপ আছে, আমার অর্থও আছে, কিন্তু সুনাম?···সারভিনি যদি তোমাকে প্রেমের কথা বলে থাকে, তবে তার অর্থ বিবাহ নয়, তার অর্থ—"

মেয়েকে আর খোলাখুলিভাবে বলতে পারলো না মারসিঅনেস! একটু থেমে বললো, "মাথা গরম না করে এখন শুতে যাও। আমি একটু একলা থাকতে চাই।"

জোয়েত তার উত্তর পেয়ে গেছে। সে শান্তভাবে তার মার কপালে চুমু খেয়ে বিদায় নেয়। মারসিঅনেস কিন্তু মেয়ের পিছন পিছন তার শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, "তোমার শরীর এখন ভালো লাগছে তো?"

ভেতর থেকে জবাব এলো, "শরীর আমার সব সময়ই ভালো। শুধু ঐ জিজ্ঞাসাটার কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"এ সম্পর্কে তোমাকে আরো কিছু বলবো। কিন্তু এখন থেকে আর সারভিনির সঙ্গে নির্জনে একাকী বেড়াতে যেও না।···একটা কথা নিশ্চিত জেনে রেখো, ও তোমাকে কোন দিনই স্ত্রীর মর্যাদা দেবে না। ···ও যা চায়, তার তাৎপর্য ভিন্নতর।"

মায়াকে আকারে ইঙ্গিতে সারভিনির উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে স্বস্থানে ফিরে এলো মাদম মারসিঅনেস।

জীবনে সব রকম দুঃখবোধকে সে দু'হাতে দূরে সরিয়ে রাখতে

চেয়েছে, আজো চাইছে। এই কারণেই তার অপরূপা মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো মন ভারাক্রান্ত করেনি। সে জানে, যত বড় রূপসীই হোক না কেন, জোয়েতের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই—সে গণিকার মেয়ে!

খুব বরাতজোর না থাকলে এই ধরণের মেয়ের কখনো ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ঘরে বিয়ে হতে পারে না। এবং মারসিঅনেস এই ধরণের স্বপ্নবিলাসকে প্রশ্রয় দিতে ভালোবাসে না। তার কাছে সত্য অতি নির্মম। সে জানে, একদিন জোয়েতও তার মার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। জ্বালাময়ী রূপ নিয়ে সে তার খদ্দেরদের উন্মাদ করে দেবে।

তবু—তবু মারসিঅনেস সরাসরি তার মেয়েকে এই কথাগুলি বলতে পারেনি। লজ্জা ও দ্বিধায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শত হলেও সে যে মা। জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সারভিনির মতন পুরুষকে চিনতে তার মোটেই অসুবিধে হয় না।

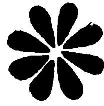
মধুলোভী মক্ষিকাদের সনাক্ত করতে তার ভুল হবে কেন? শয়তান! বিয়ে করবে! সেই পুরনো চাল!

কিন্তু তার সরল মেয়েকে কি ভাবে সাবধান ক'রে দেওয়া যায়? মনের দিক থেকে ও যে এখনো শিশু!

ভাবতে ভাবতে মারসিঅনেস ছটফটিয়ে উঠলো। ঠিক করলো, এদের গতিবিধির ওপর এবার থেকে সে কড়া দৃষ্টি রাখবে! তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। দরকার হলে সারভিনিকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতেও সে দ্বিধা করবে না।

কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কিছুই স্পষ্ট করে ভাবতে পারলো না মারসিঅনেস। তার ক্লান্তিবোধ বাড়ছে। আবার সে ডুবে গেল সেভেলের ভাবনায়। আহ! কী সুন্দর যুবক। কবে সুযোগ আসবে তাকে একান্ত করে পাবার?

তারকাখচিত আকাশের দিকে দুই হাত প্রসারিত ক'রে মারসিঅনেস উচ্চারণ করলো: আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি!



সেই রাতটা জোয়েতের কাছেও বিনিদ্র।

তার মায়ের মতন সে-ও খোলা জানালার সামনে উবু হ'য়ে বসে আছে। দু'চোখ বেয়ে টপ টপ জল গড়াচ্ছে। জীবনে এই প্রথম মানসিক যন্ত্রণায় চোখের জল ফেলছে সে। দুঃখ কাকে বলে এযাবৎ সে জানতো না। আজ আত্মবিশ্লেষণে বসে সে দেখতে পেলো, তার জীবনে কোন আলো নেই, সবটাই নিকষ অন্ধকার। তার মানসিক অপরিপক্কতার জন্যই এতদিন সে এই কঠিন বাস্তব সম্পর্কে অচেতন ছিল।

মার আসল ভূমিকার কথা সে কখনো ভেবে দেখেনি। সে পেয়েছে চারপাশে প্রাচুর্য, বহু সুপুরুষের চাটুকারিতা। আজন্ম সে দেখে এসেছে, তার মার সঙ্গে খাতির যতসব অতি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিবারের লোকদের, যাদের আদব-কায়দা অনন্য। তারা সসম্মানে চুমু খাচ্ছে তার মার হাতে। তারা সকলেই এমন ঢঙে কথা বলে যেন তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ওদের মধ্যে কারা যে প্রকৃত নীলরক্তের, কে তাকে বুঝিয়ে বলবে?

নেহাৎ কিশোরী জোয়েত! বেচারি জোয়েত! গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে তার মার মতন পোড় খাওয়া জীব নয়, লোকচরিত্র সম্পর্কে তার ধারণা শূন্য। এ যাবৎ তার জীবনযাত্রা ছিল প্রবহমান সুখে পরিপূর্ণ, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত।

আর আজ সেই সুখ ও বিশ্বাসের আসন টলে গেছে।

সারভিনির একটি মাত্র বিদ্রূপাত্মক উক্তিতে সে আতঙ্কগ্রস্ত।

জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যয়পূর্ণ প্রতীতি ধ্বসে পড়ছে।

কানের কাছে বাজছে সারভিনির সেই হিংস্র কথাগুলি :

"তুমি কি আমাকে আর সব চাটুকারদের মতন গর্দভ মনে করো

নাকি ?···তোমার প্রতি আমার প্রেম অটুট, কিন্তু তাই বলে তোমাকে বিয়ে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না ··”

কেন ?

কোন অধিকারে সারভিনি তাকে এমন অপমান করে গেল ?

নিশ্চয় এর পিছনে কোন গূঢ় লজ্জাকর ইতিহাস লুকিয়ে আছে, যা জোয়েত এখনো জানে না।

কি সেই লজ্জাকর ঘটনা ? নিজের সর্বাঙ্গে যেন প্রচ্ছন্ন কলঙ্কের কালিমা দেখতে পাচ্ছে জোয়েত। অনুভব করে, সারভিনি তার সঙ্গে কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সন্দেহ, ভয়, দুঃখ, জ্বালা এসে বিভ্রান্ত করে, জোয়েতের দু'চোখ বেয়ে লোনা জল গড়াতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় তার বুকখানা হাল্কা হয়ে গেল। আর কোন বিশেষ দমবদ্ধ করা অনুভূতি তাকে দুর্বল ক'রে রাখলো না। নিজেকে সে কল্পনা করলো সেই সমস্ত উপন্যাসের নায়িকাদের সঙ্গে, জীবন-যন্ত্রণায় অশ্রু মুক্তাবিন্দুর মতন ঝরে পড়ে, আবার যন্ত্রণা শেষে যারা নতুন সুখের সন্ধান পেয়ে যায়।

ইত্যাকার স্বপ্নে মশগুল হ'য়ে পড়লো জোয়েত। সে তখন পুরোপুরি রূপকথার জগতে। দারুণ এক সুখানুভূতি উদ্দীপ্ত করে তুলছে তাকে। সে কি কোন রাজপুত্রী ? নিশ্চয় ! সম্ভবত ইতালীর সম্রাট ভিক্টর ইমানুয়েল একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন তার মার রূপে ; রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে অন্য এক রমণীয় স্থানে সরিয়ে রেখেছিলেন তার মাকে। তারপর সম্রাটের ঔরসেই জন্ম নিলো একদিন ফুলের মতন ফুটফুটে শিশু—জোয়েত !

অথবা, জোয়েত হলো এক বিখ্যাত দম্পত্তির অনাকাঙ্খিত সন্তান, —মারসিঅনেস যাকে কুড়িয়ে এনে মাতৃ স্নেহে লালন করেছে। আরো অনেক অলীক কল্পনা ঝর্ণার জলের মতন সিক্ত করছে জোয়েতের মনকে।

সুখকর বিষণ্ণতায় তৃপ্তি পাচ্ছে সে। এক মহান রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের

মহিয়সী নায়িকা হিসেবে ভাবছে সে নিজেকে। সে যেন স্ক্রাইব অথবা, জর্জ সান্দ-এর সৃষ্ট নায়িকা।

চোখ বুজলো জোয়েত।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তার সুখস্বপ্ন অন্তর্হিত। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সুন্দর কল্পনাকেই সে মনের পর্দায় টেনে আনতে পারছে না।

রাতের বয়স অনেক। প্রায় বাসি হ'য়ে গেল রাতটা। হাড় কাঁপানো হিমেল বাতাস বইছে।

পরদিন সকাল থেকেই জোয়েত খুব গম্ভীর। খুব সতর্কতার সঙ্গে সে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছে। গোয়েন্দাসুলভ তার সন্দেহ বাতিক। আর কোন অবাস্তব কল্পনা তথা ভাবলুতাকে সে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। সে যেন কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তমাম দুনিয়ার বিরুদ্ধে যেন চলছে তার নীরব প্রস্তুতি। মনে মনে বিড় বিড় করছে, "আমি একা। আমার আপন বলতে কেউ নেই।"

সারভিনি ও সেভেল এলো সকাল দশটায়।

জোয়েত এতটুকু উৎফুল্ল হোলো না। শুষ্ককণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করলো সারভিনিকে, "সুপ্রভাত। ভালো আছো?"

সারভিনি মনে মনে ভাবলো—জোয়েত এখন আবার কি খেলা দেখাবে, কে জানে। প্রকাশ্যে স্মিত হেসে বললো, "সুপ্রভাত। তুমি ভালো তো?"

মারসিভানেস যথারীতি এগিয়ে গিয়ে সেভেলের হাত ধরেছে। সারভিনিও জোয়েতের একখানা হাত ধরে। তারা গোলাকার বাগানে পায়চারি করতে থাকে। সময় সময় ঝোপের আড়ালে যে কোন যুগল মূর্তি আড়াল হয়ে যায়।

সারভিনি চোখা চোখা বিশেষণ সমেত কথার তুবড়ি কাটাচ্ছে;

জোয়েতের মুখে কিন্তু রা টি নেই, চোখ ছুটো এখনো বড় বড়, ঈষৎ বিষণ্ণতা সত্ত্বেও উজ্জ্বল ও নিষ্পাপ। হাঁটতে হাঁটতে, কথা বলতে বলতে ঘেমে যাচ্ছে সারভিনি, তার ঘামে বিয়ারের গন্ধ। অনামিকায় পাথর বসান আংটিটা একটু খুঁটে হঠাৎ জোয়েত প্রশ্ন ক'রে বসলো, "তুমি কি সত্যিই আমার বন্ধু, মাস্কেদ ?"

"নিশ্চয় মামজেল।"

"খাঁটি বন্ধু ?"

"নিখাঁদ, বান্ধবী। এ নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমার যথাসর্বস্ব তোমাতে নিবেদিত।"

"তুমি আমাকে কখনো মিথ্যা বলবে না ?"

"শপথ করতে পারি।"

"অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা বলবে ?"

"বলবো !"

"বেশ। প্রিন্স ক্রাভালো সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ? ঠিক ঠিক ক'রে বলবে।"

"হা ঈশ্বর।"

"এ যে মিথ্যা বলার প্রস্তুতি।"

"না মিথ্যা আমি বলবো না। শোন, প্রিন্স একজন রুশ, সত্যি ও রাশিয়ার লোক। ও জন্মেছিল রাশিয়াতে, বাড়িতে কথা বলে রুশ ভাষায়, বোধহয় পাশপোর্ট নিয়ে ফ্রান্সে ঢুকেছিল। এ অব্দি সবই সত্যি। কিন্তু মিথ্যা ওর নাম এবং 'প্রিন্স' উপাধিটি।"

জোয়েতের দৃষ্টি ধারালো হ'য়ে ওঠে, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, ও একজন—"

সামান্য দ্বিধার সঙ্গে সারভিনি বললো, "একজন সাধারণ ভাগ্যান্বেষী বলতে পারো।"

"ধন্যবাদ। কাভেলিয়ার ভলরেলিও নিশ্চয় ঐ দলেই ?"

"ঠিকই তাই।"

"আর মঁসিয়ে ছ্য বেলভিনো ?"

"ওর সম্পর্কে অবশ্য কিছুটা ভিন্ন কথা খাটে। ভদ্রলোক যদিও গোঁয়ার প্রকৃতির, এসেছেন কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে। তবে ঐ—রূপের আগুন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁর পাখা পুড়ে ছাই। শোনা যায়, স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতক তাই তাঁকে এমন লম্পট করেছে।"

জোয়েত এবার সরাসরি সারভিনির মুখের ওপর দৃষ্টি মেলে ধরে জিজ্ঞেস করলো, "আর তুমি নিজে ?"

হো-হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সারভিনি। হাসি থামলে দরাজ গলায় নির্দ্বিধায় আত্মপরিচয় দিলো, "আমার কথা বলছো, সুন্দরী ? সোজা উপমায় বলা চলে, আমি আদরে আদরে অতি যত্নে পরিপুষ্ট একটি স্বাধীন দিলখুস্ কুকুর। বনেদী ঘরের অবিবাহিত যুবক, পয়সা অবসরও প্রচুর। ফুর্তি-টুর্তির ধাক্কায় তার বর্তমান মগজটি ব্যয়িত হচ্ছে, হরেক রকম অপকর্মে শরীরের, তাগাদও অনেক হ্রাস পেয়েছে। তবে এ সবের বিনিময়ে সংগৃহীত হচ্ছে অভিজ্ঞতা, যার সাহায্যে আমি অনেক মিথ্যা সংস্কারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। অভিজ্ঞতার জোরেই আমি স্ত্রীলোকদের বিশেষ কতগুলি একঘেয়েমিকে সহ্য করতে শিখেছি, শিখেছি অনেক বাজে অপাংক্তেয় লোকদের সঙ্গেও মেলামেশা করতে। এখনো আমার ভেতর সময় সময় সততা বোধ প্রবল হ'য়ে ওঠে, তুমি হয়তো খেয়াল ক'রে থাকবে। আর এখনো কোন মেয়েকে বিশেষভাবে ভালোবাসার সক্ষমতা আমার রয়েছে, হয়তো তুমি এরও পরিচয় পেয়ে থাকবে। এই সমস্ত দোষ ও গুণের মানুষ আমি আজ তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ব্যস, আমার আর নিজের সম্পর্কে কিছু বলবার নেই।"

এত কথা শুনবার পরও জোয়েতের মুখে হাসি নেই। গম্ভীর ভাবে সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবছে সারভিনির সদ্য উচ্চারিত কথাগুলিকেই।

হঠাৎ জোয়েত জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, কাউন্টেস্ লামিয়েকে তোমার কেমন লাগে ?"

"কোন মেয়ে সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়ো না।"

"কোন মেয়ে সম্পর্কেই নয়?"

"না, কারুর সম্পর্কেই নয়।"

"অর্থাৎ, ওদের সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই খারাপ। কিন্তু কোথাও কি কোন ব্যতিক্রম তোমার চোখে পড়েনি?"

সারভিনি বেপরোয়াভাবে জবাব দিলো, "হ্যাঁ, ব্যতিক্রম আছে বৈকি—আমার বর্তমান সঙ্গিনীটি হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম।"

জোয়েতের গালে ঈষৎ লালিমা লাগে, কিন্তু তার পরবর্তী প্রশ্ন স্পষ্টতর, "তবে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, আমার সম্পর্কে তোমার, কি ধারণা?"

"বলতেই হবে? বেশ, তবে শোন। তোমার সুন্দর রুচিবোধ আছে, কোন কোন ব্যাপারে তুমি যথেষ্ট তীক্ষ্ণধি, তোমার সাধারণ জ্ঞান প্রশ্নাতীত। কিন্তু তুমি অদ্ভুত ছলনাময়ী। অভিনয়ে পটু। অপরকে অপদস্থ ক'রে আঘাত দিয়ে তুমি আনন্দ পাও। টোপ ফেলে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে তুমি সক্ষম।"

"এই সব?"

"হ্যাঁ, এটাই তুমি।"

জোয়েত ধীরে ধীরে সারভিনির কবল থেকে নিজের হাতখানাকে মুক্ত করে। গম্ভীর গলায় বলে, "আমার সম্পর্কে তোমার সব ধারণাগুলিকেই বদলাতে হবে, মাস্কেদ।"

বলেই সে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায় তার মার দিকে।

আর তার মা মারসিঅনেস তখন অন্যজগতে। ফুলের কেয়ারির আড়ালে সেভেলকে নিয়ে ক্রমশই তার কামনা-বাসনা বিস্তারিত। মধুর আলাপন দিয়ে শুরু, তারপর হাতে হাত রেখে তারা বসে পড়ে। সেভেল ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, হাতে চাপ দিতে দিতে একসময় মারসিঅনেসের

হাঁটুর ওপর ছোট্ট চিমটি কাটে। মারসিঅনেস চাপা স্বরে হেসে ওঠে, "ব্যারণ, তুমি বড় দুষ্টু। আমার লাগে না বুঝি?"

"আমি তো তোমায় আরো অনেক বেশি কষ্ট দেবো বলে উন্মুখ হয়ে আছি" - সেভেল নিঃশ্বাসের স্বরে বললো।

"দেখা যাবে"—কিশোরী অভিমান যেন মারসিঅনেসের গলায়। রঙিন চশমার আড়ালে সে দেখছে সেভেলের লোমশ বুক, ঝাঁকড়া চুল এবং উদ্ধত দুই ব্যস্ত বাহু।

সেভেলের রক্তে উত্তেজনা বাড়ে। দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। মারসিঅনেসের হাঁটুতে চক্র আঁকতে আঁকতে সে ওর জানুতে হাত রাখে, মসৃণ কাপড়ের নীচে রয়েছে যে নরম মাংসল নারী শরীর, তাকে সে অনুভবের আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই সময় মারসিঅনেস একটু উবু হয় এবং সেভেলের দৃষ্টি দিশেহারা হয় তার অটুট সৌন্দর্যের আধার দুটি স্তনকে দেখে।

"তুমি-তুমি এখনো কুমারী।"

—সেভেল ফিস ফিসিয়ে ওঠে।

"ও ব্যারণ।"

সেভেল আর স্থির থাকতে না পেরে ওর বুকের দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু ঈপ্সিত লক্ষে তা আর পৌঁছাতে পারে না। কারণ, জোয়েতের দীর্ঘ ছায়া দু'জনের উপরই প্রলম্বিত।

দূর থেকেই এদের অন্তরঙ্গতা দেখে হোঁচট খেয়েছিল জোয়েত। তার মনে একটা সন্দেহ তীব্রভাবে ছোবল মারে। তার নিজের শরীরটাই অজ্ঞাত কোন বিরুদ্ধ শক্তিতে মোচড় দিয়ে ওঠে। এমন এক ধরণের তপ্ত অনুভূতিতে সে শিউরে ওঠে, যার কোন ব্যাখ্যা ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। অনুভূতিটা যেন বায়ুতাড়িত একখণ্ড মেঘ—ঝড়ের দাপটে এসেই সব অন্ধকার ক'রে দিয়ে চকিতে বিদায় নিলো।

খাবারের ঘন্টা যখন বাজলো, প্রকৃতি তখন ঝড়ের প্রত্যাশায় থম

থমে। গুমোট। বাতাস নেই। বিশাল একখণ্ড কালো মেঘে ঢাকা চরাচর। কফির কাপে ঠোঁট ভিজিয়ে মারসিঅনেস তার মেয়েকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো, "প্রকৃতির কী বিচিত্র সাজ। তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়ে এ সময় নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতে পারো।"

হিম দৃষ্টি মেলে কঠিন গলায় জোয়েত বললো, "না, আজ আর আমি বাইরে যাবো না।"

হকচকিয়ে যায় মারসিঅনেস, "আজ বরং একটু ঘুরেই এসো। তোমার শরীর ও মনের পক্ষে প্রয়োজন।"

অস্থির গলায় জোয়েত বললো, "না, আমি ওর সঙ্গে কোথাও যেতে চাই না। কারণটা নিশ্চয় তোমার অজানা নয়।

মারসিঅনেসের মনে পড়লো, জোয়েতকে সে-ই নিষেধ করেছিল, সারভিনির সঙ্গে একাকী কোথাও বেড়াতে যেতে; আসলে মারসি-অনেস এখন নিজেই প্রচণ্ড রকম নিরালা প্রত্যাশী। সেভেল তার লোভ প্রকাশ করেছে! মারসিঅনেসের শরীর এখন লাভাময়। একটু নির্জনতা পেলে এই বিকেল বেলাতেই সেভেলের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ শারীরিক বোঝাপড়াটা সেরে নিতে পারে। কতকাল এমন একজন যুবকের স্বাদ সে নিতে পারে নি! সময় বয়ে যাচ্ছে। এই লোক, এই রোমাঞ্চ আর বেশিদিন থাকবে না!

প্রকাশ্যে সলজ্জ দ্বিধার সঙ্গে সে বললো, "ঠিকই মনে করেছো আমার আবার যে আজকাল কি হয়েছে! কিছুই মনে থাকে না।

বহুদিন পর আপন তন্ময়তায় জোয়েত কাপড়ে সুঁই-সূতো দিয়ে ফুল তুলছে। তার নিজের ভাষায় এই কাজটি হলো 'জনকল্যাণকর' এবং সচরাচর সে এ কাজটি পছন্দও করে না। আজ কিন্তু সে শান্ত, অসীম ধৈর্য শিল্প-কর্মে নিবিষ্ট।

ইতিমধ্যে সারভিনি ও সেভেল সেখানে উপস্থিত হয়েছে। দুটো গোলাকৃতি চেয়ার টেনে নিয়ে পাশাপাশি দুই বন্ধু সিগ্রেট টানতে থাকে। নিস্তরঙ্গ মন্থর সময় যেন আর কাটতে চায় না। মারসিঅনেস ভেতরে

ভেতরে রীতিমতন অস্থির, জোয়েতটা আজ সব কিছু মাটি ক'রে দিচ্ছে। একবার সে সেভেলের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে কামনা মদির হাসলো। তারপর সারভিনিকে বললো, "ডিউক, তোমরা কিন্তু আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাবে। কাল সবাই মিলে লাঞ্চ খেতে যাবো শাতুর ফোরনাইজ হোটেলে।" চতুর সারভিনি মহিলার উদ্দেশ্য বিলক্ষণ টের পায়। মাথা হেঁট ক'রে অভিবাদন করে এবং সহাস্যে বলে, "আপনার ইচ্ছের বাইরে যাবার ক্ষমতা আমাদের নেই।"

আবার সেই নিরেট নীরবতা। ঝড়ের গুমোট সম্ভাবনায় ধুঁকতে ধুঁকতে অকালে শেষ হয়ে গেল দিনটা। ক্রমে ডিনারের সময় এলো ঘনিয়ে। কালো মেঘ ও ধূসর মাটি ছুঁই ছুঁই। বাতাসের ছিটে-ফোঁটাও নেই। ডিনার টেবিলেও সকলে নিঃশব্দ। কি যেন এক অস্বস্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই চারটি প্রাণীকে। কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। খাওয়া হ'য়ে যাবার পরও তারা অনেকক্ষণ বসে থাকে বারেন্দায়। মনে হয়, চারজনই নিজ নিজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে চায়, কিন্তু মুখ খুলতে কেউই যেন সাহস পাচ্ছে না।

হঠাৎ ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের বুক চিরে বজ্রপাত হলো কাছাকাছি কোথাও, প্রচণ্ড আলোর ছলকানিতে ধাঁধিয়ে গেল এদের দৃষ্টি। ব্রিজের ওপর দিয়ে বিশালকায় কোন যন্ত্র পেরিয়ে যাবার মতন ঘর্ঘর শব্দ ভেসে আসছে আকাশ থেকে। হঠাৎ জোয়েত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আমি শুতে চললুম। ঝড়কে আমার বড় ভয়।"

সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে সে চলে গেল।

এই ভিলার তোরণ-দ্বার-বারান্দার ঠিক ওপরেই জোয়েতের ঘর। ঘরের দরজায় ঠিক বিপরীত দিকে প্রকাণ্ড বাদাম গাছটা, যার পাতা চুঁইয়ে চুঁইয়ে সবুজ আলো নামছে। সারভিনি নীচে বসে সেই আলোতে বারেন্দায় দাঁড়ানো জোয়েতের দীর্ঘ ছায়া দেখলো। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈদ্যুতিক বিপর্যয়ে দপ্ ক'রে নিভে গেল সেই আলো।

বিচলিত হবার বদলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মারসিঅনেস। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—পৃথিবীতে এখন অন্ধকারের বড় প্রয়োজন ছিল! মুখে বললো, "সত্যি, ঝড়কে জোয়েত বড় ভয় পায়। ঝড় উঠলেই সে বিছানায় চলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে।"

এবার উঠে দাঁড়ালো সারভিনি, "অনুমতি দিন, আমিও শুতে যাই।"

মারসিঅনেসের হাতের পাতায় ঠোঁট ছুঁইয়ে সারভিনি বিদায় নিলো।

তারপর রহস্যময় কালিগোলা অন্ধকারে শুধু এরা দু'জন—সেভেল এবং মারসিঅনেস। বাতাসের দাপাদাপি সত্বেও সেভেল শুনতে পেলো, মারসিঅনেস দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তাকিয়ে আছে কিন্তু সামনের দিকেই। সেভেল নিঃশব্দে তার হাল্কা চেয়ারটা তুলে এনে মারসিঅনেসের পাশে বসে। ধীরে ধীরে হাত বাড়ায়। মারসিঅনেস তার হাত চেপে ধরে।

কিছুক্ষণ হাতে হাত কচলাকচলির পর হৃষ্টপুষ্ট বুক,···বুকের মোচড় ও ঘূর্ণন একসময় বাঁক নেয় কোমরের দিকে. মারসিঅনেসের কোমরকে সবেগে জাপটে ধরবার সময় চেয়ার থেকে প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিলো সেভেল···মারসিঅনেসই যেন সেভেলকে নিরাপদ রাখবার জন্য ওর ঘাড়ে বাহুলতা বিছিয়ে দেয়···তারপর সে যা করলো, সেভেল ও তার জন্য ঠিক এখনই প্রস্তুত ছিল না। বহু রঙ্গভূমিতে চরে বেড়াবার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে আস্তে আস্তে মারসিঅনেস তার দেহটাকে শিথিল ক'রে নেমে পড়লো বা, ঝুলে নেমে এলো মেঝেতে এবং তারপর বিপন্ন সেভেলের ক্ষীণ প্রতিরোধক উপেক্ষা করে ওর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দিল, শুরু হলো তার সরু সরু আঙুলগুলির সেই সব শিকারী কৌশল। সেভেল বুঝতে পারে, তার শরীরের সমস্ত রক্ত, সমস্ত শৌর্য গ্রহণ ক'রে প্রবলতর ভূমিকায় জমজমাট হ'য়ে উঠছে মারসিঅনেসের অতি সোহাগের

বস্তুটি। ফিসফিসিয়ে বললো, "বিদ্যুতের আলোয় আমি একে দেখবো সোনা, আমার সোনা!…"

এদিকে, উপরে বাতি নিভে গেলেও জোয়েত কিন্তু বিছানা নেয় নি। খালি পায়ে হিংস্র ভঙ্গীমায় সে পায়চারী করছে ব্যালকনিতে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ ও অভিব্যক্তি যেন মহাসুখে বিভোর প্রাণীদের প্রতি। মন্দা বাতাস, কখনো ঝড়, বিদ্যুৎ—একটা প্রচণ্ড প্রলঙ্করে এই পৃথিবী এই মুহূর্তে ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে না? নীতিকথা, বংশানুক্রমিক ধারা, সুন্দর সুন্দর কথা বলে মেয়েদের শরীর মাতানো, সমাজে সততার মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ানো, চেকনাই পোশাক পরে পয়সার গরম দেখানো – এত বড় একটা তাসের প্রাসাদ ঘাড় উঁচু ক'রে আছে কি ভাবে? …এ ছাড়াও, এই সব বৃহৎ পটভূমি ছাপিয়ে দৃশ্যটা – সেভেল ও তার মা। কি করতে যাচ্ছিলো তারা? নিশ্চয় খুব খারাপ কিছু। আচ্ছা, আজকের এই রাতটা – এমন একটা অন্ধকার রাতের সুযোগ কি ওরা নেবে না? কি করবে? সাংঘাতিক! আশ্চর্য! মা কত চটপট মানুষকে হৃদয় দিয়ে ফেলতে পারে। আর হৃদয় দিয়ে ফেললেই কি বিছানায়…। এতটুকু বিবেচনা ক'রে দেখবে না? তার জোয়েতের কথা, তার জোয়েতের সম্ভাবনার কথা, সম্মান ও কল্পনার কথা—সব কিছুকেই কি সে নষ্ট করে দেবে? না-না, সে যে মা! সব কিছু ছাপিয়ে জননী! জোয়েত প্রত্যয়ের সন্ধানে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তবু সন্দেহই জয়ী হয়। সন্দেহের তাড়নায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সে শুনবার চেষ্টা করলো, নীচ থেকে কোন কথা বা, শব্দ ভেসে আসছে কি না!

অবস্থানগত অসুবিধের জন্য কিছুই নজরে আসছে না তার। কিন্তু হঠাৎ যেন শুনতে পেলো তার মার স্বরই '…আমি একে দেখবো আমার সোনা!'

রি রি করে ওঠে জোয়েতের সর্বাঙ্গ। মার স্বর ঠিকই, তবে কেমন যেন বিজাতীয়। জোয়েত এক রকম ছুটে গেল মারসিঅনেসের ঘরের

দিকে। কপাট বন্ধ। অর্থাৎ, এই সুযোগে নিরালায় সেই বলশালী লোকটার সঙ্গে মা···।

আবার জোয়েতের রক্ত চন্‌মনিয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ-চমকে অনেক কিছুই চকিতে আলোকিত। দৃষ্টিশক্তি ক্ষণিক ধাঁধিয়ে গেলেও জোয়েতের কানে এলো সেভেলের স্বর, "আমাকে এবার সুযোগ দাও রাণী!···"

না, আর কোন সাড়া নেই। শব্দ, কথা, আলাপ, বিলাপ, আবেদন হারিয়ে গেল। জোয়েত কাঁপছে। ভয় ও ঘৃণার সঙ্গে তারও ভিতরে কোথায় যেন এক টুকরো সুখ অপরাধপ্রবণতাকে সুড়সুড়ি দিতে থাকে। সে পিছিয়ে যেতে পারলো না। আরো দু'পা এগিয়ে শরীর ঝুঁকে কান পেতে থাকে গোপন শব্দ উদ্ধারের আশায়। পারিপার্শ্বিকতা এখন এক কবরখানার, যে কবরখানায় এখন পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা হতে চলেছে। জোয়েতের নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। এ বাড়িতে এমন ঘটনা হয়তো নতুন নয়, কিন্তু এমন করে জ্ঞানলাভ তো তার কখনো হয়নি। তার ফুসফুসে চেপে বসেছে বুঝি কে। শিরদাঁড়া বেয়ে সরীসৃপ নামছে।

আবার আকাশ চিরে বিদ্যুৎ। আবার-আবার-আবার। আর ঠিক তখনই শোনা গেল সেই সমর্পিতস্বর, "ইস!···তুমি আমায় পাগল করে দেবে। না, এখানে ঠিক হবে না। ঘরে চলো।

সুন্দর নরম বিছানা পাতা আছে।"

এই স্বর জোয়েতের আবাল্য পরিচিত।

এই স্বর তার জন্মদায়িনী মা মারসিঅনেসের।

একটি দুটি ক'রে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে গাছের মাথায়। কার্নিশে জলজ ঝাপটা। দীর্ঘবর্ষণের পূর্বলক্ষণ। সোঁ সোঁ শব্দ। উদ্দাম হ'য়ে উঠছে বাতাস। আচ্ছন্ন এবং জাগরণ অনুভূতি নিয়ে ভয় পাচ্ছে জোয়েত—এ যে ঝড়! প্রকৃতির সৃষ্টিছাড়া নর্তন। জোয়েত ভিজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সর্বাঙ্গ ভিজে চুপ চুপ।

তার কানে এলো—ওরা দু'জন পা টেনে টেনে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো, ব্যস্ত হাতে সশব্দে বন্ধ করে দিলো দরজা।

কি যে হলো জোয়েতের!

কোন ক্রমেই সংযত রাখতে পারলো না নিজেকে। এমনকি ঝড়ের ভীতিও তাকে চুপসে দিতে অক্ষম। সে তার তপ্ত শরীর নিয়ে যেন কি সাংঘাতিক প্রশ্নের জবাব খুঁজতে অন্ধকারে নীচে নেমে এলো। বারেন্দায় না দাঁড়িয়ে নেমে গেলো বাগানে। নরম কাদা-মাটিতে পা ডুবিয়ে সে সকরুণ ব্যস্ততায় খুঁজে নিলো এমন একটা কোন, যেখান থেকে মারসি-অনেসের ঘরের সবটাই দেখা যায় হাট ক'রে খোলা বিশাল জানালার মধ্য দিয়ে।

ঐ তো মার সৌখিন শয়নকক্ষ। খুব যত্ন নিয়ে সাজানো। মারী আতোঁয়ানেৎও বোধহয় এমন বিলাস-শয্যা পছন্দ করতেন। খাটের বাজুতে ঝুলছে টাটকা শাদা ফুল, ছোট্ট টেবিলের উপর উড়ন্ত নগ্ন পরী, দেয়ালে 'ভেনাসের জন্ম'···। গোটা বাড়িটার মধ্যে একমাত্র এই ঘরেই আলো জ্বলছে—দামী পাথর থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো। সেই আলোয় জোয়েত দেখলো,স্বর্গীয় পরিবেশে দানবীয় কাণ্ডকারখানা। নর-নারীর এমন যুদ্ধ সে কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নি। সেভেলের নগ্ন শরীরটা আরো বিশাল, ভয়ঙ্কর, উদ্ধত এবং অসহ্য। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক তার বিবস্ত্রা মার শরীর নিয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি, অসম্ভব অশ্লীল সমস্ত শব্দোচ্চারণ, তীক্ষ্ণ শীৎকার। সেভেলের শরীরটা প্রায়শই ঢেকে দিচ্ছে মারসিঅনেসের শরীরটাকে। কিন্তু এক সময় পাল্টা খেয়ে মারসিঅনেস সেভেলকে অধিকার করামাত্র জোয়েত নিজের অজ্ঞাতেই আর্তনাদ করে ওঠেঃ মা-গো!

ধ্বনি আঘাত হানে। চকিতে ছুটি দেহ পৃথক হয়ে যায়। তাদের অনুসন্ধানী ও বিব্রত দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় ধ্বনির উৎসকে।

মার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে জোয়েত ততক্ষণে ছুটে পালাচ্ছে। তীর বেগে ছুটলো সে তার ভেজা কর্দমাক্ত শরীর নিয়ে। ভয়ে, বিস্ময়ে, বিজাতীয় রোমাঞ্চে, প্রত্যক্ষ দৃশ্যের আঘাতে, অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছে তার শরীর। হাঁটু মুড়ে বসে সে বার বার ঈশ্বরের কাছে শক্তি সহায়তা প্রার্থনা করেঃ প্রভু! আমায় আলো দেখাও! এই বিপদ, এই দংশন এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো। আবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও সেই সুন্দর দিনগুলিতে, যখন আমার কোন আত্মগ্লানি ও আত্মজিজ্ঞাসা ছিল না।

প্রার্থনায় শান্তি এলো না।

ভেজা জামা প্যান্ট পরেই পাথরের মতন স্থির জোয়েত। তারপর কখন যেন থেমে গেল বৃষ্টি। কখন যেন পূবাকাশে একটু একটু ক'রে ফাগ ছড়ানো হলো। ভেজা কাপড় বদলে শূন্য মন নিয়ে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো জোয়েত। কড় কড়ে চোখ দুটো তার জ্বলছে, সে শপথ নিলোঃ মাকে আমি আর ঐ নোংরামি করতে দেবো না!

সকাল হয়ে গেছে বহুক্ষণ। চারদিকে ঝলমলে রোদ্দুর। জোয়েত এক পরিচারিকাকে ডেকে বললো, "মাকে বলবে, আমার শরীর ভালো নয়। খুব মাথা ধরেছে। ভদ্রলোক দু'জন বিদায় না হওয়া অব্দি বিছানা ছেড়ে উঠছি না। আর কেউ যেন এসে আমাকে বিরক্ত না করে!"

জোয়েতের ডাঁই ক'রে রাখা ভেজা কাপড়গুলির দিকে চেয়ে বিস্মিত পরিচারিকা বললো, মাদমোয়াজেল, কাল রাতে বৃষ্টির সময় আপনি কি বাইরে ছিলেন?"

জোয়েত অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, "হ্যাঁ, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম।"

পরিচারিকা তিক্ততার সঙ্গে ভেজা কাপড়গুলি তুলে নিয়ে চলে

যায়। পোশাকগুলি যেন কোন জলমগ্ন যুবতীর—এখনো টুপ টুপ ক'রে কাদা জল চোঁয়াচ্ছে।

জোয়েত জানে, খবর পেয়ে তার মা নির্ঘাৎ আসবে। সে তো তারই প্রতীক্ষায়।

মারসিঅনেস কাল রাতে নিজের সক্রিয় সুখ-লগ্নে সেই আচমকা 'মা গো' আর্তি শুনবার পর থেকেই বিশ্রী রকমের বিমর্ষ, মরমে পুড়ছে। এখন দাসীর মুখে খবর পেয়ে ঝটতি এসে ঢুকলো জোয়েতের ঘরে।

মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললো, "কি হয়েছে ?"

জোয়েত অস্ফুটস্বরে "মা মণি আমি—আমি···" বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

হতভম্ব মারসিঅনেস বার বার জিজ্ঞেস করতে থাকে, "কি হয়েছে ? কাঁদছো কেন ? খুলে বলো।"

পরিকল্পনামাফিক কিছুই ক'রে উঠতে পারলো না জোয়েত। দুঃখ, লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর কাঁদতে থাকে।

প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি মারসিঅনেস। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পরই ব্যাপারটা সে ধরতে পারে। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্রন্দসী মেয়ের মাথায় হাত রাখে, "তোমার কষ্টটা কেন এবং কোথায়, আমাকে খুলে বলো। আমি তোমাকে শান্ত করতে পারবো।"

তোতলাতে শুরু করে জোয়েত, "মা গো···উঃ···কাল রাতে জানালা দিয়ে···আ মি-ই···তোমাকে ঐ—লোকটাকে···দেখে ফেলেছি !···"

বিবর্ণ মারসিঅনেস কোন রকমে সামাল দেবার চেষ্টা করে, "তাতে কি হয়েছে ? এতে এমন আহত হবার কি আছে ?" ভেঙ্গে পড়া জোয়েত আড়ষ্ট গলায় বলে, "না-না মা···" ক্রমশ বিরক্তিতে পূর্ণ হ'য়ে গেল মারসিঅনেসের মন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝাঁজালো গলায় বললো, "তোমার মাথাটি একেবারে গোল্লায় গেছে। এ রকম ছিঁচ কাঁদুনি থামলে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

জোয়েত তাঁর কান্নাভরা গলা তুলে বাধা দিলো, "না, তুমি যেও না।

তোমাকে সব শুনে যেতে হবে।···আমাকে তোমার কথা দিতে হবে··· এমন কাজ আর আমাদের বাড়িতে আদবেই হবে না···চলো না মা, আমরা এই ইতর সমাজ ছেড়ে কোন দূর নির্জন এলাকায় চলে যাই, সেখানে আমাদের পিছন পিছন এরা ধাওয়া করে আসবে না, যেখানে আমাদের স্মৃতি থেকে অন্তর্হিত হবে এই সব তিক্ত অভিজ্ঞতা। সেখানে আমরা দরিদ্র সরল কৃষকদের মধ্যে বসবাস করবো এবং ওদেরই মতন বিশ্বাস করবো ধর্মীয় নীতিকথায় ও প্রবাদবাক্যে। আমাদের তখন এই সব লোভী লোকগুলো আর খুঁজেই পাবে না। ···আমাকে ক্ষমা করো, আমি আর এই পরিবেশকে সহ্য করতে পারছি না।" মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ মারসিঅনেস। বুকের ভেতরে কে যেন ভারী ভারী পাথর ছুঁড়ে মারছে। সন্তানের কাছে মার এ বড় লজ্জা। তার যেটা জীবিকা, জোয়েতের কাছে সেটা খুঁতময় ঘৃণ্য ঘটনা। অজানা ভয় ও বিরক্তি যুগপৎ মরীয়া ক'রে তোলে মারসি-অনেসকে। আবার আপত্য স্নেহের ফল্গুধারাও তাকে বিচলিত করে রাখে। এই মুহূর্ত থেকে জোয়েত তার পিছনে ছায়ার মতন লেগে থাকবে, ব্যবসায়িক তৃপ্তির পর নিশ্চিন্ত হয়ে একটা হাইও তুলতে দেবে না! কী মনস্তাপ! সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপছে তার। তবু, এই মুহূর্তে সে মেজাজ হারাবে না বলে স্থির করলো, জোয়েতকে এখন আঘাত করবার পরিণতি ভালো হবে না!"

মারসিঅনেস ঢোক গিলে কোন রকমে বললো, "তোমার কথা আমি এখনো বুঝতে পারছি না।"

জোয়েত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, "গতরাতে তোমাদের আমি ঐ অবস্থায় দেখে ফেলেছি···আর ও রকম কারো না···তুমি এদের সকলকে ছেড়ে দাও··আমাকে বুকে ক'রে পালিয়ে চলো···আমরা দু'জনে বহুদূর চলে যাবো, পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবো··· অতীতের এই সব গ্লানি মুছে যাবে।"

স্খলিত স্বরে মাদাম বললো, "জোয়েত, লক্ষীটি এই দুনিয়ার রহস্য

অপার। সব কিছু বুঝবার মতন সক্ষমতা এখনো তুমি অর্জন করোনি। আমাদের পরিস্থিতি বুঝলে, কখনো এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে না। বিশ্বাস করো, এটা কোন হৃদয় বা নিছক দেহঘটিত ব্যাপার নয়, এটা হলো নিরেট যান্ত্রিক ঘটনা—আমাদের পার্থিব সুখ ও স্বাচ্ছল্যের জন্য এই যান্ত্রিক ঘটনার অতি প্রয়োজন।…সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনো এ ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিতে এসো না।”

কিন্তু লজ্জাজনক ঘটনা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত যখন একবার ঘটে গেছে, তখন জোয়েত আর ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। শিশু বয়স থেকেই সে হারতে জানে না, আজো হারতে রাজি নয়। সোজা কথা মাকে সে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবেই। মাকে বেপথু দেখলেই হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে আসবে। মহারাণী ক্যাথারিনের মতন তর্জনী তুলে বললো, “না, আমাকে মুখ খুলতেই হবে। তোমার যেমন বয়স বেড়েছে, আমিও তেমনি আর কচি খুকিটি নই। আমার চারদিকে এমনি সব নোংরামি, কেলেঙ্কারি ঘটবে, আর আমি বুঝি মুখ বুঝে সহ্য করবো? যতসব বাজে লোক, পয়সা থাকলেই মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করে না। খালি কুকর্মের ধান্ধায় তোমার চারধারে ঘুর ঘুর করছে, আজকাল আবার আমার দিকেও নেক নজর দিতে শুরু করেছে। কেবলই শরীর চাখবার বাসনা, হৃদয় বলতে কিছু আছে ওদের? এদের জন্যই আমাদের কোন সামাজিক সম্মান নেই। আমি যখন লাইব্রেরীতে বই আনতে যাই, এই চাপা অনুভূতিটা বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে বিঁধতে থাকে। টাকা-পয়সা গহনাগাটি তো অনেক হয়েছে মা! আর কেন? এবার ক্ষান্তি দাও। আরো অনেক বছর তুমি বাঁচবে, আর আমার তো জীবনের শুরু। এসো, এই দীর্ঘ সময়টাকে আমরা রমণীয় করে তুলি। জীবন রমণীয় হবে উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়, সৎসংযত দিনাতিপাতে। অনেক দূরে চলে যাবো, যেখানে তোমার অতীত তার নোংরা হাত বাড়াতে পারবে না। খরচ চালাবার জন্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দাও, গহনা-

গুলি একে একে বেচে ফেলো। তারপর যদি প্রয়োজন হয়, আমি চাকরি করবো। যদি কোন যুবক সৎ ও সামাজিকভাবে আমাকে প্রেম নিবেদন করে, আমি তাকে নিশ্চয় কৃতজ্ঞচিত্তে বিয়ে করবো। হোক না সে কুরূপ কিংবা, গরীব, লম্পট ধনী তো নয়।"

জোয়েতের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ বিস্ফোরণ ঘটাতে থাকে মারসিঅনেসের মগজে। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখে, "তোমার মাথায় একটা বেয়াড়া পোকা লালিত হচ্ছে। আগে কিছুটা সুস্থ হও, আমাদের সঙ্গে খাবার টেবিলে চলো, তারপর সব শুনবে।" মেয়ে হাত পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায়, "না, আমি যা বলেছি, অনেক ভেবেই বলেছি। আমার মাথায় কোন পোকা নেই। আমার কথারও নড়চড় হবে না। আর ঐ লোক দুটো যদি এ বাড়ি ছেড়ে না যায়, তবে আমাকেই চলে যেতে হবে।"

চিৎকার করে ওঠে মারসিঅনেস, "কোন চুলায় যাবে, শুনি ?

খাবেটা কি ?"

জোয়েতও তার কান্নাজড়ানো স্বর উচ্চগ্রামে তোলে, "পেটের চিন্তা আমি করিনা। সততার জন্য আমি দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত।"

'সততা'—এই শব্দ তিনটি মারসিঅনেসের মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। তার সুন্দর মুখ ভয়ঙ্কর, কুৎসিৎ হ'য়ে ওঠে, সে বুঝি তার অতীতকে ফিরে পাচ্ছে। দুই হাতে অনেকটা উঁচুতে কাপড় তুলে রাস্তার নীচুস্তরের মেয়েদের মতন গলাবাজি শুরু করে দেয়, চোপরাও ! আর একটা কথাও মুখ থেকে বের করবি না।

যে সব মাগীদের তুই 'সৎ' বলছিস, তাদের সম্পর্কে তোর কতটুকু ধারণা আছে ? একজনের বউ হয়ে থাকলেই সে সতী হয়ে গেল, না ? ঘোমটার আড়ালে কত যে খেমটানাচ হয়, তার তুই কতটুকু জানিস ? বড় বড় বাড়িতে বউ বদল হয়, জানিস ? আমি তো তবু পয়সার জন্য রূপ নিয়ে বেসাতি করি। ঐ মাগীরা কেন সুযোগ পেলেই পর পুরুষের

সামনে কাপড় তুলে ইশারা করে ? তোর মা ঐ সব 'সততার' ধার ধারে না, বুঝলি ?"

আক্রান্ত জোয়েত স্বল্লোচ্চারে ধিক্কার দেয়, "ছিঃ ! মা !"

মারসিঅনেসের থামবার কোন লক্ষণ নেই, "হাঁ, আমার পরিচয়—আমি গণিকা। দেহের বিনিময়ে উপার্জন করি। এক সময় আমার রেট কম ছিল, এখন অবস্থাপন্ন লোক ছাড়া আমার নাগাল কেউ পায় না। মানুষ যেমন ব্যবসায়ে বা, কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করে, আমিও তেমনি উন্নতি করেছি। আমাদের জীবন যাত্রায় যে স্বচ্ছলতা তুমি দেখছো, তার মূলে আমার এই দেহ ও যৌবন। এতে লজ্জার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। তা ছাড়া আমি মনে করি, গণিকারা এই সমাজের উপকারই করে। আমরা আছি বলেই বহু পরিবারে ভাঙ্গন ধরেনি, আগুন জ্বলেনি। চিন্তা করে দেখো, আমি যদি এ পথে নেমে না আসতাম, তাহলে আমাদের পরিণতিটা কি দাঁড়াতো ? পরিণতি হতো এই যে, আমাকে রাস্তায় ঝাড়ু দিতে হতো। উদয়াস্ত খাটতে খাটতে কাঠি হয়ে যেত, শরীর, মনে কোন বল পেতাম না। তোমার একটা ভালো জামাও জুটতো না। অথবা, হয়তো কোন কেরাণীর বাড়িতে আমাকে এঁটো বাসন মাজতে হতো, গিন্নীর ফরমাইশ মতন ছুটতে হতো কসাই খানায় মাংস আনতে। একটু ক্লান্তি এলেই হরেক রকম গঞ্জনা শুনতে হতো। ভুল হলেই অর্ধচন্দ্র দান। এ রকমই একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা এড়িয়ে তুমি যে আনন্দের স্রোতে স্বাধীনভাবে গা ভাসিয়ে চলেছো, তা একমাত্র আমি তথাকথিত 'সৎ' নই বলেই। ঝিগিরি ক'রে ক' পয়সা তুমি জমাতে পারতে ? বড় জোর পঞ্চাশ ফ্রাঁ ! ঐ সামান্য টাকা দিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখে বাতুল। যার টাকা নেই, পৃথিবীটা তার কাছে নরক। এমন কোন মূলধন তুমি সারা জীবনেও সংগ্রহ করতে পারবে না, যা দিয়ে কোন ব্যবসা ফাঁদা যায়। অর্থাৎ আমাদের আমলে আর কোন বৃত্তি খোলা নেই—ঈশ্বর প্রদত্ত এই দেহ ও যৌবনই একমাত্র ভরসা।"

নিজের বুক ও কপাল চাপড়ে মারসিঅনেস আরো বলতে থাকে, "জানো, আমাদের মতন ভাগ্যহীনা মেয়েদের কপালে আর কোন উপায়েই সৌভাগ্যের দীপ জ্বলে না। যে জিনিস প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে, পুরুষদের চিরন্তন কামনার সুযোগ নিয়ে সেটাকেই ভাঙ্গিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ রাখতে হবে। নচেৎ পচে মরতে হবে অকথ্য দারিদ্র্যে। এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই, জোয়েত।"

মারসিঅনেস আরো বললো, "কোন মহিলাকে তুমি চট করে সুখী ও সতী ভাবতে যেও না। শুধু মাত্র বৈচিত্র্যের নামে লুকিয়ে চুরিয়ে ওরা যে সব কাণ্ড করে, আমার পেশাদারী মনও তাতে ঘৃণায় রি রি করে ওঠে। আমি কি ওদের চেয়েও ইতর?"

মারসিঅনেসের প্রতিটি জ্বালাধরা শব্দ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত। বিধ্বস্ত জোয়েত বড় অসহায় বোধ করে। তার ইচ্ছে হলো, চিৎকার করে বলেঃ আমাকে রক্ষা করো! আমি মানতে পারছি না!

কিন্তু কিছুই সে ক'রে উঠতে না পেরে হাউ মাউ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

মা মারসিঅনেস পাথরের মতন নিশ্চল।

মেয়ের দুঃখ, অন্ধকারবোধ, অসহায়ত্ব তাকে স্পর্শ করে। দু'হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সেও এক সময় ফুঁপিয়ে ওঠে, সোনামনি, কেঁদোনা, লক্ষ্মীটি। একবার যদি বুঝতে, আমার ও এই বুকের মধ্যে কত ব্যথা, কত অপমানের গ্লানি বছরের পর বছর জমাট বেঁধে আছে!"

অনেকক্ষণ ধরে মা ও মেয়ে একসঙ্গে অশ্রু বিসর্জন করলো। অবশ্য মারসিঅনেসের বেদনা তথা বিহ্বলতা ক্ষণিকের। দুঃখকে সে প্রশ্রয় দিতে চায় না। এক সময় সে ধরা গলায় বললো, "জোয়েত, আর কেঁদো না। আমাদের ফেরার কোন পথ নেই। এই জীবনকেই সহজ ভাবে গ্রহণ করো।"

কিন্তু জোয়েতের দুঃখ ও বেদনা গভীর। সে এই যন্ত্রনার হাত থেকে মুক্তির আর পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

মা বললো, "চলো, এবার খাবার টেবিলে—কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।"

মেয়ে মাথা নেড়ে বললো, "না, মা। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমাকে ওদের সামনে যেতে বলো না। আমি ওদের সহ্য করতে পারবো না। আবার যদি এখানে কেউ আসে, আমি আত্মহত্যা করবো।"

মারসিঅনেস অবিচলিত স্বরে বললো, "মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার কথাগুলি ভেবে দেখো।···ঠিক আছে, তুমি এখন বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যায় আবার তোমার কাছে আসবো।"

মা চলে গেলে ঘরে খিল তুলে দিলো জোয়েত। নির্জন ঘরে একাকী বসে সে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে।

বেলা এগারোটা নাগাদ পরিচারিকা এসে কপাটে ধাক্কা দেয়, "মাদমোয়াজেল, লাঞ্চ করবেন না? মাদাম জানতে চাইলেন, খাবারটা কি এ ঘরেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে?" ঘরের ভেতর থেকে জোয়েত জবা দিলো, "আমার খিদে নেই। আমি একটু একা থাকতে চাই।"

বিছানার ওপর অবসন্ন জোয়েত তার শরীর বিছিয়ে দেয়। বেলা তিনটে নাগাদ তার মা এলো। কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

"এখন কি একটু ভালো বোধ করছো? ডিম সেদ্ধ খাবে একটা।"

"না, দরকার নেই।"

"আজ আর উঠবে না?"

"এখনই উঠবো," ঝটতি উঠে বসে জোয়েত, "সারাটা দিন আমি কেবল ভেবেছি! কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারিনি। আমার কাছে অতীত মূল্যহীন, ভবিষ্যৎটাই সব এবং সেই ভবিষ্যৎ বাড়াতে হবে

অন্যভাবে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। থাক, এখন আর এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে আমার ভালো লাগছে না।"

মারসিঅনেস দেখলো, মেয়ে তার বড় গোঁয়ার। সে ভীষণ চটে গেল মনে মনে। বোকা মেয়েটা এতদিনে তবে কিছুই জানতো না? মনের ক্ষোভ চেপে রেখে মারসিঅনেস বললো, "তুমি কি এখন ঘরের বাইরে যাবে?"

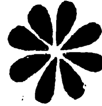
"হ্যাঁ, চলো।"

মারসিঅনেস নিজের হাতে মেয়েকে তার পোশাকগুলি এগিয়ে দিলো। ওর কপালে চুমু খেলো।

"ডিনারে বসবার আগে আমার সঙ্গে একটু পায়চারি করবে?"

"করবো, মা।"

নদীর তীর বরাবর হাঁটলো তারা। অতি সামান্য ও তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলো।



পরদিন জোয়েত, আর কারুর সঙ্গে নয়, একাকি বেরিয়ে পড়লো ভিলা ছেড়ে। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে গেলে সেই নির্জন স্থানে, যেখানে বসে সারভিনি একদা তাকে পড়ে শুনিয়েছিল 'পিপীলিকার ইতিবৃত্ত'। বসে পড়লো জোয়েত! মনে মনে আবার শপথ নিলো, 'যা আমি ঠিক করেছি, তা থেকে এক পাও পিছু হটবো না।'

নীচে বহতা নদীর ছল-ছল-কল-কল কলতান। জোয়েত ভাবতে ভাবতে নানা রকম সিদ্ধান্ত নেয়—মুক্তি তার চাই-ই চাই।

সে সব ছেড়ে-ছুঁড়ে চলে যাবে দূর-দূরান্তরে। কিন্তু কোন ঠিকানায়? তার পেটই বা চলবে কি করে? কে দেবে তাকে কাজ? ঝিগিরি করতে সে পারবে না। আত্মসম্মানে বাধবে। বরং সে অনেক

উপন্যাসের চরিত্র আয়া হতে পারে কিন্তু যে তরুণীর বংশপরিচয় নেই, তাকে আয়া রাখতে রাজি হবে কে ?

সন্ন্যাসিনী হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মনে ধর্মের প্রভাব অত জোরালো নয়। বর্তমানে যে কেউ তাকে বিয়ে করে উদ্ধার করবে, এমন সম্ভাবনাও নেই।

মুক্তির একটা পথও দেখতে পাচ্ছে না জোয়েত।

অগত্যা সে ঠিক করলো—আত্মহত্যা করবে।

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এতটুকুও কেঁপে উঠলো না জোয়েত। ব্যাপারটা যেন নেহাৎই সহজ—এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বেড়াতে যাবার মতন।

মৃত্যুই যে চূড়ান্ত সমাপ্তি, যার কোন শুরু নেই—সরল জোয়েত এতটুকুও ভেবে দেখলো না। তার মনে হলো, পথ সে পেয়ে গেছে। সুন্দর সহজ সমাধান।

কিন্তু আত্মহত্যার উপায় ?

উপায়গুলি দুঃখদায়ক ও ভয়ঙ্কর।

হিংস্র হয়ে ওঠা জোয়েতের স্বাভাববিরুদ্ধ। ছোরা বা, পিস্তলের কথা সে ভাবতেই পারে না। ওদের দ্বারা সে বড় জোর নিজেকে আহত করতে পাররে, খুন হতে পারবে না। কারণ, তাই তার সেই দক্ষতাই নেই। মাঝ থেকে এমন সুন্দর শরীরটা বিকৃত হ'য়ে যাবে।

গলায় ফাঁস দেবে ?

না না এ বড় কদর্য ভঙ্গী।

জলে ডুবে মরবে ?

সম্ভবই নয়, সে যে সাঁতারে তুখোড়।

হাঁ, একটিমাত্র উপায় আছে। বিষ খাওয়া। কিন্তু কি ধরণের বিষ ?

অধিকাংশ বিষই শরীরে বিষম যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, বমির উদ্রেক হয়। এসব বাপু তার চলবে না।···ভাবতে ভাবতে মনে হলো

ক্লোরোফরমের কথা। একবার খবরের কাগজে সে পড়েছিল ঃ অত্যধিক ক্লোরোফরম সেবনে 'জনৈকা তরুণীর মৃত্যু!' মনের মতন উপাদানটি পেয়ে আত্মতৃপ্ত জোয়েত। এই মুহূর্তে নিজেকে তার সম্মান জানাতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওরা বুঝবে, জোয়েত কত উঁচু স্তরের মেয়ে ছিল!

বিষ খুঁজতে জোয়েত গেল বগিভাঁতে। দাঁতের ব্যাথার নাম ক'রে পরিচিত অপরিচিত বহু ওষুধের দোকান থেকে সে বিন্দু বিন্দু ক্লোরোফরম যোগাড় করে। লাঞ্চের আগেই ফিরে এলো বাড়িতে। এক পেট খাবার খেয়ে পরিতৃপ্তির ভঙ্গী করলো। মেয়ের ভাবান্তরে মা বেজায় খুশি, বুক থেকে পাথরখানা নেমে গেল যেন। খাবার টেবিলেই মা মেয়েকে আগাম শুনিয়ে রাখলো একটি খোশখবর, "আগামী রবিবার এখানে একটি জমাটি ভোজের আসর বসবে। আসছেন আমাদের সব বন্ধুরাই, প্রিন্স ক্রাভালো, মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো, সারভিনি, ব্যারণ সেভেল সব!"

খবর শুনে ঈষৎ মুখভার করলেও জোয়েত কোন প্রতিবাদ করে না …পরদিনই সে ট্রেন ধরে সোজা হাজির প্যারিসে। বিকেল অব্দি দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করলো ক্লোরোফরম। অনেক-গুলি ছোট ছোট শিশি ভর্তি হয়ে গেল ঐ বস্তুতে। পরদিনও চললো সেই অভিযান। একটি দোকান থেকে তো পেয়ে গেল পুরো দশ আউন্স। কে সন্দেহ করতে যাবে, এমন একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে আত্মহত্যার জন্য ঘুমের ওষুধ সঞ্চয় ক'রে চলেছে?

আবার একটি বাতাসহীন দিন এই শনিবার। গুমোট গরম। আকাশে থম থমে মেঘ। একটা বেতের চেয়ারে বসে সারাটা দিন কাটিয়ে দিল জোয়েত। আত্মহননের প্রতিজ্ঞাটিকে ঝালিয়ে নিলো মনে মনে।…

পরদিন রবিবার, চমৎকার সব পোশাকে নিজেকে সাজালো জোয়েত ; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরখ করলো নিজের আগুন রূপ —'এই দেহ তার মন নিয়ে আগামীকাল আর পৃথিবীকে চঞ্চল করবে না।' কথাটা উচ্চারণ করতেই কী এক শিহরণ। 'আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবো !' 'কোন স্বর আমার কণ্ঠ থেকে মুক্তি পাবে না, আর বই নিয়ে ডুবে থাকবো না, আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। পৃথিবীর এই সব সুন্দর দৃশ্যগুলি আর আমার দৃষ্টির সামনে হিল্লোলিত হবে না !' নিজেকে অবাক হ'য়ে দেখছে জোয়েত ! ইস্, আমি কী সুন্দরী ! আয়না সামনে না থাকলে নিজেকেই চিনতেই পারতুম না। ···জোয়েত যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে, দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর পড়ে আছে তার প্রাণহীন নিথর দেহখানা ! প্রাণশূন্য। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে মাটির নীচে কফিনের ভিতর পচে গলে ঝিম্ কলো হ'য়ে যাবে এই দেবদুর্লভ মুখাবয়ব, এমন আয়ত চক্ষু, এমন ছোট্ট কপাল, আর এই রাশি রাশি এলায়িত কুন্তল !

ভাবতে গিয়ে বিমর্ষতায় আপ্লুত জোয়েত। সে অনুমান করলো— তার মৃত্যুতে এই পৃথিবীর তো কোন পরিবর্তন হবে না। এমনকি, এই ঘরটারও কোন রূপান্তর ঘটবে না। এই বিছানা, খাট, আয়না, চেয়ার-টেবিল – সব অটুট থাকবে ! শুধু থাকবে না এক অনন্যা তরুণী, যার নাম জোয়েত। একমাত্র মা ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ তেমন নাড়াও খাবে না তার মৃত্যুতে। অভ্যাগতরা হয়তো প্রসঙ্গক্রমে কিছু দিন আলোচনা চালাবে 'আহ ! বেচারি জোয়েত ! কী চমৎকার দেখতে ছিল মেয়েটা।'···জোয়েতের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে, কেমন এক থম থমে বিহ্বলতা তার ভেতর কম্পন তোলে।

এবং ঠিক তখনই প্রশস্ত সবুজ বাগানে অভ্যাগতদের সমাবেশে আসর জমে উঠেছে। গমগমে আওয়াজ। হাসিতে-খুশিতে উপচে পড়ছে মারসিঅনেস। জনে জনে দিয়ে যাচ্ছে তাকে মূল্যবান নজরানা।

সেও অঙ্গীকার দিচ্ছে, সময় ও সুযোগ মতন সুখ ও আনন্দ তাদের দেবে। মারসিঅনেসের একখানা হাত চেপে ধরে উদাত্ত কণ্ঠে গান শুরু করে মঁসিয়ে দ্য বেলভিনো ঃ

"বাতায়নে বসে ছিলেম প্রিয়ে
তোমার অপেক্ষায়।
তুমি এলে, সেই তুমি এলে —
লগ্নশেষে প্রায়।"

জোয়েত একবার ওখান থেকে ঘুরেও এলো। ঘৃণায় সে রি রি করে ওঠে এক দঙ্গল পুরুষ এসেছে পয়সার বিনিময়ে তার মার শরীরটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

বুকে ঘৃণা, অথচ মুখে হাসি নিয়ে জোয়েত আবার হাজির হলো সেই আসরে, সকলের সঙ্গে ব্যক্তিত্বপূর্ণভাবে করমর্দন করতে থাকে।

সারভিনি জিজ্ঞেস করলো, "মেজাজ শরিফ তো?"

অদ্ভুত গাম্ভীর্যপূর্ণ গলায় জোয়েত জাবাব দিলো, "খুশির উচ্ছলতায় আমি তো এখন যেন প্যারির দিনগুলিতে ফিরে গেছি। তবে এখনো তুমি তোমার আচরণ, অন্ততঃ আমার সঙ্গে একটু সংযত রেখো।"

সারভিনি হতবাক।

মঁসিয়ে দ্য বেলভিনোকে কাছে ডেকে এনে জোয়েত বললো, "মলভসি, আজ তোমাকেই আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে। খাবারের পাট চুক গেলে আমরা সবাই মিলে মার্লির মেলায় যাবো।"

মার্লিতে গিয়ে আরো হুল্লোড়। দু'জন নবাগত এসেছে আজকের আসরে। কাউন্ট তামিন ও মারকুইস্ দ্য বুকেতত।

খাবার টেবিলে বসে মনের দুশ্চিন্তা চেপে রাখবার জন্য প্রচুর মদ্যপান করলো জোয়েত। তার মুখের রং গণ-গণে লাল। ঢুলু ঢুলু চোখে চক চকে দৃষ্টি। এ্যালকহলের প্রভাবে মস্তিষ্ক ঠিক ঠিক কাজ করছে না যেন।

সকলকে ডেকে বললো, "চলো, আমরা চারদিকটা ঘুরি।"

বেলভিনোর হাত ধরে নাচতে নাচতে চলেছে জোয়েত।

পিছনে যেন একটি ছোটখাটো মিছিল।

জোয়েত নেতৃত্ব দেবার কায়দায় বললো, "শোন, আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা আমার অনুগত সৈন্যদল। সারভিনি, তোমাকে আমি সর্জেণ্টের পদ দিলাম—ডান দিক দিয়ে তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাবে। একেবারে সামনে থাকবে অশ্বারোহী বাহিনীর দুই শ্রেষ্ঠ সেনানী—প্রিন্স আর কাভেলিয়ার। তাদের পিছনের সারিতেই স্থান পাবে আমাদের মধ্যে নবগত দুই বিশিষ্ট বন্ধু।

মার্চ! কুইক মার্চ!..."

জোয়েতের বাহিনী এগিয়ে চললো জোর কদমে।

সারভিনি মুখ দিয়ে শব্দ তুলে বিউগিল বাজালো। নবাগত দু'জন এমন ভঙ্গী করছে যেন তারা সত্যি সত্যি ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। একমাত্র বিব্রত বোধ করছে বেলভিনো, "মাদ্‌মোয়াজেল, এতটা ছেলেমানুষী করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। তোমাকে পরে ওরা সমালোচনা করবে।

প্রায় ধমকে দিলো জোয়েত, "আমি কারুর সমালোচনার তোয়াক্কা করিনা। তবে তুমি থাকবে ঠিক আমার পাশটিতে! আমার মতন মেয়েকে গভীর সান্নিধ্য দেওয়া তোমার কর্তব্য।"

এই বিচিত্র বাহিনী যখন বগিভাঁর মধ্য দিয়ে চলেছে, রাস্তার দু'পাশে কুতূহলী জনতার ভিড় জমে যায়। এমন অলীক বাহিনী তারা আর কখনো দেখেনি। অনেক বাড়ির দরজা-জানালা খুলে গেল! প্রত্যেকটা বাড়ির ছাদে, ঝুল-বারেন্দায় বিস্মিত নর-নারীর দল। অনেক নতুন ছেলে-মেয়েরাও মজার গন্ধ পেয়ে এই মিছিলের সামিল হলো। এমনকি, একটা চলমান রেলগাড়ি থেকেও ছোকরা যাত্রীরা চিৎকার করে যেন এদের অভিনন্দন জানাতে থাকে।

জোয়েত চলেছে সাময়িক কায়দায়। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে

দেখা যাবে, ওর মুখে কোন উল্লাসের চিহ্ন নেই, কেমন যেন গাম্ভীর্যে পাণ্ডুর। সারভিনি মাঝে মাঝে নানা রকম আদেশ জারি করছে তার বাহিনীর উপর। প্রিন্স ও কাভেলিয়ার কিন্তু চাপা গলায় সমালোচনা শুরু করে দিয়েছে জোয়েতের খেয়ালীপনার। আর নবাগত দু'জন সমানে বাজিয়ে চলেছে কাল্পনিক ড্রাম। মেলার কে একজন মোটা মতন লোক আক্ষেপের সঙ্গে বললো, "জীবনটাকে ওরাই উপভোগ করতে শিখেছে।"

এরপর মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় দরুণ পাক খেতে লাগলো জোয়েত। সে তার পাশের কাঠের ঘোড়াটিতে বসালো বেলভিনোকে। কিন্তু সেই শারীরিক সক্ষমতা নেই—বার পাঁচেক পাক খেয়েই জগৎ অন্ধকার দেখছে। প্রচুর পুতুল কিনলো জোয়েত। সকলের হাতে হাতে একটি ক'রে পুতুল ধরিয়ে দিলো সে। এইসব উদ্ভট কার্যকলাপে সকলেই প্রায় ক্লান্ত, বিরক্তিতে জ্বলছে প্রিন্স ও কাভেলিয়ার।

একমাত্র সারভিনি আর নবাগত দু'জন সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে জোয়েতের সঙ্গে।

এলো মেলো ছুটতে ছুটতে দলটি একসময় নদীর কিনারে এসে দাঁড়ালো। জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে জোয়েতের দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ফুটে ওঠে। তার মাথায় তখন এক উদ্ভট খেয়াল। সকলকে ডেকে আনে নদীর তীরে। চিৎকার ক'রে বলে, "কে আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে? সে যেন এই মুহূর্তে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

সকলে নিশ্চুপ। চারদিক থেকে পিল পিল ক'রে লোক আসছে রগড় দেখতে। শাদা এ্যাপ্রন পরা দু'জন মহিলার মুখ থম থমে। দু'জন সেপাই বোকার মতন হেস উঠলো ফিক্ ফিক্ করে।

জোয়েত আবার বললো, "তবে কি আমার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতন কেউ নেই তোমাদের মধ্যে?"

ঠিক তখনই 'ধ্যাৎ...' বলে সারভিনি নিপুণ তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে

পড়লো নদীতে, খানিকটা জল চল্‌কে এসে ভিজিয়ে দিলো জোয়েতের সুন্দর পদযুগল।

নদীর পাড়ে সারবদ্ধ জনতার মৃদুগুঞ্জন। এতেও রেহাই নেই। জোয়েত একখণ্ড কাঠ নদীতে ছুঁড়ে দিয়ে সারভিনির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললো, "ঐ কাঠের টুকরোটা নিয়ে এসো দেখি।"

সারভিনি সাঁতরে টুকরোটা দাঁতে ক'রে নিয়ে আসে, জোয়েতের পায়ের সামনে নামিয়ে দেয় হাঁটু গেড়ে।

জোয়েত সারভিনির ভেজা মাথায় সেই কাঠ টুকরো ছুঁইয়ে বলে ওঠে, "কি চমৎকার পোষা কুকুরটি!"

ভিড়ের মধ্যে কে যেন টিপ্পনি কাটে, "চমৎকার!"

জনৈকা স্থূলাঙ্গী নাশা কুঞ্চিত করে, "রামোঃ! এমন নোংরা অপমান সহ্য করা যায় না!"

কে একজন চড়া গলায় আরো একধাপ এগুলো, "একটা মেয়ে-মানুষের জন্য এতটা হেয় হবার চাইতে নরকে যাওয়া অনেক শ্রেয়।"

জোয়েত বেলভিনোর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, "মূর্খ! তুমি যে কি সুযোগ হারালে, তা জানো না।"

এবার ফেরার পালা।

পথের দু'পাশে যত লোক, সকলের ঘৃণা ও বিদ্বেষ জোয়েতের ওপর। কে যেন বললো, "একপাল হ্যাংলা হাবা-গোবা মেয়েলোভী পুরুষকে চরাতে এসেছিল মেয়েটা।"

ইতিমধ্যে গোটা দলটাই নিস্তেজ। অনেকেই দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন। অপমানিত সারভিনির সর্বাঙ্গ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।"

জোয়েত বললো, "কি ব্যাপার! তোমরা সব যে একেবারে ঝিমিয়ে পড়লে। তোমরা তো একেই 'মজা' বলো, তাই না? আমি একাই তোমাদের পয়সার দাম বহুলাংশে মিটিয়ে দিলুম।"

বলতে বলতে জোয়েত মুখ নীচু করে, তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বেলভিনো সবিস্ময়ে বলে ওঠে, "এ কি ! তুমি কাঁদছো ?"

"চুপ ! আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার অধিকার তোমার নেই।" কিন্তু বেলভিনো নির্বোধের মতন তবুও পীড়াপীড়ি করতে থাকে ।

"নিশ্চয় কিছু হয়েছে ! না হলে তোমার চোখে জল। ভাবাই যায় না !"

জোয়েত ধমকের সুরে বলে, "তুমি চুপ করবে কি না ?"

জোয়েত আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না। পাহাড় ভাঙ্গা নদীর মতন ছ'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে। যে তিক্ত বেদনাকে এতক্ষণ সে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল, এই মুহূর্তে ফেটে পড়ে। কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে তার দেহ।

বেলভিনো তখন বক বক করছে, "কি যে হলো তোমার জোয়েত, কিছুই বুঝতে পরেছি না।"

ছুটে এলো সারভিনি। জোয়েতের কাঁধে হাত রেখে মধুর স্বরে বললো, "ছিঃ ; এ রকম পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কাঁদতে নেই। লোকে কি বলবে ? চলো, ঘরে ফিরে চলো। এরকম আমোদ ফুর্তি যদি ভালোই না লাগে, তবে তুমি যোগ দাও কেন ?" সারভিনি জোয়েতের হাত ধরে এক রকম হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলে। ভিলাতে ঢুকেই জোয়েত তার হাত ছাড়িয়ে নেয়, ছুটে পালায় নিজের ঘরে।

ঘর থেকে যখন সে বের হলো, তখন ডিনারের আসন পাতা হয়েছে। অদ্ভুত বিষণ্ণতায় সে বুঝি বিধ্বস্ত। চোখের দৃষ্টি জাগতিক নয়। এরা সকলে কিন্তু জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সারভিনি কোত্থেকে একটা মজুরের কালি-ঝুলি পোশাক পরে দেহাতী ভাষায় গেঁয়ো রসিকতা করছে।

নীরবে খাওয়া শেষ করলো জোয়েত। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়েই ফিরে গেল নিজের ঘরে।

নীচ থেকে তাড়া করে আসছে ওদের সমবেত হুল্লোড়। সস্তা

আলোচনা, স্থূল মন্তব্য অথবা, অশ্লীল খিস্তি। সারভিনি অকণ্ঠ পান ক'রে মাতলামি শুরু করে দিয়েছে। মারসিঅনেস এতক্ষণ ভিলার মধ্যেই ছিল। এবার আবার উৎসবের সামিল হতেই নেশাড়ু সারভিনি তাকে হঠাৎ 'মিসেস ওবারদি' বলে অভিবাদন জানালো। সেভেল এসে দাঁড়াতেই তাকে বললো, "হ্যালো, মিষ্টার ওবারদি!" পুলকে মারসিঅনেস সেভেলকে বুকের কাছে টেনে আনে।

আর ঠিক সেই সময় মৃত্যুর শপথে স্থির জোয়েত প্যাডের একটি পৃষ্ঠায় সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লিখছে ঃ

'বগিভাঁ'

রবিবার, রাত ন'টা।

"গণিকা হবার পরিণতি এড়াতে আমি বেছে নিলুম আত্মহননের পথ।"

জোয়েত।

খামে চিরকুটটা ভরে খামের উপর লিখলো—'মাদাম লা মারসিঅনেস ওবারদি।'

তারপর চেয়ারটাকে টেনে আনলো জানালার কাছে। চেয়ারে শায়িত তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ শিথিল, হাত জোড়া টেবিলের উপর, হাতের কাছে তুলোর ছিপি আঁটা ক্লোরোফরমের বড় শিশিটা। একটা মস্ত গোলাপ গাছ উঁকি মারছে এ ঘরের জানালা দিয়ে। বাতাস গোলাপ গন্ধে মঁ মঁ। মিশকালো আকাশে এক চিলতে বাঁকা চাঁদ, পাতলা মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি চলছে কখন থেকে।

জোয়েত মনে করবার চেষ্টা করলো, এই তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলি···এরপর সে নেহাৎ স্মৃতি হয়ে যাবে গভীর বেদনাবোধ, বুক ফাটে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আহ! এ সময় কেউ কি তাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা উপহার দিতে পারে না? এই দুনিয়ায় কেউ কি তাকে দয়া করতে পারে না?

সারভিনির একবকানি কানে এসে লাগছে। বস্তাপচা উপমা আর রসের গল্পে সব মশগুল। হো-হো-হো হি-হি-হি···। মারসিঅনেস তো একেবারে আত্মহারা, সারভিনিকে তারিফ জানিয়ে বলছে, "তোমার মতন এমন সুন্দর ক'রে কেউ বলতে পারবে না।"

শিশি থেকে খানিকটা তরল পদার্থ তুলোতে ঢাললো জোয়েত। তীব্র ও মিষ্টি ঝাঁজালো গন্ধ নাকে এসে লাগে।

সেই তুলোটা জিভে ঠেকাতেই বিজাতীয় স্বাদ, জোয়েতের বুক ঠেলে কাশি এলো।

জোরে শ্বাস নিয়ে সেই গরল গিলে নিলো জোয়েত। আর দরকার নেই. নিশ্চয় এতেই তার মৃত্যু আসবে, অতি সন্তর্পণে ঘটবে তার আবির্ভাব—জোয়েত নিজেই টের পাবে না কখন সে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

দুঃখ নেই, বেদনা নেই—সব উবে যাচ্ছে।

সুখকর হিমেল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। সে এখন ভিন্ন-লোকের যাত্রিনী! এই তবে মৃত্যু! সুন্দর!

হঠাৎ সে সচেতন হ'য়ে উঠলো—আশ্চর্য!

এখনো যে আমি মরিনি। এই যে আমি জীবিত এবং তুলোটা শুকিয়ে গেছে।···তার ইন্দ্রিয়গুলি আদৌ বিকল হয়নি, বরং তারা আরো অনুভূতি প্রবণ হয়ে উঠেছে।

নীচ থেকে ভেসে আসা প্রতিটি শব্দ তার কাছে এখন স্পষ্টতর। প্রিন্স ক্রাভালোর নানা উপমায় ব্যাখ্যা করছে, একদা সে কিভাবে ড়ুয়েলে খতম করেছিল এক অষ্ট্রিয়ান জেনারেলকে।

দূরে কোথায় ঢং ঢং ক'রে পেটা ঘড়ি সময় জ্ঞাপন করে। রাস্তার কুকুর ঘেউ ঘেউ ডেকে যায়। ভেককুলের ঐক্যতান শ্রুত হয়। বাতাসে ঝরা পাতার খস্ খস্ রব।

আর এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে সে নাকের কাছে ধরলো, আবার সেই মিষ্টি ঝাঁজালো গন্ধ। মাথার ভিতরে ঝিম ঝিম। দু'বার এরকম ওষুধ-ঢালা তুলোতে ঘ্রাণ নিলো সে। এবার সত্যি সত্যি তলিয়ে যাচ্ছে ঘুমের অতলান্তে। তার দেহ থেকে খসে খসে পড়ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিহীন দেহে কেবল তার চৈতন্য জীবিত, যার দ্বারা অনুভূতি বুঝি আরো তীক্ষ্ণ।

অতীতের স্মৃতিগুলি ক্রমশই জীবন্ত। ছেলেবেলাকার ফেলে-আসা নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ দিনগুলিকে দেখতে পাচ্ছে জোয়েত। বড় ভালো লাগছে।···

তখনো বারান্দায় ওদের আসর জমজমাট। জোয়েতের কাছে এমত বর্তমান এখন অর্থহীন। নীচ থেকে ভেসে আসা শব্দগুলি তার মর্মস্থলে প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না।

মনে হচ্ছে, সে যেন একটা বিরাট নৌকায় চেপে ভাসমান। তরুণী চলেছে এক ফুলের দেশের কিনার ঘেঁষে। তীরে কত লোকজন তাকে দেখে উল্লাস প্রকাশ করছে। হঠাৎ জোয়েতের মনে হলো, সে ঐ পুষ্পিত দেশের মধ্য দিয়ে একাকী আপন সুখে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আচমকা কোত্থেকে এসে হাজির হলো সারভিনি – সে নাকি তাকে ষাঁড়ের লড়াই দেখাবে! সারভিনির পোশাক রাজপুত্রের মতন জমকালো! কোথা থেকে আবার ভিড় জমিয়েছে গাদা গাদা লোক। বক-বক-বক-বক। হাঁ, এরা সকলেই তার পরিচিত।···

কিছুক্ষণ একেবারে চেতনাশূন্য অন্ধকার। তারপর আবার চৈতন্যের উন্মেষ। অর্থাৎ, এই উজ্জ্বল পৃথিবী ছেড়ে এখনো সে অচেনা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসায়নি। অদ্ভুত স্বস্তি ও সুখ! যদি এমন জবু থবু নিথর দেহে চন মনে কল্পনা বহুকাল জীবিত থাকে, বড় ভালো হয়! বুকের এই কল্লোলধ্বনি চিরজীবি হোক! দম নিয়ে মাথাটা ঈষৎ ঘুরিয়ে তাকালো জোয়েত। আধখানা চাঁদ আটকে আছে ঝাঁকড়া গাছের

মাথায় আর তো কোন জ্বালা-যন্ত্রণা. দুঃখবোধ তাকে পীড়িত করছে না! না, সে মরবে না! তিল তিল সংগৃহীত নীরবতায় সে বেঁচে থাকবে।

কেন সে বাঁচবে না।

কেন সে ভালোবাসা পাবে না?

সুখে বেঁচে থাকতে তার বাধাটা কোথায়?

পৃথিবীটা ঈশ্বর মাত্র কয়েকজনের কাছে বিক্রী করে দিয়ে যান নি।

জীবন, আহ্, জীবন বড় মূল্যবান, মধুর, রমণীয়। আরো কিছুটা তরল সুমিষ্ট গন্ধ গ্রহণ করলো জোয়েত। এই দ্রব্যটির গুণে স্বপ্ন তার দীর্ঘতর হবে, কিন্তু মৃত্যু আসবে না।

ঐ সুন্দর মুখ, অসাধারণ স্বর তার আবাল্য পরিচিত,—তার মা মারসিঅনেসের। তার মার মতন এমন সহজ, ঋজু মহিলা আর কেউ হতে পারে না।

নীচে, আসরে, তখন মারসিঅনেস বসে গান ধরেছে।···

জোয়েতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, কিন্তু দুটো ডানা পেয়েছে সে। নীরব নিকষ রাতে বনাঞ্চলের ওপর দিয়ে দূর-দূরান্তরে উড়ে যাচ্ছে সে। নিঃসীম মহাশূন্যে সুখ-সুখ। বাতাসের স্নেহ পরশে দেহ পুলকিত; ঘুমন্ত বুকের কাছে কোন দুঃস্বপ্ন নেই। সে মহানন্দে এত জোরে পাক খাচ্ছে যে, নীচের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।···হঠাৎ দেখলো, সে যেন একটা পুকুরে ছিপ্ ফেলে বসে আছে। ছিপ্ তুলতেই দেখলো, বড়শিতে গাঁথা রয়েছে তার বড় প্রিয় আকাঙ্খার বস্তু একছড়া মুক্তোর মালা। কখন যেন তার পাশে ছিপ্ হাতে বসে পড়েছে সারভিনিও। সারভিনির বড়শিতে গেঁথে উঠলো একটা কাঠের ঘোড়া।

স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল।

আবার একটু একটু ক'রে বর্তমানে ফিরে আসছে জোয়েত।

নীচে তার নাম ধরে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি।

মারসিঅনেসের গলা: জোয়েত, বাতি নিভিয়ে দাও।

সারভিনির সোচ্চার রসিকতা ঃ মামজেল জোয়েত, অত আলোতে তো তোমার নিদ্রা ও স্বপ্ন—দুই-ই অসম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকের সরস-ধ্বনি ঃ আলো নেভাও, রাজকুমারী, আলো নেভাও!

জোয়েত ঘরময় মাদক গন্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে থাকে। তারপর এক বিশেষ লোভনীয় ভঙ্গীমায় দেহটিকে গুটিয়ে নেয়। মৃত্যুর ইচ্ছা তার মৃত। এখন শুধু প্রতীক্ষা করছে ওদের।

মারসিঅনেস বলছে, "মেয়েটা আমার আচ্ছা বোকা। আলো জ্বালিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে!"

চিন্তার কথা। বারেন্দার দিকের জানালাটাও খোলা।

মা বললো, "ক্লিমেন্স, তুমি যাও তো উপরে – ও ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো। জোয়েতের ঠাণ্ডা লেগে যাবে!"

পরিচারিকা ক্লিমেন্স ওপরে গিয়ে জোয়েতের ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয়, "মাদমোয়াজেল, মাদ্‌মোয়াজেল···" সাড়া নেই।

ক্লিমেন্স আবার চড়া গলায় বললো, "মাদ্‌মোয়াজেল, মাদাম লা মারসিঅনেস আপনাকে বাতি নিভিয়ে জানালা বন্ধ ক'রে শুতে বলেছেন।"

উত্তর নেই।

এবার সে চিৎকার ক'রে ডাকলো "মাদ্‌মোয়াজেল, মাদ্‌মোয়াজেল।"

নিঃসাড়।

ক্লিমেন্স নীচে নেমে গিয়ে জানালো, "মাদ্‌মোয়াজেল ভয়ঙ্কর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছেন। গলার স্বরে কামান দাগিয়েও জাগানো গেল না।"

মা মন্তব্য করলো, "এভাবে ঘুমোনোটা ঠিক নয়।"

সারভিনির নেতৃত্বে সকলে মিলে জোয়েতের জানালা বরাবর দাঁড়িয়ে হুল্লোড় তুললো, "হিপ্ হিপ্ হুররে, মামজেল জোয়েত!"

সেই সমবেত হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব রাত্রির স্তব্ধতা চিরে খান খান করে দেয়।

তবু তো জোয়েতের সাড়া নেই।

মারসিঅনেসের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা, "ওর কিছু হয়নি তো?"

অনেকগুলি গোলাপের কুঁড়ি যোগাড় ক'রে সারভিনি একটার পর একটা ছুঁড়তে থাকে খোলা জানালা দিয়ে। প্রথমটা গায়ে পড়তেই দারুণ আঁতকে উঠেও নিজেকে সামলে নেয় জোয়েত। এরপর অনেকগুলি ফুল এসে পড়তে থাকে তার উপর। নিশ্চল জোয়েত নিশ্চুপই থাকে।

মারসিঅনেসের স্বরে আতঙ্ক, "জোয়েত, সাড়া দাও।"

গম্ভীর সারভিনিও, "ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না। বারান্দার পাঁচিল বেয়ে আমাকে ঐ ঘরে নামতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয় কাভেলিয়ার, "না, তা হবে না। ব্যাপারটা তোমাদের সাজানো। আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমরা দু'জনে এভাবে মিলিত হবে! এ চক্রান্ত চলবে না!"

প্রতিধ্বনি দিয়ে ওঠে আরো অনেকে, "এ চক্রান্ত চলবে না! সব সাজানো ব্যাপার!"

মারসিঅনেস বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে পারে না, "আঃ! ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে! একজন তো ঢুকে দেখতেই হবে।"

প্রিন্স নাটুকে গলায় ক্ষেভের সঙ্গে বললো, "বুঝেছি বুঝেছি। আমি হলপ ক'রে বলছি, মাদাম ডিউককেই দুর্লভ সুযোগটা দিতে চায়। আমাদের সঙ্গে তঞ্চকতা করা হলো। জোয়েতের জন্য আমাদেরও জান কবুল।"

কাভেলিয়ার পকেট হাতড়ে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের ক'রে লটারির প্রস্তাব দেয়, "টস্ ক'রে স্থির করতে হবে, কে সুযোগ পাবে, আর কারা পাবে না।"

প্রথমেই এগিয়ে এলো প্রিন্স ক্রাভালো। বললো, "টেল।"

কিন্তু মুদ্রা-উৎক্ষেপণের ফল জানা গেল—'হেড।'

এলো সেভেল। তার বাজি 'হেড'। কিন্তু ফল এলো বিপরীত।

একে একে সকলেরই ভাগ্য পরীক্ষিত। কেউই উত্তীর্ণ হলো না।

বাকি রয়েছে শুধু সারভিনি। কিন্তু সে নিজের হাতে মুদ্রা ছুঁড়েও প্রার্থিত ফললাভে ব্যর্থ হলো।

হঠাৎ সারভিনি প্রিন্সকেই প্রস্তাব দিয়ে বসলো, "প্রিন্স, তুমিই যাও।" এই আকস্মিক সুযোগ পেয়ে হতবুদ্ধি প্রিন্স এদিক ওদিক তাকাতে থাকে।

কাভেলিয়ার জিজ্ঞেস করলো, "কি খুঁজছো তুমি, প্রিন্স?"

"আমি, আমি··মানে যদি একটা ইয়ে—মনে যদি একটা মই পেতাম—"

প্রিন্সের ভীরুতা ও অক্ষমতাকে কেন্দ্র ক'রে সকলের অট্টহাসি ফেটে পড়ে।

বিপুলদেহী সেভেল এগিয়ে এসে প্রিন্সকে বললো, "ঠিক আছে, আমি আপনাকে সাহায্য করছি।"

—বলেই প্রিন্সকে মাটি থেকে সোজা উপরে তুলে ধরে বললো, "ধরুন এবার বারান্দার কার্নিশটা শক্ত করে।"

প্রিন্স দু'হাতে আঁকড়ে ধরে কার্নিশ, সেভেল তখনই তাকে ছেড়ে দেয়।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য!

হাতে ভর দিয়ে শূন্যে দোদুল্যমান প্রিন্স বাতাসে খাবি খাচ্ছে। মজাটা আরো জমলো, যখন সারভিনি প্রিন্সের ঝুলন্ত ঠ্যাং দুটো চেপে ধরে নিজেও দুলতে লাগলো। প্রিন্সের বিপদ বুঝে তেড়ে-ফুঁড়ে ছুটে আসছিল বেলভিনো। কিন্তু ঠিক তখনই আর সামলাতে না পেরে প্রিন্স একেবারে হুড়মুড়িয়ে পড়লো বেলভিনোর গোলগাল ভুঁড়িটির ওপর।

সারভিনির চকচকে ধারালো দৃষ্টি সকলের মুখের উপর ঘোরে। তার তেজী জিজ্ঞাসা, "এবার কে যেতে চায়?"

সকলের মুখ চুপ। রা টি নেই।

বেলভিনোর দিকে চেয়ে সে বললো, "মঁসিয়ে বেলভিনো, তুমি তোমার সাহস ও কসরৎ দেখাও।"

"আরে না, না। তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পৈতৃক প্রাণ নিয়ে মানে মানে এবার আমি ফিরে যেতে পারলেই বাঁচি।"

"কাভেলিয়ার তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখবে নাকি? প্রায়ই তো উঁচু উঁচু দুর্গ পার হবার গল্প বলে থাকো।"

কাভেলিয়ার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "বাছা ডিউক, দায়িত্বটা এবার আমরা সমবেতভাবে তোমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলুম।"

"উত্তম। চেষ্টার কসুর করবো না, যদিও তোমাদের মতন বড় বড় বাত্ আমি মারি না।"

অতঃপর সারভিনির সামগ্রিক সপ্রতিভ আচরণে যথার্থ পৌরুষের ছায়াপাত। সে পিলারটার চারপাশে বারেকের জন্যে চক্কর কাটে, পরখ করে, তারপর একলাফে বারান্দার কার্নিশে। সেখান থেকে বরগা ধরে ধরে এগুতে থাকে সারভিনি।

নীচের দর্শকরা বাহবা না দিয়ে পারলো না।

যেন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে লোকটা!

সারভিনির গতি কিন্তু ক্রমশঃ শ্লথ, কেমন যেন উদ্বিগ্ন চরণে সে এগিয়ে গেলো সেই জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে এবং পরক্ষণেই ছিটকে সরে এসে আর্তনাদ করে ওঠে, "তোমরা শীগ্‌গির এসো। শীগ্‌গির জোয়েতের জ্ঞান নেই!···

ডুকরে কেঁদে ওঠে মারসিঅনেস, এক রকম গোঙাতে গোঙাতে ছুটতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে। তামাসাপ্রিয় মতলববাজ লোকগুলিও শুকনো চিন্তিত মুখে ছুটে আসে উপরে।

ঘরে ঢুকে কপাট খুলে দিয়েছে সারভিনি।

আকুল মারসিঅনেস ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়ের বুকের ওপর, "তোর কি হয়েছে, আমাকে বল। মা, তুই মুখ খোল।"

ক্লোরোফরমের শিশিটি তুলে সারভিনি বললো, "স্বেচ্ছায় অজ্ঞান হবার ওষুধ ব্যবহার করেছে জোয়েত।"

তারপর নীচু হ'য়ে জোয়েতের বুকে সে কান পাতে, বলে, "এখনো মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। এখুনি ওকে সুস্থ ক'রে তোলা দরকার। একটু এ্যামোনিয়া পাওয়া যাবে এই বাড়িতে ?"

ঝি ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞেস করে, "কি চাইছেন স্যার, আমাকে বলুন !"

"সলভোলেতাইল জাতীয় কোন ওষুধ ?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"এক্ষুনি ছুটে নিয়ে এসো। আর এই ঘরের জানালা-দরজা সব খুলে দাও, বাতাস খেলুক।"

মারসিঅনেস ভেঙ্গে পড়েছে কান্নায়, "জোয়েত, জোয়েত, সোনা, মা মণি আমার, এ তুই কি করলি ! ওহ্ ! ঈশ্বর ! তুমি আমায় একী শাস্তি দিচ্ছো, ঠাকুর !..."

হতভম্ব, হতচকিত আর সকলে কে কি করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। কেউ টেনে আনছে বালতিতে ক'রে জল, কেউ এনে রাখছে তোয়ালে, কেউ আবার গেলাস ও ভিনিগার নিয়ে দিশেহারা। তারই মধ্যে কার যেন সুযুক্তি শোনা গেল, "মেয়েটার গা থেকে জামা খুলে নেওয়া দরকার।"

কাঁপা হাতে মারসিঅনেস চেষ্টা করলো জোয়েতের জামার ফিতে খুলতে, কিন্তু বিহ্বল হাতে এটা-ওটা টানাটানিতে গিঁট আরো কষে যায়। ভাঙ্গা গলায় ডুকরে কেঁদে ওঠে মারসিঅনেস, "আমি পারছি না —ওগো, আমার আর শক্তি নেই।"

ঝি ওষুধ নিয়ে এলো।

ধীরে সুস্থে সেই ওষুধ রুমালে ঢেলে জোয়েতের নাকের কাছে চেপে ধরলো সারভিনি।

তৎক্ষণাৎ জোয়েতের শরীরটা নাড়া-চাড়া খেয়ে ওঠে। খুশিতে

ঝলমল করে সারভিনির চোখ, "শুভ লক্ষণ। ভয়ের কোন কারণ নেই। জোয়েত স্বাভাবিক হ'য়ে উঠলো বলে!"

সারভিনির নির্দেশে ঝি জোয়েতের বসন খুলতে থাকে। একটির পর একটি। শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছ অন্তর্বাসটি ছাড়া জোয়েতের শরীরে আর কোন আবরণই রইলো না। প্রাণৈশ্বর্যের ও রূপৈশ্বর্যের রাণী যেন তার যৌবনের শেষ সুপ্ত স্থানটিও এই মুহুর্তে মেলে ধরবে। ঘন পাঁপড়ি সমেত একটি পরিপুষ্ট ফুলের মতন বসনের আড়ালে ফুটে আছে ওটি। স্পষ্ট, খুবই স্পষ্ট তার অবস্থান ও চিহ্নগুলি। সারভিনি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দেয়। জোয়েতের স্বল্পাবৃত স্তন ও অনাবৃত পেটের নিবিড় স্পর্শে সারভিনির শিরা-উপশিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সংযমের প্রায়স সত্বেও উত্তেজনার ধারা নিম্নমুখী। মারসি-অনেসের দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনি অস্থির হবেন না। জোয়েত সুস্থ হ'য়ে উঠছে।"

হঠাৎ তার খেয়াল হলো, জোয়েতের অর্ধাবৃত দৈহিক সুষমাকে অনেকেই যেন চক্ষু দিয়ে লেহন করছে।

এই প্রথম ঈর্ষায় দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো সারভিনি, "এই যে মশাইরা, আপনাদের অভিজ্ঞতা আর কেরামতির দৌড় ধরা পড়ে গেছে। এবার দয়া করে অসুস্থের ঘরে ভিড় জমাবেন না। যান, আপনারা—যান, আপনারা এখান থেকে। শুধু আমি, সেভেল, আর মারসিঅনেস থাকবো এখানে।"

সারভিনির ধমকে পিছু হটে গেল তারা!

জোয়েতকে ঘিরে রইলো শুধু এই তিনজন—মারসিঅনেস, সারভিনি ও সেভেল।

মারসিঅনেস সেভেলকে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষতে ঘষতে বললো, "ওকে বাঁচিয়ে তোলো প্রিয়, ও যে আমার প্রাণের অধিক।

পিছনে ফিরে সারভিনি আবিষ্কার করলো জোয়েত-লিখিত দুটি চিরকুট ঃ—

"গণিকা হবার পরিণতি এড়াতে আমি বেছে নিলুম আত্মহননের পথ" —জোয়েত।

"আমায় বিদায় দাও মাগো, আমার ক্ষমা করো"—জোয়েত।

চিঠি দুটি পকেটে পুরে সারভিনি মনে মনে ভাবলো, "ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আমি পরে ভাববো!"

মারসিঅনেস তখনো হাঁপুস নয়নে কাঁদছে, "একজন ডাক্তার ডাকা দরকার!"

"—না, তাতে অনেক কৈফিয়ৎ-এর জালে জড়িয়ে পড়বেন," দৃঢ়স্বরে সারভিনি বললো, "আমিও জানি এ অবস্থায় কি করতে হয়। কেবল কয়েকমিনিটের জন্য বাইরে যান। আমি ওকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তুলছি।" সেভেল মারসিঅনেসকে নিয়ে চলে যায়।

সারভিনি জোয়েতের একখানা হাত তুলে নিয়ে মধুর স্বরে বলে, "ম্যামজেল, চোখ মেলে আমার দিকে তাকাও, কথা বলো!"

সুমিষ্ট স্বপ্নের সৌরভ নিয়েই জোয়েত তার আশ্চর্য আয়ত চক্ষু দুটি মেলে ধরে।

সারভিনি বললো, "এবার উঠে বসো। কেন এমন বোকামি করতে যাচ্ছিলে?"

জোয়েত ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করলো, "আমার বড় কষ্ট মাস্কেদ।

সারভিনি ওর ঘাড়ে আঙ্গুল বোলাতে থাকে, নরম গাল দুটো আদর ক'রে টিপে বললো, "ছিঃ। এরকম বোকামি করতে নেই। প্রতিজ্ঞা করো—আর কখনো এরকম বিপজ্জনক পরীক্ষা চালাবে না।"

জোয়েত নিঃশব্দে সম্মতি জানায়।

সারভিনি ওর অন্তরসম্পদকে অনুভব করে বিস্মিত, শ্রদ্ধান্বিতও বটে।

মারসিঅনেসের এমন মেয়ে! আশ্চর্য।

জোয়েতের চিঠি দুটো বের করে সারভিনি সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো, "দেখাবো নাকি এটা তোমার মাকে?"

জোয়েত মাথা নাড়িয়ে নিষেধ করে।

সারভিনি ওকে মৃদু. অন্তরঙ্গ স্বরে বলতে থাকে, "প্রিয়া, পৃথিবীতে যখন এসেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ক'রে যেতে হবে। শত দুঃখেও ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। আমি বুঝতে পারছি, কোথায় তোমার দুঃখ। আজ এখন আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—"

সারভিনির প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হবার আগেই জোয়েত তার মুখে হাত চাপা দেয়, "শপথের দরকার নেই। তুমি অতি দয়ালু, মাস্কেদ। তুমিই আমার সর্বস্ব।"

এরপর কিছুক্ষণ তারা কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

সারভিনি তার পরিচিত পটভূমি ছেড়ে এখনই যেন দূরে—অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। সমাজ, পরিবার, ভবিষ্যৎ—সব অর্থহীন। সারভিনি একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেই অপরূপার দিকে। জোয়েত নিজেকে, এই প্রথম, সমর্পণ করতে উন্মুখ। কিন্তু সারভিনির ভিতর আজ বিবেক মাখানো প্রেম। সে অন্যায় না করতে বদ্ধপরিকর। তবু এক সময় বিপুল আবেগে জোয়েতকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে। দীর্ঘ-সুদীর্ঘ চুম্বনে দুটি সত্তা একাকার!

অনেকক্ষণ কেটে গেল ঐ আচ্ছন্নতায়। সারভিনি আবার উত্তেজনায় তপ্ত হয়ে ওঠে।

তবু নিজেকে সংযত রেখে সে উঠে দাঁড়ায়।

জোয়েতের মুখে পরিতৃপ্ত প্রেমের হাসি।

সারভিনি বললো, "তোমার মাকে ডেকে আনি?"

জোয়েত মদির স্বরে বললো, "আর একবার আমার একান্তে এসো। বড় ভালো লাগছে।"

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমার কাছে সারাজীবন থাকবে তো?"

শপথ নেয়, "তোমাকে আমি শ্রদ্ধাও করি জোয়েত।"

মারসিঅনেসকে ডেকে আনলো সারভিনি। মা ঝাঁপিয়ে পড়লো মেয়ের বুকে। দু'জনেরই চোখে জল।

সারভিনি এখন খোলা বারান্দায়। বাতাসের দাপট। সে বুক ভরে দম নেয়। অনাস্বাদিত এক আনন্দ।

———

জর্জ মুর

ওয়াইল্ড গুজ

[আয়ার্ল্যাণ্ড]



ভাষান্তর:

উৎপল ভট্টাচার্য

মনে পড়ছিল সেই সবুজ দেশের আঁকা-বাঁকা ভূমির বুকে ধোঁয়া ধোঁয়া বৃক্ষের সারি, পরিষ্কার উজ্জল দিনে যার মুক্তো বর্ণের পর্বতশ্রেণী দিগন্ত জুড়ে দৃশ্যমান। যখন তার ন'বছর বয়স তখন সে মা-বাবার সঙ্গে ম্যাঞ্চেষ্টারে আসে। আর ষোল বছর বয়সেই সে ভাবল—ম্যাঞ্চেষ্টার ছেড়ে পালাতে হবে—এই একঘেয়ে, ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, লম্বা লম্বা ইঁটের চিমনী দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া আকাশ বাতাস ভারী করে রাখে সব সময়। তাই মহাদেশে ভ্রাম্যমান এক সার্কাস দলের সঙ্গে ভিড়ে গেল সে। নিউ হাভেন থেকে ডিয়েপে এল সার্কাসের সিংহগুলোর দায়িত্ব নিয়ে। পথে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ল সার্কাস দল। নেড কিছুতেই সামলাতে পারল না। প্রচণ্ড দুলুনীতে বাতাস ঢুকবার কোকড়গুলো বন্ধ হয়ে আটকে গেল। ফলে ওরা যখন ডিয়েপে যখন পৌঁছল তখন সবচেয়ে ভাল সিংহটা মরে গেছে।

"যাকগে, সিংহদের লালন পালন ছাড়াও জীবনের অন্যতর উদ্দেশ্য আছে", সে বলল। তারপর বেহালাটা তুলে নিয়ে অখণ্ড মনোযোগে বাজাতে সুরু করল। আটলান্টিক সমুদ্র পাড়ি দিতে তার বেহালা বাজান শুনে অনেকেই প্রচুর তারিফ করল, এমন কথাও বলল অনেকে যে তার কোন অপেরাতে যোগ দেওয়াতে কোন বাধা থাকতে পারে না। কিন্তু—ইন্টারভ্যু দিয়ে তার ভ্রম ভাঙল। সঙ্গীত পরিচালকের কথায় নেড বুঝল অপেরার পক্ষে তার বাজনা অচল। অতএব সাঙ্গীতিক জীবনে তার এখানেই ইতি পড়ল। অপেরা ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিয়ে কয়েকটা খুচরো পেন্স নাড়াচাড়া করতে করতে তাই ভাবছিল সে এবার কি করবে। সেই সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হল। কথায় কথায় ভদ্রলোক তাকে বলল যে একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারলে দশ পাউণ্ড রোজগার হতে পারে। মনে পড়ল তার ম্যাঞ্চেষ্টারে স্কুলে সে ভালই ম্যাপ

আঁকত। একটা টেবিলে কাগজপত্র এঁটে বসে গেল সে আর পনের দিনের মধ্যে মানচিত্রটা এঁকে ফেলল। একটা খনি এলাকার মানচিত্র সেটা। হাতে আর কোন কাজ নেই দেখে তার ইচ্ছে হল একবার খনিটা দেখে এলে হয়। মালিক পক্ষ তাকে উৎসাহ দিল। সকালের দিকে সে খনিতে কাজ করে আর বিকেলে বেহালাটা নিয়ে বসে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে সাংবাদিক বৃত্তিই বেছে নিল। অনেক ঘুরল আর লিখল। শেষে—একদিন নিউইয়র্কে এসে একটা সংবাদপত্রের সঙ্গে চুক্তি করে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই সংবাদ লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। তখন নেড স্বেচ্ছায় কিউবা চলে যেতে চাইল। বিদ্রোহী-দের সম্পর্কে রাগী প্রবন্ধ লিখল। ফলে আমেরিকা স্পেনীয়দের ওপর ক্ষেপে গিয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এবং নেড আমেরিকানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল আর এমন লড়াই করল যে যুদ্ধটা হঠাৎ থেমে না গেলে হয়ত সে জেনারেল টেনারেলই হয়ে যেত। যাহোক, যুদ্ধ শেষ হল, আর নিউইয়র্কের ওপর বিরক্তি ধরে গেল তার। ভাবল, এবার ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। ইয়োরোপ দেখার ইচ্ছে। মনে পড়ল মেথ্-এর সেই সবুজ প্রান্তরের কথা। "আমি আয়ার্ল্যাণ্ডে যাব।" সে বলল মনে মনে।

বাবা-মা আগেই মারা গেছে। আত্মীয় স্বজনের কথা মনেও স্থান দিল না সে। কেবলই মনে পড়তে লাগল কত না বিচিত্রপথে জীবনটা ব'য়ে গেছে। সেই সার্কাস দলের সঙ্গে থাকা, খনিতে কাজ করা, স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কিউবানদের প্রতি তার সহানুভূতি,—আসলে গল্‌জাতির সুযোগ্য বংশধর বলে সে গর্ববোধ করল। এবং এই কারণেই আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে বলে অনুভব করল। ইংলণ্ডের শক্তি অনেক বেশী, কিন্তু স্পেনীয়দের শক্তিও কম ছিল না। কিন্তু শক্তির গর্বই কাল হল স্পেনীয়দের। দিন একরকম থাকে না। এখন ইংলণ্ড ক্ষয়িষ্ণু, তাই আয়ার্ল্যাণ্ড এখন জাগবে। সুদিন হয়ত

আসছে আয়ার্ল্যাণ্ডের। তাই যদি হয় তেমন সময়ে তাহলে সে নিশ্চয়ই সেখানে বা কাছাকাছি কোথাও অবশ্যই থাকবে।

সে সোজা টারা চলে এল। পরদিন সকালে পুরোণ জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল। বিকেলে গেল একটা সরাইখানায়। গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে পরিচয় হল। তাদের সরল কথাবার্তায় মুগ্ধ হল সে। ঘুরে ঘুরে লোকজনদের সঙ্গে, তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিল। এই সমস্ত দরিদ্র, সরল লোকদের নিয়ে কয়েকটা প্রবন্ধ সে লিখবে বলে স্থির করল।

"ওরা কুহুলানের কথা বলে," সে বলল, "কিন্তু পাদ্রীমাশাইকে খুব পছন্দ করে, তাই সারাজীবন ধরে পাদ্রীমশাইয়ের চরণে সব নিবেদন করে যাচ্ছে। আমার বইটার নাম দেব "পশ্চিমের থিবেট", আমার বইয়ের উপযুক্ত নাম হবে!" আর গেটের ওপরে কনুয়ের ভর দিয়ে সামনে বিস্তৃত ধানের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে যেন বইয়ের শেষ অধ্যায়টাও স্বচক্ষে দেখতে পেল সে।

বই যখন এবার একটা লিখতেই হবে, আমেরিকায় ফিরতে আর ইচ্ছে হল না তার। ভেবে মনে মনে সে আনন্দিতই হল যে আগামী বসন্তকালের আগে সে আমেরিকা ফিরে যাচ্ছে না। কেন না আরাম করে থাকবার মত একটা ভাল ঘর এখানে একটা খামার বাড়ীতে জুটে গেছে। ফলে এখানকার—জীবনযাত্রা আর লোকজনদের মনের গহনে সে সহজেই ডুব দিতে পারবে। তাই হয়ত হত। পরিকল্পনা মত বইটা সে লিখে ফেলতে পারত যদি না ঈলীন ক্রোনিনের সঙ্গে মাঝে পরিচয়টা ঘটত।

প্রতিবেশী এক ধনী কৃষক কন্যা ঈলীন। অনেক কথাই সে শুনেছে এই মেয়েটি সম্বন্ধে। বিদূষী এবং সুন্দরী। মালিক গিন্নীতো কথা উঠলেই একনাগাড়ে প্রশংসা করতে থাকেন। ঈলীনের ডিম্বাকৃতি মুখটা দেখতে দেখতে তারও খুব ভাল লাগে একথা সে অস্বীকার করতে পারে না।

"এ বাড়ীতে আসত তো," মালিক গিন্নী বলতে থাকে, "আমার ছেলে জেমসের বয়সী—চা খেত, গল্প করত, কাগজের নৌকো বানাত ঐ গাছের নীচে বসে।"

মানসচক্ষে ওদের গাছের নীচে বসে নৌকো বানান দেখে আনন্দই পেল নেড। মালিক গিন্নীকে উস্কে দিল ঈলীনের সম্পর্কে আরও কিছু বলার জন্য। মালিক গিন্নী উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগল যে ঈলীন বারো বছর বয়স পর্য্যন্ত কিছুই লেখাপড়া করেনি। শেষে পাদ্রীমশাই ওকে লেখাপড়া শেখাতে থাকেন এবং ল্যাটিন ভাষাও শেখান।

নেড আরাম কেদারায় শুয়ে সব শুনছিল আর মৃদু মৃদু হাসছিল। এরপর থেকে ঈলীন বলতে গেলে নিজে নিজেই শিক্ষিতা হয়ে ওঠে। এবং নিজস্ব মতামত একটা স্বভাবতই গড়ে ওঠে ঈলীনের। ফলে ওর বাবার পুরোনো মতবাদের সঙ্গে ছোটখাট বিরোধ ঘটতে থাকে। বৃদ্ধ মিঃ ক্রোনিনের ধারণা যে আয়ার্ল্যাণ্ড একটা হতভাগা দেশ, কিন্তু ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঈলীনের কিন্তু যা কিছু আয়ার্ল্যাণ্ডের, সবই ওর ভাল লাগে। এমন কি ওর ধারণা এবং বিশ্বাস যে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ-এর চেয়ে ডাবলিন বিশ্বাবিদ্যালয় অনেক ভাল। এইখানে নেড ঈলীনের মতের সঙ্গে একমত। নেড ক্রমশঃ জানতে পারে যে কি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়—দু জায়গাতেই ঈলীন ভাল ছাত্রী বলে গন্য। নেড অবাক হয়ে যায় শুনে যে ঈলীনের বাড়ীতে অনেক অধ্যাপক আসতেন এবং ল্যাটিন ভাষা নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা হত ছাত্রী আর অধ্যাপকদের মধ্যে।

এসব অবশ্য অনেকদিন আগেকার কথা। এখন এই পণ্ডিত রমণীর মনোভাব কি—মালিক গিন্নীর কাছে তাই জানতে চাইল নেড। শুনে অবাক হল নেড যে এখন রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের সঙ্গেই ঈলীনের দহরম মহরম। ঈলীনের বাবার কাছে ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে, কারণ ইতিপূর্বে জাতীয় পার্লামেন্টের কোন সদস্য ওই বাড়ীতে কোনদিন পদার্পণ করেনি।—"বছর তিনেক আগে যারা

পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁটপাটকেল ছুঁড়ত—যাদের শত মুখে নিন্দে করতেন বৃদ্ধ মিঃ ক্রোনিন—এখন তারাই এক টেবিলে বসে মিঃ ক্রোনিনের সঙ্গে খানা খায়।” মানিক গিন্নী বললেন।—“ঈলীন ছোট ছোট ছেলেদের কি সব শেখায় আর তাই শুনে বৃদ্ধ মিঃ ক্রোনিন কপালে করাঘাত করতে থাকেন।

মালিক গিন্নীর কাছে ক্রোনিন পরিবারের গল্প বেশ মজা করেই শোনে নেড। কেন না, আজ সন্ধ্যের পর ওখানে তার নিমন্ত্রণ। মিঃ ক্রোনিনের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। লম্বা, পাতলা, দৃঢ়চেতা মানুষ দেখলেই বোঝা যায়। গলার স্বর কিছুটা কর্কশ হলেও আমন্ত্রণে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। আরও কয়েকজন বন্ধু আসবেন, গানবাজনার বন্দোবস্তও থাকবে।

নেডের জীবন তো এতাবৎকাল কেটেছে খবরের কাগজের অফিসে, থিয়েটারে, সার্কাসে আর তাঁবুতে। সমাজ সংসারের সঙ্গে পরিচয় তার সামান্যই। বিশেষ করে ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে সেজন্যেই আইরিশ বাসীদের সমাজ সম্পর্কে তার কৌতূহল আছেই! ক্রোনিন পরিবারের বাড়ীটা অষ্টাদশ শতাব্দীর লাল-ইঁট বার করা মলিন চেহারা। একটা বিরাট পার্কের মাঝে বাড়ীটি। চারদিকে পুরোনো, দাঁত বার করা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। চারপাশে বড় বড় গাছপালা, হাওয়ায় অনবরত দুলছে। কোন একটা গাছে বসে কোকিল ডাকছে। মাথার ওপরে আকাশ বিবর্ণ। কিন্তু তখনও সূর্যাস্তের শেষ আভা গাছের মাথায়। নেড ঘুরে ঘুরে তাই দেখছিল আর মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে এই দেশটাকে ওর যেন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হচ্ছিল! “—কেমন দেখতে মেয়েটা?—এমন সুন্দর পরিবেশে যে থাকে এমন রহস্যময়ী প্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির দুলালীর মত?”

কেউ একজন দেখিয়ে দিল ঈলীনকে। আর আলাপ করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল সে। কিন্তু ঈলীন তাকে দেখতে পায় নি। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল ও। ঈলীনের সাদা

পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা, রক্তিম কেশে হাড়ের চিরুণী গোঁজা—সবই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখল সে। একটা ছবির অ্যালবাম্ দেখছিল ঈলীন এবং ওর বন্ধুরা। আর নেড বৃদ্ধ মিঃ ক্রোনিনের কথায় অন্যমনস্কভাবে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক কিউবার যুদ্ধ বা আমেরিকা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। নেড যখন আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা জিজ্ঞেস করল তখন অল্প কয়েকটা কথা বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। আমেরিকা, আয়ার্ল্যাণ্ড নিয়ে বেশীক্ষণ কথা চালান গেল না দেখে মিস্ ক্রোনিনের কথা তুলল নেড। তখন বৃদ্ধ মিঃ ক্রোনিন উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তখন নেড বুঝতে পারল কন্যা সম্পর্কে বৃদ্ধ বেশ গর্বিত। তার কন্যা অক্সফোর্ডে যায়নি বলে তিনি দুঃখীত। গেলে যে সকলের ওপর স্থান পেত তার কন্যা এতে সন্দেহ নেই। নেড বুঝতে পারল যে মালিক গিন্নী ঠিকই বলেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে বৃদ্ধ নির্বিকার। এমন কি তার কন্যা যে আইরিশ ভাষায় কথা বলতে ভালবাসে—তাতেও তার বিরাগ।

"মিঃ ক্রোনিন," নেড জিজ্ঞেস করল—"আপনার মেয়েকে ফাদার ঈগান বোধহয় ল্যাটিন শিখিয়েছেন?"

"তাই," মিঃ ক্রোনিন বললেন,—"সেই সঙ্গে আইরিশ ভাষা আর রাজনীতিটা না শেখালেও পারতেন।" গলার স্বরে তার একটু বা ক্ষোভ।

মিঃ ক্রোনিন হঠাৎ চুপ করে গেলেন। অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নেড দেখল ঈলীন ঘরে ঢুকছে, বাবার সঙ্গে কথা বলতেই বোধহয়। মুখ দেখেই বুঝল নেড যে বাবার শেষের মন্তব্য কন্যার কানে গেছে। মুখ বেশ গম্ভীর। নেড ভাবল যে কোন একটা কথা বলে পরিবেশটা হালকা করে দেবে। কিন্তু তার আগেই লক্ষ্য করল ঈলীনের মুখের ভাব পাল্টে গেছে। গম্ভীর ভাব কেটে গিয়ে মুখটা ঈষৎ আনন্দে ভরে গেছে। নেডের বুঝতে বাকী রইল না যে তার উপস্থিতি ঈলীনকে খুশী করেছে। নেড বলেই ফেলল যে সে যে বাড়ীতে আছে সে বাড়ীর

গিন্নীর কাছে ঈলীনের কথা অনেক শুনেছে সে। ঈলীন জবাবে মালিক গিন্নীর খুব প্রশংসা করল। জানতে চাইল নেডের ঐ বাড়ীতে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। তারপর ওরা জানালার ধারে এসে বসল। জানালার লাল রঙের পর্দা হাওয়ায় দুলে দুলে একটা খস্‌খস্‌ রহস্যময় আওয়াজ তুলতে লাগল। জানলার বাইরে অন্ধকার উন্মুক্ত প্রান্তর আর বড় বড় গাছের ছায়া শরীর গুলো দুলে দুলে ওদের কথা শুনতে লাগল। নেড শুনল, ঈলীন মালিক গিন্নীর ছেলের কথা বলছে যে আমেরিকায় চলে গেছে। তারপর প্রতিবছর যে আরও চল্লিশ হাজার আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী আমেরিকায় চলে যাচ্ছে—সে সম্বন্ধে ওরা কথা বলতে লাগল। নেডই কথা বলছিল। একসময় সে লক্ষ্য করল ঈলীন—বোধহয় মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে না। কিন্তু বুকের মধ্যে অনেক কথা গুঞ্জরিত হচ্ছিল ঈলীনের—নেডেরও। কতবার মনে হচ্ছিল ঈলীনের ও বোধহয় আর কথা বলতে পারবেনা। এবং একসময় যেন একটু অচৈতন্যের মত হয় পড়ে যাচ্ছিল ঈলীন, নেড সময়ে ধরে ফেলে।

ওরা বাগানে নেমে এসে হাঁটতে লাগল। নেড কিউবার যুদ্ধের কথা বলল, বলল যে কেন সে আয়ার্ল্যাণ্ডে এসেছে। টারা সম্পর্কে নেডের প্রথম অনুভবের কথাও শুনল ঈলীন। প্রতিমুহূর্তে তাই মনে হচ্ছিল ওর, যেন বিস্ময়কর কিছু একটা শুনছে। যেন গোপন, খুব সঙ্গোপনে বুকের মধ্যে লালিত কিছু একটা কথা এক্ষুনি প্রকাশিত হয়ে পড়বে! অস্থিরতা তাই বাজছিল ঈলীনের। তাই ওর বাবা এসে যখন নেডকে ডাকল, তখন ও প্রায় যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

ঈলীন গান বাজনা জানে না। অথচ, আরেকজন মেয়ে না হলে নেডেরও গাওয়া হয় না। ঈলীন তাই দেখছিল নেডকে। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা, পুরুষালি দুটো হাত। বেহালার ওপর হাত দুটো ঘুরছে নেডের। দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল ঈলীনের। মনে হলো ওর যেন বেহালা বাজানর মধ্য দিয়ে, আজরাতে,

এক নতুন সঙ্কেত পেল ও। একটা অনিবার্চনীয় আনন্দের লহরী কেবলই বুকের মধ্যে থেকে থেকে তোলপাড় করতে লাগল। পাখীর গান, পোকামাকড়ের শব্দ, বিষণ্ণ বৃক্ষের নিস্তব্ধ অপেক্ষা—এসবই এক নতুন অর্থ বয়ে নিয়ে এল ওর কাছে।—অথচ, কেন যে এমনটা হল—বুঝতে পারল না ও। বাজনা শেষ হল। নেড এসে ওর পাশে বসল। কত কি বলে গেল নিজের ইচ্ছাতেই ঈলীন। যেন নিজেকে ও হারিয়ে ফেলেছে, ওর সত্বা দ্রবীভূত হয়ে গেছে, নিজেকে অতিক্রম করে যেন মৃত্যুর কোলে ও ঢলে পড়ছে আজ রাতে। সময় যে কোথা দিয়ে পার হল ও জানে না, অতিথিরা একে একে ওর কাছ থেকে বিদায় নিল, ওযেন দেখতেই পেল না তাদের। তারপর সবাই যখন চলে গেল, তখন অন্যমনে বাবার কাছ থেকে ও নিজে সরে যেতে চাইল, পাছে নেডের সম্পর্কে বাবা কিছু জিজ্ঞেস করে ফেলে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ও ভাবতে লাগল পৃথিবীর বুকে এই গ্রীষ্মের রাত্রির মত, ওর বুকেও আজ এক সুখের ভার স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না ওকে।

ঘরে এসে জানলা খুলে দিয়ে ও বসল। প্রতি মুহূর্তে এক প্রত্যাশা—রাতের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে কেউ ওর কানে কানে—ফিস্‌ফিস্ করে বলবে সেই গোপন কথাটা যা ওকে এই মুহূর্তে কুরে কুরে খাচ্ছে। নক্ষত্ররা জানে! আহ্। যদি ওদের ভাষা বুঝতও! কিছু একটা ও যেন বুঝতে পেরেও পারছে না। আনন্দের অনুভূতি ক্রমেই গাঢ়তর হচ্ছে, অপেক্ষা করছে ও কখন পুর্ণরূপে প্রকাশ পাবে। কিন্তু কেউ এল না। আর হঠাৎই চকিত হয়ে নিজের এতক্ষণের ভাবনায় লজ্জিত হয়ে জানলা বন্ধ করার জন্য ও উঠে দাঁড়াল। আর ঠিক তখনই হঠাৎ ওর মনে হল—ঠিক। এই সে যে আয়ার্ল্যাণ্ড বাসীকে নেতৃত্ব দেবে! এদেশে একজন নতুন নেতা দরকার—নতুন করে ভাবতে পারে, নতুন আদর্শ যে সামনে রাখতে পারে, এবং সর্বোপরি, যে লোক বাইরে থেকে এসেছে। নেড তো আমেরিকা থেকেই এসেছে। বুকের মধ্য থেকে

আগের একটা উত্তাল ঢেউ উঠে এল। ভাবল ও ছুটে গিয়ে বাবাকে জাগিয়ে দিয়ে সব বলে, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে লোকদের বলে যে—যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, সেই নতুন নেতা উপস্থিত হয়েছেন। মন্ত্র-মুগ্ধের মত স্থির দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে লাগলও। মনে পড়ল, পড়ল আয়ার্ল্যাণ্ডে—আসার কথা, কিউবার যুদ্ধের কথা. নেড বলছিল। তখন ও বোঝেনি! কিন্তু এখন মনে হল—নেড নিশ্চয়ই ওকে তবে পাশে চায়—এতে কোন সন্দেহ নেই ঈলীনের। বোঝাবুঝির পরে একটা অচেনা অনুভূতি ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল। ঈলীন বুঝল যে যাত্রা পথের প্রথম পর্ব ও অতিক্রম করে যেতে পেরেছে।

ঠিক তখন নেড বাগানের গেটের ওপর কনুয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রীষ্মের রাত্রি নিথর, মধুর বলে মনে হল। কেন না, হঠাৎ যে মেয়েটা ওর জীবনে দেখা দিল—তার কথাই সে ভাবছিল। বিবাহের কথাও একবার উঁকি মেরে গেল চকিতে মনের মধ্যে। আসলে, কিউবাতে থাকার সময় আয়ার্ল্যাণ্ডে আসার কথাটা কেমন করে মনে এল, সেটাই ভাবছিল সে। ভাগ্য এবং নিয়তিকে মেনে নিলে জীবনের চোরাপথগুলো সোজা হয়ে যায়—নচেৎ কেবলই ঘুরপাক খেতে হয় আসল রাস্তাটা খুঁজে বার করতে। ঈলীনের মত মেয়ের সঙ্গে তার এই যে সাক্ষাৎ—কোন অজানা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে—কে জানে। আঁধার রাতের দণ্ডায়মান বৃক্ষের ফাঁকে একটা উজ্জ্বল রূপালী নক্ষত্র—তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে মনেই বলল সে, "ওই নক্ষত্রটা ও সব জানে! তবে আমাকে কিছু বলছে না কেন?"

গাছেদের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও ভাবতে লাগল, এমনটাই হয়ত হয়। আমি কি করব, আজ রাত শেষ হলে আগামীকাল দিনের আলোয়? নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই ঈলীনের সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

লেখালেখি বন্ধ হয়ে গেল ওর প্রায়। কেবলই এই মেয়েটার চিন্তা ওর মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রইল। ভাবল ডাবলিনে গেলে হয়।

সেখানে কত কাজ। ট্রেনের আসা এবং যাওয়া দেখল। কিন্তু কিছুই ভাল লাগল না। পাঁচটা বাজতেই লরেল হিলে ঈলীনের সঙ্গে বসে মনোযোগের সঙ্গে ওর কথা শুনতে লাগল সে। ঈলীন তাকে বলছিল যে যদি সে সত্যিই আয়ার্ল্যাণ্ড বাসীদের জন্যে কিছু করতে চায়—তাহলে—রাজনৈতিক সুযোগ নেবার এখনই প্রশস্ত সময়।

"লোকে সব সময় ভাগ্য বিশ্বাস করতে চায়।" নেড বলল, আর তখন, তাকে বাধা দিয়ে ঈলীন বলল যে একটা বাড়ী সে দেখতে ইচ্ছুক কিনা, কাছেই। কেননা, রাজনীতিতে যদি সে যুক্ত হ'তেই চায় তাহলে এই রকম একটা বাড়ীতে থাকলে তার খুব সুবিধে হবে।

ওরা ফিরে এল সন্ধ্যের মুখে। ছবি আর কাগজ দিয়ে দেয়াল সাজানো, বাগানটাকে আরও সুন্দর করতে হবে—এই সব কথা বলতে বলতে। নেডের মনে কেবলই একটা কথা জাগছিল যে এই ঈলীন নামে মেয়েটার ওকে তার জীবন সঙ্গীনি করতেই হবে। ঈলীনেরও যে এই ভাবনাই সর্বক্ষণ হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেবল প্রকাশ্যে ওরা অন্য কথা বলছে। কিন্তু দুজনেরই পরস্পরের কাছে চলায় ফেরায়, পোষাকে আষাকে আরও আকর্ষনীয় করে তোলার দিকে ঝোঁক স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎই নেডের চিন্তা মাঝপথে থমকে দাঁড়াল। ওর মনে পড়ল, জীবনে সে বিয়ে করতে চায়নি কখনও। কেননা, একই মেয়েকে সারা জীবন ধরে ভালবাসা যায় এ তত্ত্বে তার বিশ্বাস নেই। তবে কি ঈলীনকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে হবে। এজন্যেই কি তার ভাগ্য তাকে আয়ার্ল্যাণ্ডে ঠেলে দিয়েছে! এক সময় মেয়েদের সঙ্গ ওকে ক্লান্ত করেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঈলীনকে নিয়ে তেমনটা ঘটবে না। দেখা যাক, কি হয়। বিয়ের প্রস্তাব সে ঈলীনের কাছে করবেই।

পরদিন বিকেলে ওদের বাড়ী যেতে চাকরটা বলল যে ঈলীন বাগানে বেড়াচ্ছে। বাগানটা বিশাল জায়গা জুড়ে। সীমানার ওপারে দূরে ডাবলিনের পর্বতশ্রেণী। পর্বতের বন্যকৃতি আর ঈলীনের

বাড়ীর স্নিগ্ধ পরিবেশ—দুয়ে মিলে নেডের মনের মুকুরে এক মনোরম ছবি ধরা পড়ল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার ভাগ্য পরীক্ষা হবে। তাই মনে মনে একটা অস্থিরতা ছিলই। তবু একবার চারপাশের দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ না হয়ে পারল না। কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণী তার কাছে যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দিল। ঈলীনের সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে হবে তাই। না হলে হয়ত এমন দৃশ্য আর পরিবেশ ছেড়ে সে এক পাও নড়ত না। ঈলীন বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে একবার ঢিপির ওপর দিয়ে আবার নীচ দিয়ে হাঁটছিল। ওর হাতে একটা ছোট মাছধরা জাল। কিন্তু বাগানের মধ্যে মাছধরা জাল হাতে? ব্যাপারটা কি? বাগানে এতটা ভেতরে অবশ্য নেড আগে কখনও আসেনি। তাই সে জানে না যে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী এইখান দিয়ে বয়ে গেছে। বাগানটা একসময় সাধুদের ছিল। আর সাধুরা শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে মোটেও উদাসীন ছিলেন না। তাই এই ছোট্ট নদীতে বাঁধ দিয়ে ট্রাউট মাছের চাষ করেছিলেন। কিন্তু মিঃ ক্রোনিন—ঈলীনের বাবা যখন এই জায়গাটা খরিদ করেন তখন নদীটা শেওলা এবং আগাছায় প্রায় বুঁজে গিয়েছিল। এবং ঈলীন নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রায় পাঁচ ফুট পরিমাণ কাদার স্তর নদীগর্ভ থেকে তুলে, সমস্ত আগাছা, শ্যাওলা পরিষ্কার করে আবার ওটার বহমানতা ফিরিয়ে আনে। এখন কাকচক্ষু জলে ট্রাউট—মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়ায়। দেখতে যে কি ভাল লাগে। দুটো মাছ ধরে—ঘাসের ওপর ফেলে রেখেছে ঈলীন। তখনও জ্যান্ত। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর চক্‌চকে রূপোলী পেটগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

"একটা বড় ট্রাউট মাছ আছে, জানেন," নেডকে দেখে ঈলীন বলল,—

"একপাউণ্ড ওজন হবে কম করে। গত বছর ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এত ধূর্ত মাছটা যে জাল ফেললেই একেবারে মাটির সঙ্গে লেগে থাকে। ধরা যায় না।"

"মনে হচ্ছে, দুজনে মিলে চেষ্টা করলে ধরতে পারব," নেড বলল— "কিন্তু তার আগে আমার হাতে একটা জালের দরকার।"

"মালির কাছ থেকে চেয়ে একটা জাল নিয়ে আসুন!"

নেড একটা জাল নিয়ে ফিরে এল। তখন দু'জনে দুদিক থেকে জাল ফেলে এগুতে লাগল। ঈলীন দেয়ালের দিকে। উল্টোদিকে নেড। ঈলীন তার পরনের হালকা গ্রীষ্মের পোষাক টাইট করে প'রে নিল। নেড দেখে ভাবল এমন সুন্দর পোষাক পরা মেয়ে আর সে জীবনে দেখেনি। খয়েরী ফুল ছাপা পাতলা মসলিনের পোষাক, টুপীতে এবং ফ্রকের নীচের দিকে কালোফিতের বর্ডার। দেয়ালের ওপর আইভিলতার ঝাড়। সামনে ঈলীন। পটভূমি চমৎকার। বার বার নেড মুগ্ধ চোখে দেখছিল। আর বারে বারেই ঝোপ-ঝাড় আর অসমান জমিতে হেঁটে যাচ্ছিল। কোনমতে একটা কাঁটা ঝোপের ডালে পাতায় শক্ত করে ধরে ফেলল তাই রক্ষা। শেষে ঈলীন হাতের মধ্যে ফুটে থাকা কাঁটাগুলো তুলে দিল। তারপর নতুন করে মাছ ধরা পর্ব সুরু হল। বড় ট্রাউট মাছটাকে ধরতেই হবে। কিন্তু মাছটা ভয়ানক চালাক। ভেসে ওঠে। আবার জাল ফেললেই ডুব দেয়। শেষে অনেক কসরৎ করে নেডকে জলে নেমে মাছটাকে ধরতে হল। তখন মাছটাও ক্লান্ত। নেডও ক্লান্ত।

মাছটাকে ঘাসের ওপর ফেলে দুপাশে নেড আর ঈলীন বসল। নেড ভেতরে ভেতরে বেশ গর্ববোধ করছে মাছটাকে ধরতে পেরে। ঈলীন বলছিল যে মালি আর ছেলেটা কতদিন চেষ্টা করেছে কিন্তু ধরতে পারেনি মাছটাকে। মিঃ ক্রোনিন ঈলীনের বাবা তো প্রায়ই বলেন, খাবার পাতে মাছটাকে আজও পাওয়া গেল না।

মাছটাকে ধরতে তো আনন্দ হয়েছেই। নেডের মনের গহনে আরও বেশী আনন্দ উচ্ছলিত হচ্ছিল কারণ, বারে বারেই সে ঈলীনের সুঠাম বরতনুর দিকে ফিরে ফিরে দেখছিল। এই মুহূর্তে ঈলীনের মুখের একটা পাশ দেখে সে আরও উচ্ছ্বসিত হল মনে মনে। সে দেখছিল

চাঁপাকলির মত আঙ্গুলের ডগা দিয়ে মাছটার গায়ে আল্‌তো করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে ঈলীন। একটা পা মুড়ে অন্য পা ছড়িয়ে বসেছে ঈলীন। ওর খয়েরী, মুক্তোর মত ছোট ছোট চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। একটা লুকোনো হাসি আর না বলা কথার আভাস দিচ্ছে যেন।

"আজকের এই মেঘলা আকাশ ভাল লাগছে আমার," নেড বলল, "টিয়া পাখীর ঝাঁক গাছে গাছে কিচির মিচির করছে, ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। যেন রূপকথার গল্পের দেশের মত, এই মাছ ধরার আনন্দ, আমি আর তুমি এত কাছাকাছি। এ সবই মিথ্যে হয়ে যেত তুমি যদি পাশে না থাকতে।" বলতে বলতে ঈলীনের একটা নরম হাঁটুর ওপর নেড তার একটা হাত রাখল।

চট্‌ করে হাঁটুটা সরিয়ে নিল ঈলীন এবং এক মুহূর্ত পরেই উঠে দাঁড়াল। তারপর ঈলীনের পেছু পেছু পায়েচলা সরু পথ ধরে চলতে লাগল। একটি কথারও বিনিময় হ'ল না। ঈলীন কেবল ভাবছিল নেড তো ক্ষমা চাইল না। একবার ওর মনে হল নেডকে চলে যেতে বলে এখান থেকে। কিন্তু কোন কথা খুঁজে পেল না। নেডের আচরণ অকল্পনীয়। অতীতে কেউ তার সঙ্গে এমন আচরণ করতে সাহস পায়নি। লজ্জার কথা যে ঈলীন ভয়ঙ্কর ভাবে রেগে যায় নি। আসলে ও রেগে যেতে চাইছিল কিন্তু মনের ভেতরে তেমন সায় পাচ্ছিল না যে এটাও সত্যি।

"এই যাঃ!" নেড হঠাৎ বলে উঠল, যেন ঈলীনের চিন্তাধারাকে দ্বিখণ্ডিত করে, "মাছগুলো যে পড়ে রইল! আসুন! আমাকে একটু সাহায্য করবেন! আমি একা তো তিনটে মাছ ধরে আনতে পারব না!"

কড়াভাবে উত্তর দিতে গিয়েও নেডের চোখের দিকে তাকিয়ে একটা অনাস্বাদিপূর্ব আনন্দে মন ভরে গেল ঈলীনের; বিক্ষিপ্ত মনটাকে বৃথাই সংহত করতে চেষ্টা করল ও—তিরস্কার করতে চাইল নেডকে।

"আমার কথার উত্তর দেবে না, ঈলীন?" একটা হাত ঈলীনের নিজের হাতের মধ্যে নিল নেড।

"নেড, আপনি কি ক্যাথলিক?" ঈলীন মুখ ঘুরিয়ে হঠাৎ বললে।

"হ্যাঁ, ক্যাথলিক বংশেই আমার জন্ম, কিন্তু ধর্ম নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি, ধর্ম ছাড়াও অন্য অনেক বিষয় আছে ভাববার। এতে কি আসে যায়? আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা তো ধর্মের ওপর নির্ভর করে না।"

"আপনি সত্যিকার সৎ ক্যাথলিক হলে আমার পক্ষে আপনাকে মেনে নেওয়া সহজ হ'ত।"

"তুমি আমাকে অবাক করলে, ঈলীন!" নেড কোনমতে বলল। আর ঈলীনের সুডৌল হাত নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়ে খেলা করতে লাগল। ঈলীনও মৃদু আকর্ষণে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল তার।

"আপনি ক্যাথলিক হলে আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হ'ত, নেড, আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতাম।"

"আমার সৎ ক্যাথলিক হওয়া না হওয়াতে আমাকে ভালবাসতে তোমার আটকাচ্ছে কোথায়?" বলতে বলতে নেড ঈলীনের মুখের দিকে তাকাল। ঈলীনের আনমনা দৃষ্টি তখন দূরের পাঁচিল ছাড়িয়ে ছাইরঙা আকাশের দিকে প্রসারিত।

"আমি তো কখনও বলিনি যে আপনাকে আমি ভালবাসি," ও জবাব দিল একটু রাগের স্বরেই, "কিন্তু যদি আপনাকে ভালবাসতাম" ও বলল নেডের দিকে একটু বা কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে, "এবং যদি আপনি ধার্মিক হতেন, তাহলে ভাবতাম আমি মহৎ কাউকেও ভাল বেসেছি। আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কি বলতে চাইছি? আপনার হয়ত মনে হচ্ছে আমি কি সব আজে বাজে কথা বলছি!"

"না, তা মনে হচ্ছে না, ঈলীন, আমি বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারছি। তবু তোমাকে ভালবাসতে আমি কোন বাধা দেখি না।"

নেড ভাবল এ কথা শুনে ঈলীন হয়ত রাগ করবে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকেই তাকিয়ে রইল ঈলীন।

"আমি আপনাকে পছন্দ করি, কিন্তু একটা ভয়ও আছে আমার আপনাকে ঘিরে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি! আপনি সার্কাস দলের সঙ্গে পালিয়েছিলেন, একটা সিংহকে মেরে ফেলেছেন, যুদ্ধ করতে চলে গেছেন সুদূর কিউবাতে। মেয়েমানুষকে আগেও ভালবেসেছেন, কিন্তু আমি এর আগে কাউকেও ভালবাসিনি। আপনাকে দেখার আগে পর্য্যন্ত কোন পুরুষকে কাছেও ঘেঁষতে দিই নি।"

"আমি সবই বুঝতে পারছি, ঈলীন ; আমি জানতাম আয়ার্ল্যাণ্ডে এসে আমার জীবনে একটা কিছু ঘটবে।"

ঘুরে দাঁড়াল ঈলীন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে মনটা ভরে গেল নেডের। ও স্থির দৃষ্টিতে তাকাল নেডের চোখের দিকে ; কিন্তু ওর দৃষ্টি যেন নেডের ভেতরটাকেও দেখে নিচ্ছিল। নেড এই সুযোগে ওকে আরো কাছে আকর্ষণ করল।

"চল লেবুর বাগানের দিকে যাই।" সে বলল, "আমি কখনও তোমার সঙ্গে ওখানে যাইনি।"

"কেন, ওদিকে যেতে চাইছেন কেন?"

"আমি ছোট্ট করে তোমাকে একটা চুমু খাব···এখানে—মালীটা আমাদের দেখতে পাবে ; একটু আগেও ও ব্যাটা আমাদের পেছন পেছন আসছিল। এখনও হয়ত' এদিকেই আছে!"

"আমি তো মালীকে দেখিনি ঃ ওর কথা আমার মনেও আসেনি।"

নিজেকে যেন কিছুটা জোর করেই টেনে নিয়ে গেল ঈলীন লেবুর-বাগানের দিকে, তারপর ওখান থেকে ফিরে এসে বলল ঃ

"আমার মনে হয় না যে বাবা কোন রকম আপত্তি করবে।

"কিন্তু তুমি ওকে বলবে সব। ওই ছাখ, আমরা তো মাছগুলোর কথা ভুলেই যাচ্ছি। এই মাছগুলোই তো আজকের মিলন ঘটিয়েছে।

ওদের কি আজ ছেড়ে দেব জলে না ডিনার টেবিলে বসে মহাফুর্তিতে ওদের খাব ?"

"নেড, জীবনটাকে বাঁকা করে দেখতে তোমার অদ্ভুত আনন্দ হয়, না ?"

"আমি সত্যিই দুঃখ পাই ভেবে যে জীবনে লাভের ঘরে আমার শূন্য ; যাহোক, তুমি তোমার বাবাকে বলবে তো আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে, ঈলীন ?" আমি চেষ্টা করব একবার অন্ততঃ সোজা করে যাতে জীবনটাকে দেখাতে পারি—এই ট্রাউট মাছগুলোর অন্ততঃ আমার আন্তরিকতার সাক্ষী হবে আশা করছি !"

ঈলীন বুঝতে পারে না, নেডের এই অসংযত চাঞ্চল্য ওর ভাল লাগছে কি না, কিন্তু যতবারই ও নেডের দিকে তাকায় ততবারই সমস্ত দেহ অবশ করে দেওয়া একটা উচ্ছ্বলিত আবেগে বুক ভরে ওঠে ওর কথা হারিয়ে যায়। চুপচাপ হাঁটতে লাগল ও আর ভাবতে লাগল আবার কখন নেড ওকে চুমু খাবে। বাগানের প্রান্তে এসে একটা সন্ধ্যা মালতী ফুলের গাছের ডাল ভেঙ্গে ঝুলে পড়েছে দেখে ঈলীন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর যত্ন করে ডালটাকে একটা লম্বা ঘাসের শিকড় ছিঁড়ে নিয়ে বেঁধে দিল।

"বাবা হয়ত অবাক হয়ে ভাবছে আমাদের কি হল।"

"আমার মনে হয়," নেড বলল, নিজের ভীরুতায় যেন মজাই পেল সে, "আমার মনে হয় তোমার নিজের মুখেই তোমার বাবাকে বলা ভাল। মানে, আমার চেয়ে আরও ভাল করে তুমি বুঝিয়ে বলতে পারবে।

"আর তুমি কি করবে ?" ঈলীন হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে ডাগর দুটি চোখে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ?"

"না, আমি বাড়ী ফিরে যাব আর তুমি আমাকে ডেকে আনবে গিয়ে। বলতে ভুলো না তোমার বাবাকে যে বড় ট্রাউট মাছটা আমিই ধরেছি, সুতরাং নিমন্ত্রণ আমার প্রাপ্য।"

নেডের এই দায়ীত্ব এড়িয়ে যাওয়া বুঝেও রাগ করতে পারল না ঈলীন। নেড নিশ্চিন্ত মনে গুনগুন্ করে শুমানের 'লোটাস্ ফ্লাওয়ার" "দ্য মুনলাইট"—এর সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ধ্রুপদী সঙ্গীতের জগৎ ছেড়ে হাল্কা গানের কলি—সিগমুণ্ড আর সিগ্লিন্দের "মে টাইম" এবং "মিরাইল" সুরে গাইতে লাগল যতক্ষণ না ওর বাড়ীর কাছে পৌঁছল।

মিসেস গ্রাটান, মালিক-গিন্নী, দূর থেকেই নেডের শিষ শুনতে পেলেন। গানের সুরে শিষ্ দিচ্ছে ছেলেটা। চেনা গান। সুরটা নিখুঁত। ছেলেটা বেশ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, মনে মনেই ভাবলেন উনি।

দরজা খুলে দাঁড়াতেই নেড এল।—"মিসেস গ্রাটান, এক কাপ চা হবে?" নেড অনুভব করল ও বুকের মধ্যে অনেক কথা জমা হ'য়ে আছে। কারও সঙ্গে কথা বলে একটু হালকা হ'তে হবে।—"আমার ঘরে আনতে হবে না আপনাকে কষ্ট করে। যদি বলেন তো আমিই রান্নাঘরে যেতে পারি!

মিসেস গ্রাটানের রান্নাঘরটি ভারী সুন্দর। তাকের ওপর সারি সারি সুন্দর করে সাজান জিনিষপত্র, পুরোনো আমলের বড় ঘড়ি একটা একপাশে। নেড টেবিলের ওপর ভাল করে বসে স্টোভের শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনতে লাগল। মিসেস গ্রাটান চা দিতে পা দুলিয়ে দুলিয়ে খেতে লাগল নেড।

"মিসেস গ্রাটান, আপনাকে একটা নতুন খবর দিচ্ছি—মিস ক্রোনিনকে আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।"

"বাছা," উনি জবাবে বললেন, "এতে একটুও আশ্চর্য্য হইনি আমি।" যদিও ওর হাত থেকে টি-পটটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।—প্রথমে যেদিন তুমি এখানে এলে তখন থেকেই আমি ভাবছি তোমার জীবনে একটা কিছু ঘটবেই এখানে।"

বলেই কিন্তু মনে মনে অনুতাপ করল নেড—এত শিগ্গীরই মালিক

গিন্নীকে না বলতেও হত। তাই সংশোধন করে সে বলল, যে মিস ক্রোনিন ওর বাবার অনুমতি চাইবে। স্বভাবতঃই, অনুমতি না দিলে বিয়েটা হবে না।

'কিন্তু মিঃ ক্রোনিন নিশ্চয়ই মত দেবেন। মিস ঈলীনের ইচ্ছায় ওর বাবা বাধা দেবেন না। আর ওর সঙ্গে বিয়ে হলে তোমারও ভাগ্য খুলে যাবে।

"আমি সেসব কথা ভাবছিনা," নেড বলল, "আমি ওর লালবর্ণ মাথার কেশের কথা ভাবছি।"

"এই। আমি যখন বলেছিলাম যে এদেশের সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে ও, তখন তো বিশ্বাস হয়নি। এইবার তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।"

নেডের চা খাওয়া শেষ হয়নি সে সময় দরজায় টক্‌টক্‌ আওয়াজ হল।

"আরে, মিস ঈলীন যে? এস, এস!" মিসেস গ্রাটান স্বাগত জানালেন। তার ভাবভঙ্গী দেখে সহজেই ঈলীন বুঝতে পারল যে নেড ওকে সব কথা বলে দিয়েছে।

"মিসেস গ্রাটান, আমি খুশী হয়েছি যে খবরটা আপনিই প্রথমে জানলেন। আমি একটু আগে বাবাকে বললাম সব। উনি অনুমতি দিয়েছেন। মিঃ কারম্যাডির সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে।"

মিসেস গ্রাটান কেক আর নেই বলে মনে মনে আফশোষ করলেন। কিন্তু মাখন দেওয়া টোষ্ট আর চা খেতে দিলেন ঈলীনকে। তারপর দুজনে ছেলে বেলার কথা বলতে লাগলেন। ঈলীন বলল মিসেস গ্রাটানের ছেলে জেমসের সঙ্গে ওর খেলার কথা, কাগজের নৌকো বানিয়ে নদীতে ভাসানর কথা। এ সবের কিছুই জানে না নেড। তাই একটি অস্বস্তিবোধ করে ও জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝেই ওদের দুজনের বিয়ের কথা ওর কানে আসতে লাগল। এরই মধ্যে এক সময় ঈলীন বলল,—"বাবা তোমাকে ডিনারে ডেকেছেন।"

"মিসেস গ্রাটান," নেড ফিরে বলল,—"আজ বিকেলে তিনটে

ট্রাউট মাছ ধরেছি আমরা।” ঈলীন অবাক হচ্ছিল ভেবে যে নেড কেন এত বিশদভাবে মিসেস গ্রাটানকে এসব বলছে!

রাস্তায় এসে হাঁটতে হাঁটতে ঈলীন বলল: “আয়ার্ল্যাণ্ডকে ভালবেসেই আমাদের ভালবাসার সুরু। কাজেই বিয়ের পরেই আমরা —আয়ার্ল্যাণ্ড ভ্রমণে বেরুব। বিভিন্ন সুন্দর জায়গা দেখতে দেখতেই আমাদের ভালবাসা আরও গভীরতর হবে।”

নতুন স্থান, নতুন দৃশ্য দেখার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠছিল ঈলীন। বিয়ের পরেই তাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

প্রথমেই ওরা গেল টারাতে। প্রেমিকা গ্রানিয়ার সমাধি দেখল, ডান অ্যাঙ্গাসের ধ্বংসাবশেষ দেখল; আর আইরিশ স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন করম্যাক গির্জাও দেখল।

“ইংরেজদের আসার আগে পর্য্যন্ত বেশ ভালই চলছিল,” নেড বলল,—“এই করম্যাক গির্জাই আমাদের শেষ শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তারপর আর এদেশ কিছুই করতে পারেনি।”

আবার একসময় সে বলল যে আইরিশরা শিল্পকলা এবং সাহিত্যে যে পিছিয়ে পড়েছে তার কারণ, কোন সময়ই তারা এই পায়ের নীচের বাস্তব পৃথিবীকে আমল না দিয়ে কেবলই পরলোকের কথা—অন্য পৃথিবীর কথা বলেছে।—“নেড, আমি আশা করছি,” ঈলীন বলল,— “তুমি শিগগীরই নেতৃস্থানীয় একজন হয়ে বসবে।”

নেড ঈলীনের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। হাত ধরাধরি করে ওরা ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্য চিহ্নের পাশে পাশে। আর স্থির করল দুজনেই যে ওদের হনিমুন শেষ হয়ে গেলে ওরা ডাবলিন পর্বতের পাদদেশে একটা সুন্দর বাড়ী তৈরী করে তাতে বসবাস করবে।

ঈলীনের বাবা ওকে মাসে মাসে কিছু অর্থ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ঈলীন একসঙ্গে কয়েক হাজার অর্থ নিয়ে বিদেশে লগ্নী করল। কারণ ও

চাইছিল যে নেড যেন নিছক অর্থচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্বাঙ্গীন কুশলে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

একদিন রাতে ঈলীন একজন ভোটাভুটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে খেতে নিমন্ত্রণ করল।

"আজ রাতেই লোকটাকে না ডাকলেও পারতে," "নেড বলল—"আমি কোথায় ভাবলাম আজ রাতটা তোমার সঙ্গে একান্তে কাটাব।"

ঈলীনের দুচোখে সুখ ঝলকে উঠল। ও বলল,—"অনেক রাত আমাদের সামনে পড়ে আছে। শেষে তুমি ক্লান্ত না হয়ে পড় তাই আমার ভাবনা।"

নেড হাসল। বলল যে ওর চেয়ে আকাঙ্খিত সঙ্গীর কথা সে ভাবতেও পারে না। কেন না, প্রসঙ্গতঃ সে বলল যে গত কয়েক বছর ওর নানান অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। বিশেষ করে কিউবাতে যুদ্ধের সময় পাহাড়ের ওপরে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পর থেকে ও হাঁপিয়ে উঠেছিল। সেটা ছিল এক রকমের অ্যাড্‌ভেঞ্চার। এখন তার স্ত্রী তার কাছে এক নতুন অ্যাড্‌ভেঞ্চার। টেবিলের ওপর ফুল দানীতে বাহারী ফুল, কাগজ কলম একপাশে। ডিনার টেবিলে রূপোর মত চক্‌চকে বাসনপত্র; চাকর ঠাকুররা তৎপর এবং অভিজ্ঞ, সব মিলিয়ে জীবনটা তার এখন অন্যরকম—শান্ত, স্থির, নিশ্চিত।

সম্প্রতি সে পশ্চিমে নির্বাচনের কিছু কাজ করে এক সপ্তাহ পরে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে। ডাবলিন থেকে ট্রেনের যাত্রাটা তার দারুণ উত্তেজক মনে হয়েছে। একের পর এক বিচিত্র স্টেশন, তারপর প্ল্যাট-ফরমে স্ত্রীর অপেক্ষা এবং মিলন, এবং একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে হেঁটে হেঁটে ঘরে ফেরা সেই উজ্জ্বল সন্ধ্যায়। তার বক্তৃতা বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে স্বতস্ফূর্ত হয়ে জনতা গ্রহণ করেছে—এই সব স্ত্রীর কাছে উৎসাহী স্বরে বলা—আঃ! এই রকমই তো সে সারাজীবন কামনা করে এসেছে।

রাতে খাবার পর প্রতিদিন ওরা বাগানে বেড়ায়। খাওয়ার পর নেড পিয়ানো বাজাতে বসে। গান বাজনা সে ভালবাসে যেমন ঈলীন ভালবাসে ওর বাগানটাকে। একমনে ঈলীন বাজনা শুনছে দেখে আরও তন্ময় হয়ে নেড বাজাতে থাকে। কিন্তু একসময় ঈলীন উঠে বাগানে চলে যায়। বাজনা শেষ হতে স্ত্রীকে না দেখে নেডও বাগানে চলে আসে।

"এবারে তুষারপাত শেষের দিকে তেমন হয়নি বলে ফুলগাছে কত পোকা হয়েছে দেখেছ?" ঈলীন বলল দেখতে দেখতে, "কুঁড়িগুলো সব খেয়ে ফেলছে।"

"কেমন উজ্জ্বল জ্যোৎস্না দেখেছ। চাঁদের আলোয় সব খুঁজে খুঁজে ফেলে দাও না।"

ঈলীন হাঁটতে হাঁটতে একটা শামুক তুলে নেডের দিকে ছুঁড়ে দিল। অজান্তে পায়ের নীচে পড়লে রক্তারক্তি হবে। ফুলগুলোকে বাঁচাতে হবে পোকার অত্যাচার থেকে ঈলীন নেডকে বলছিল। নেডও মাথা নেড়ে সায় দিল। কিন্তু তখন তার ফুলের চেয়েও দূরের পাহাড়ের ওপর চন্দ্র—কিরণের মায়াভরা রূপ দেখতে অনেক ভাল লাগছিল। ফুলের নাম সে মনে রাখতে পারে না। যদিও ঈলীন অনেকবার তাকে বলেছে। তার চেয়ে বরং দূরের ক্যান্টারবেরী গির্জার ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে ওর অনেক ভাল লাগে। হয়ত নাম মাহাত্ম্য। কেন না, মাঝে মাঝে ও ভুল করে, যেমন ঈলীন বাজনার একটা স্বরগমকে অন্য স্বরগম্ বলে ভুল করে। যদিও মন দিয়ে শোনে।

"আর একমাসের মধ্যে পপিগুলো ফুটবে, জান," ঈলীন বলল,—"আর আমার এই প্রিয় গোলাপগুলো—হল্‌দে রঙের, কি সুন্দর দেখেছ, এগুলোও—ওমা! তোমার দৃষ্টিতো বাগানের দিকেই নেই!"

ওরা আপেল গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। ঈলীন বলেছিল যে এতবড় আপেল গাছ ও জীবনেও দেখেনি, ডালপালাগুলো ঘন এবং বিস্তৃত, সোজা উঠে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে ছাদের মত। পাতার

ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি মায়াময় করে তুলেছে আজকের এই রাত। ওরা এগিয়ে গেল বাগানের সীমানায়, নদীর পার যেখানে ঢালু হয়ে নীচের দিকে মিলিয়ে গেছে; দূরে পর্বত শ্রেণী চলে গেছে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দিগন্তের পাড়ে। জ্যোৎস্না এখানে আরও মনোহর —স্বর্গীয়!

ওরা দুজন সেখানে দাঁড়িয়ে চন্দ্রকিরণের বিস্তৃত সমুদ্র যেন দুচোখ ভরে দেখতে লাগল। চারদিক নিথর, নিস্তব্ধ। গাছের পাতাও নড়ছেনা। ঈলীনের একটা হাত ধরল নেড। একটা পাথরের ওপর বসল তারপর পাশাপাশি দুজনে। নেড ভাবছিল এমন দিন যে কখনও তার জীবনে আসবে—সে তা কল্পনাও করেনি। নারীসঙ্গ সে আগেও করেছে। কিন্তু তারা ছিল লাস্যময়ী। তাই আকাঙ্খা ছিল তার ব্যক্তিত্ব সম্পন্না, গম্ভীর, বুদ্ধিমতী কোন নারীকে কাছে পাবার। ঈলীনের মধ্যে তেমনটিই সে খুঁজে পেয়েছে।

দুজনে বসে বসে কথা বলছিল। নেড বলল যে এ দেশে সে নতুন। তাই এদেশ সম্পর্কে তার ধারণায় কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকতেই পারে। তাই সে ঈলীনের কাছ থেকে সে সব কিছু শুনতে চায়।

"তোমার আর আমার চিন্তাধারায় কোন গরমিল থাকবে না। তুমি কি বল?" নেড জিজ্ঞেস করল। তারপর ঘরে ফিরে কাগজ আর কলম ঈলীনের দিকে এগিয়ে বলল তার আগামী দিনের বক্তৃতা লিখে। ঈলীনের হাতের লেখাও তার সঙ্গে থাকলে সে মনে জোর পায়। যদি এমন হয় কোনদিন যে ঈলীন ওর কাছে থেকে সরে যায়—তাহলে সেদিনই ওর জীবনটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে।

নেড বলে যে ওর সেদিনকার কথা তার মনে আছে। যেদিন ঈলীন বলেছিল যে সে সাফল্য লাভ করবেই। সে অনুভব করতে পারে এখন যে সাফল্য তার দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে; সে বুঝতে পারছে যে সকলের মধ্যমনি হিসেবে তার পরিচিত বাড়ছে। প্রত্যেকেই মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে; মতামত চাইছে তার বিভিন্ন বিষয়ে;

প্রত্যেকেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে নেতৃত্বের জন্যে। ঈলীন খুশী হল নেড ওর কাছে মন খুলে কথা বলছে বলে।

নেড বলে চলে যে বিরোধিতার কোন রকম আভাস সে এখনও পায়নি। একদিন তো আয়ার্ল্যাণ্ড সত্যিই মুক্তি যুদ্ধে নামবে ; এবং সে যুদ্ধ হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঈলীনের সঙ্গে একটা বিষয়ে সে একমত যে ওই বড় যুদ্ধের আগে ছোটখাট অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। সে জন্যে একজন রাজনীতিবিদকে রোজই কিছু না কিছু কাজ করে এগিয়ে যেতে হবে ; এতে ভুল হলে চলবে না, কোন রকম গাফিলতীও না। কাজেই সে আমেরিকায় যেতে রাজী হল। বক্তৃতা দিয়ে, বুঝিয়ে বলতে হবে। টাকা পয়সাও সংগ্রহ করতে হবে। সে আইরিশ আমেরিকান বলেই একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব টাকা সংগ্রহ করা। সে আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ করেছে, আর সাংবাদিক তো সে ছিলই! এই সমস্ত কথাই সে জনতার সামনেও বলে। তারা শোনে চুপ করে। ঈলীনের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের মনে কিন্তু নেডকে ঘিরে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। পাদ্রীরাও ওকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে ; যদিও যথাযথ কারণ ওরা খুঁজে বার করতে পারে না।

হতাশা বোধ করে নেড ; কিন্তু ঈলীনের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনীতির ধরণ ধারণ ওর জানা। ও বুঝতে পারে নেডের সামনে সুযোগ উপস্থিত।

"আমেরিকাতে যদি তুমি সফল হও ; তাহলে আয়ার্ল্যাণ্ডের পয়লা নম্বর মানুষ হিসেবে তুমি ফিরে আসবে।" ঈলীন বলে।

"যদি তাই-ই হয়," নেড বলে, "আমি এদেশ ছেড়ে যাচ্ছি বলে তোমার দুঃখিত হওয়াটা স্বাভাবিক।"

"মানুষ একই সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ অনুভব করতে পারে না। আমিও না।"

"নিঃসঙ্গ বোধ করবে তো।"

"সে তো বটেই ; কিন্তু. নেড, আগামী দুটো মাস তো আমারও খুব ভালভাবে কাটবেনা।"

"ও, তুমি আমাদের সন্তানের কথা বলছ। সত্যি, কয়েকটা মাস তোমার এরপর কষ্টেই কাটবে। এই সময়টাতেই তোমার কাছে কাছে থাকা উচিৎ ছিল।

আপেল বাগানে ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। ঈলীন অনেকক্ষণ নেডের কথার কোন জবাব দিল না।

"আমি চাই যে তুমি আমেরিকায় চলে যাও। এখানে বসে দিনে দিনে আমার শরীরটা বেঢপ হয়ে যাবে—তাই তুমি দেখবে তা হবে না।"

"এই আপেল গাছের নীচে আমাদের অনেক সোনালী মুহূর্তে কেটেছে—ভুলে যাওনি আশা করি।" নেড বলল।

"ভুলিনি। এই আপেল গাছটা আমার সব চেয়ে প্রিয়।" ঈলীন বলে।

"দেখ, আর বছর ছয়েকের মধ্যে আরো একজন তোমার এই প্রিয় গাছটা আরও এত বেশী করে ভালবাসবে যা আমরাও বাসিনি। "আমি যে দেখতে পাচ্ছি সেই ছোট্ট দুষ্টুটা আপেল কুড়োবার জন্যে এই গাছেরই নীচে ছুটোছুটি করছে।

"কিন্তু, নেড, আমাদের তো মেয়েও হ'তে পারে।"

ঈলীন তারপর বলল যে ও টেলিগ্রাম করবে। নেড মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আপেল গাছের ডালে একটা ঝাঁকুনি দিল। আপেল পড়তে লাগল টুপ্ টাপ্—যেন পৃথিবীতে একটা নতুন জীবনের আবির্ভাব হচ্ছে সেই বার্তা জানিয়ে। তখন আঁধার নেমেছে বাগান ঘিরে।

"সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ আপেল সংগ্রহ করছে আর তাদের সসত্বা স্ত্রীদের সঙ্গে করে ঘরে ফিরে আসছে।" নেড আপন মনেই কথাগুলো বলল। তারপর দূরের দিকে কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া পাহাড় পর্বতের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল যেন তার

গোটা আয়ার্ল্যাণ্ড গলে গলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তার চোখের সামনে থেকে।

বিদেশে এসে খুশীই হল নেড। এও একটা নতুন জীবন। পরবর্তী তিনটে মাস তার কাটবে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। কত বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে দেখা করা। আলোচনা করা, তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করা। রেস্তোরাঁয় খাওয়া। কথা—কথা, কেবল কথার পর কথা বলে দিনগুলো কাটতে লাগল ওর বিদেশে। জীবনটাই যেন পাল্টে গেল তার। আবার যখন স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হবে ফিরে গিয়ে—সেটাও হবে একটা পরিবর্তন। সেই আয়ার্ল্যাণ্ডের শান্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে কি দুস্তর প্রভেদ! সেদিন রাতে একটা মিটিং-এ যাবার জন্য সে তৈরী হচ্ছিল। এই সময় দরজায় করাঘাত হল। একজন পিওন একটা টেলিগ্রাম দিল তাকে। খুলে দেখল—"ছেলে হয়েছে!"

মনে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার ছেলেই হবে।—কিন্তু ছেলের মা কেমন আছে—আর দুটো শিলিং খরচা করে সেটা কি জানান যেত না। একটু ক্ষুণ্নবোধ করল সে মনে মনে। টেলিগ্রামটা টেবিলের ওপর রেখে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে স্ত্রীর কথা ভাবতে লাগল। কেমন আছে জানি ও!—সেই অনুপম রূপ, ডিম্বাকৃতি মুখ, একরাশ রক্তিম সোনালী কেশ বালিশের ওপর দিয়ে ছড়ান। পাশেই শোয়ান সেই দেবোপম শিশু। সবই যেন মনশ্চক্ষে দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সে। হঠাৎ চোখ খুলে দেয়াল ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠে দাঁড়াল। মিটিং-এর সময় হ'য়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি রওনা হওয়া দরকার। বক্তৃতার কপিটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠতেই যেন ইচ্ছে করছে না তার। বসে বসে ভাবতে এত ভাল লাগছে, স্ত্রীর কথা, সুন্দর বাড়ীটার কথা, আর সেই অদেখা শিশুটার কথা। কিন্তু এই সুখদ, সুন্দর, অলস আর অস্পষ্ট ভাবনার জগতে বিচরণ করতে করতে হঠাৎই একটা দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে যেন দেখতে পেল তার স্ত্রী শিশুটাকে কোলে নিয়ে

স্তন্যপান করাচ্ছে। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল, তার অতিপ্রিয় দুটি' অনুপম স্তন-এবারে নষ্ট হয়ে যাবে! সে কল্পনা করছে ঈলীনের দেহলতা যেন কোন শিল্পীর হাতে খোদিত পাথরের মূর্তি—তেমনিই দেহের প্রতিটি কোন—প্রতিটি অঙ্গ সুপরিস্ফুট ঈলীনের। বলতে কি মা হিসেবে ক্বচিৎ কখনও ভেবেছে ঈলীনকে সে, বরং পাথরে খোদাই মূর্তির মত অনন্তযৌবনা রূপেই কল্পনা করেছে ঈলীনকে সে।

আবার বাস্তব জগতে ফিরে এল ওর চিন্তা। এক্ষুনি স্ত্রীর সঙ্গে একবার যোগাযোগ করা দরকার। বাচ্চাটাকে ও যেন স্তন্যদান না করে! কিন্তু টেলিগ্রামে তো একথা লেখা যাবে না। চিঠি লিখলে এক সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাবে। মিটিং-এ যেতে আর মিনিট কুড়ি বাকী। তাড়াতাড়ি একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসে গেল সে। কিন্তু লিখতে গিয়ে মনের চিন্তাকে কথায় প্রকাশ করার কোন যুক্তি খুঁজে পেলনা। তবে কি লিখবে যে ঈলীন তোমার সুন্দর, নিটোল দেহের পূজারী আমি। শিশুকে স্তন্যদান করতে গিয়ে তোমার অঙ্গ বিকৃতি ঘটুক তা আমি চাই না। কিন্তু লিখতে গিয়েই মনে হল যে, ঈলীন ভয়ঙ্কর আঘাত পাবে। নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে এমন কথা সে ভাবতেই বা পারল কিভাবে! এখুনি মিটিং-এর ডাক পড়বে, অথচ ঈলীনকে কিছু উপদেশ দিতেই হবে। সে শুনেছে যে ছাগলের দুধে মায়ের দুধের কাজ হয়। কিন্তু জোগাড় করা মুশকিল।—"তোমার কোন অসুবিধা হবে না," সে ভাবল—"ডাবলিন পাহাড়ের নীচের এলাকা থেকে ছাগলের দুধ জোগাড় করতে পারবে।" সপ্তাহে দশ বা পনের শিলিং খরচ করলেই চাষীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ঈলীনের সৌন্দর্যের দাম এর চেয়ে অনেক বেশী। তার চিন্তা দ্রুত এগুতে লাগল। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগুচ্ছে। তাড়াতাড়ি চিঠি খামে ভরে বাইরে এসে পোষ্ট করে দিল সে। আর দিয়েই একটা বিবেক দংশনে কাতর হয়ে পড়ল। মিটিং করতে করতেও কেবলই ভাবনাটা মাথায় পাক খেতে লাগল যে ঈলীন চিঠিটা পেয়ে কি ভাববে। ভয় হল, আঘাত পাবে ঈলীন, কষ্ট

পাবে, শিশুর দাবী ও আগ্রহ্য করতে পারবে না। অন্যদিকে রূপমুগ্ধ স্বামীকেও তো ফেলে দিতে পারবে না।

পরের কটা দিন খুবই অস্বস্তিতে কাটল নেডের। সপ্তম দিনে সে কল্পনার চোখে দেখতে পেল যে ঈলীন চিঠিটা পড়ছে, এবং যেমনটি সে ভেবেছিল। সত্যিই ঈলীন চিঠিটা পড়ে খুব কষ্ট পেল। শিশুটিকে ঘিরেই এখন ওর যত চিন্তা। বুকের সঙ্গে মিলিয়ে যখন স্তন্যপান করায় একটা অজানা সুখের আবেশে ক্ষণে ক্ষণে ওর শরীরে শিহরণ জাগে—আবেশে চোখ বুজে আসে। নেডের চিঠি পড়ে ওর চোখে জল ভরে আসে। স্বামীর ইচ্ছার কথা নাসর্কে ও বলে। নার্স শুনে দুঃখ প্রকাশ করে। বলে যে গাঁয়ের দিকে ধাই মেয়ে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে শিশুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য ঈলীন এখনও খুব দুর্বল। বাচ্চাটা কাঁদতে আরম্ভ করল এই সময়। ঈলীন তাড়াতাড়ি ওর নিটোল স্তনবৃন্ত শিশুর মুখে ধরিয়ে দিল। স্তন ভরা দুধ ওর। বাচ্চাটা নিশ্চিন্তে টানতে লাগল; আর ঈলীনের চোখ বার বার জলে ভরে উঠতে লাগল। ডাক্তার এই সময় উপস্থিত। নার্স তাকে সব বলল। ডাক্তার কিন্তু নেডের বক্তব্য সমর্থন করলেন। বললেন ঈলীনের স্বাস্থ্য সত্যিই তত মজবুত নয়। তাছাড়া বেশ কদিন বুকের দুধ খাইয়েছে। এখন আর দরকার নেই। একজন চাষী রমণীকে ডাক্তার জানেন। তাকে বলেওছেন আসতে। ডাক্তারের কথা অমান্য করল না ঈলীন। তবু ধর্মের দিক থেকে কোন বাধা আছে কিনা সেই বিষয়ে জানতে ও পাদ্রী ব্রেনানকে একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখল।

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে ও মনে মনে ভাবল যত যুক্তিই থাক, ওর স্বামী নেডের পক্ষে এমন চিঠি লেখা উচিৎ হয় নি।

সেদিন বিকেলেই পাদ্রী ব্রেনান এসে সব শুনলেন। নেডের চিঠিটা ঈলীন অবশ্য দেখায়নি পাদ্রী মশাইকে। পাদ্রী মশাইয়ের কাছে এ সমস্যা—একেবারে নতুন। তিনি বরং এ ব্যাপারে ডাক্তারের উপদেশ

মত চলা উচিৎ বলে মন্তব্য করলেন। এবং চলে গেলেন। এই সময় ডাক্তার আবার সঙ্গে করে একটি মেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঈলীন আশ্চর্য্য হয়ে দেখল যে ওর গর্ভজাত সন্তান সেই ধাইমার দুধভরা স্তনের বৃন্ত আগ্রহে মুখে নিয়ে চোখ বুঁজে চুষতে লাগল।

পাদ্রী মশাইয়ের কোন আপত্তি নেই এটা বুঝতে পেরে স্বস্তি পেল ঈলীন। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল ও। স্বামীর মুগ্ধ দৃষ্টি আবার ওর দেহকে ফিরে নাচতে থাকবে এই চিন্তায় পুলকিত হয়ে উঠল ওর মন। নানা কারণে নেডের ফিরতে দেরী হ'তে লাগল। ঈলীন সেটা সৌভাগ্য বলেই মেনে নিল। কেননা, মাসখানেকের মধ্যেই ওর শরীর আবার সেই চিকন, সুডৌল হয়ে উঠবে কুমারীকালের মত বা বিবাহের পর সন্তান গর্ভে আসার পূর্ব সময়ের মত। স্বামীর চোখে আবার সে অনাঘ্রাতা কুমারীর মত হয়ে উঠবে।

রোজ বিকেলে সে পাহাড়ের দিকে অনেকখানি করে হাঁটতে লাগল। স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল, কমনীয়তা ফিরে আসতে লাগল দেহের। তারপর একদিন নেডের চিঠি পেয়ে ও মনে মনে খুশী হ'য়ে উঠল যে স্বামী তাকে আগের মতই এসে দেখবে। সেদিন বিকেলে বেড়াতে বেরুবার আগে পোষাক পাল্টাবার সময় আরশীতে নিজের আনগ্ন রূপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ঈলীন। বিশেষ কিছু তফাৎ দেখতে পেল না ও আগের চেহারার সঙ্গে। স্তনদুটি হয়ত একটু নম্র—নত হয়েছে ; কিন্তু এত সামান্য নম্রতা স্বামীর চোখ এড়িয়ে যাবে বলেই ওর দৃঢ় বিশ্বাস। আর নাভীর নীচে, কুক্ষিতে কয়েকটি কাটা দাগ—গর্ভধারণের চিহ্ন। আর কদিন তেল মালিশ করলেই মিলিয়ে যাবে। সাদা পোষাক প'রে নিল ও। নেড সাদা পোষাক বেশ পছন্দ করে। নীল কোমরবন্ধ পরল। চীনে গোলাপের ছাপ আঁকা সাদা টুপী পরল। তারপর আরশীতে নিজেকে দেখল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল ও!

'টুপীটা সত্যিই চমৎকার!' নিজের মনেই বলে উঠল ঈলীন।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল ট্রেনের প্রতীক্ষায়।

"ভেবেছিলাম তোমাকে একটু রুগ্ন বা অন্ততঃ ম্লান দেখব," নেড বলল, —"কিংবা, একটু ভারিক্কী গোছের হয়ত দেখব ভেবেছিলাম। কিন্তু, তুমি তো দেখছি সেই আগের মতই আছ, আমার কুমারী প্রেমিকার মত!" বলতে বলতে একটা কুলির হাতে মাল পত্তর দিয়ে ওরা ষ্টেশনের বাইরে এসে চলতে লাগল।

মাইল দেড়েক ওরা চলে এল ষ্টেশন থেকে দুপাশে বড় বড় গাছ। একটা পুকুরে অসংখ্য লিলিফুল ফুটে আছে। দিগন্ত ভরা মাঠ। গরু-ভেড়া চরছে। অনেকদিন পর দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল নেড আর ঈলীন।

"এর চেয়ে ভাল দৃশ্য কি তুমি দেখেছ আমেরিকাতে, নেড?"

বলার কথা এত যে কোথায় শুরু করবে তাই বুঝতে পারছিল না নেড। পথের পাশে একটা গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে ঈলীনের বুকের কাছে বোতাম ঘরে লাগিয়ে দিল সে। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে ঈলীনের টেলিগ্রামের জবাবে তার চিঠিটার কথা সসঙ্কোচে উল্লেখ করল সে।

"আমি চিঠিটা পাঠাবার পর থেকে একটা বিবেক দংশনে জ্বলছি। সন্তানের দাবী মায়ের ওপরেই বেশী। তাড়াতাড়ি চিঠিটা লিখেছি, কি লিখছি অতটা বুঝতে পারিনি।"

"একটা অল্পবয়সী ধাই-মা পেয়েছি, নেড। ছেলেটাও ভালই আছে।"

"হ্যাঁ, তোমার চিঠিতেও তাই লিখেছিলে। আমি কেবল ভাবছি, চিঠিটা পাঠাবার পর থেকেই আমার যা কষ্ট হচ্ছে, তোমার তো তার চেয়েও বেশী কষ্ট হবার কথা!"

"অস্বীকার করব না, কষ্ট আমি পাচ্ছিলাম। সেদিন সকালে

শরীরটা ছিল আমার খুবই দুর্বল, বাচ্চাটা অনবরত কাঁদছিল আমার বুক থেকে সরিয়ে নিলেই। একসপ্তাহ ধরে তো বুকের দুধ খাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম না কি করব। দ্বিধায় পড়ে শেষে ফাদার ব্রেনানকে ডেকে পাঠালাম। উনি এসে সব শুনে বললেন যে ধাই-মার হাতে শিশুকে দেওয়ার কোন বাধা নেই।"

"কিন্তু ফাদার ব্রেনান আমাদের চাইতে তো বেশী কিছু জানতে পারেন না?"

"নেড, চার্চের সম্মতিটা—"

"কি চার্চে সম্মতি! ছেলেমানুষী একেবারে।" সে বলল,—"পুরুত ঠাকুরদের একেবারে সব তাতেই অধিকার! থাকতে পারে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে নয়।"

"কিন্তু, নেড, সমাজে থেকে নৈতিক দিকটা উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া, এঁরা সর্বত্যাগী মানুষ। আমাদের কল্যান কামনাই করেন।"

মুখের দিকে তাকাল নেড, ঈলীনের। কি সুন্দর যে লাগছে ঈলীনকে। কিন্তু ঈলীনের সৌন্দর্য্য তার রাগকে দমাতে পারল না। যেন অনেক-অনেক দূরে সরে যাচ্ছে ঈলীন! আটলান্টিকের ওপারে থেকে ঈলীনের সঙ্গে এতটা দূরত্ব কখনও অনুভব করে নি।

"ওই সব পুরুত ঠাকুররা আমাদের নৈতিকতার শেষ পাট্টা নিয়ে বসে আছে! আর তাদের হাতে তুমি আত্মা সমর্পণ করে বসে আছ। বেশ! তা আত্মা চলে গেলে তোমার নিজের বলতে রইলটা কী?"

"কেন খামোখা এত উত্তেজিত হচ্ছ, নেড? বিয়ের আগেই তুমি জানতে যে আমি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী!"

"ও হ্যাঁ,···সে তো নিশ্চয়ই, রেগে গেছলাম আমি। সে জন্যে আমি দুঃখিত ঈলীন। কিন্তু দ্যাখ, কেবল এই আয়ার্ল্যাণ্ডেই মেয়েরা দেহ-মন সমর্পণ করে বসে থাকে। অদ্ভুত ব্যাপার, মানুষের বোধগম্যের বাইরে।"

কিছুক্ষণ ওরা নিঃশব্দে হেঁটে চলল—পাশাপাশি। নেড ভুলে যেতে

চাইল যে স্ত্রী তার ক্যাথলিক। ওর সাদা পোষাক আর গোলাপ ছাপ দেওয়া সাদা টুপী—তাতে তো ধর্ম কোন বাধা পায়নি।

"আমি কি ওপরে গিয়ে দেখে আসব, না তুমি নীচে নিয়ে আসবে ছেলেটাকে?" নেড জিজ্ঞেস করল।

"নীচেই নিয়ে আসছি আমি।" ঈলীন জবাব দিল।

ধপধপে রঙ নাদুস নুদুস বাচ্চাটা, নীল দুটি চোখ, মুখটা একটু লালের দিকে, এক মাথা চুল—ঈলীন কোলে করে নিয়ে এল।

"এবারে, নেড, পাদ্রী মশাইয়ের কথা ভুলে যাও, দেখত' কি সুন্দর ছেলেটা তোমার?"

"হুঁ, সুন্দর তো বটেই, বেশ স্বাস্থ্যবানও। ঘুমে যে ঢুলুঢুলু চোখ!"

বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এলাম তো, দেখ, তবু একটুও কাঁদেনি। নার্স তো বলে যে কাঁদে না এমন বাচ্চা নাকি কমই দেখা যায়। জান, এক্কেক সময় আমার ইচ্ছে হয় একটু চিমটি কেটে দেখি কাঁদতে পারে কিনা ছেলেটা।"

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঈলীন বসল। আর সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল নেড।

"তোমার নামে ওর নাম রেখেছি, নেড। ফাদার ষ্ট্যাফোর্ড শুদ্ধি করে দিয়েছেন।"

"এর মধ্যে শুদ্ধিও হয়ে গেছে?"

"এর মধ্যে কি বলছ, তিন দিন বয়সের সময়ই হয়ে গেছে।"

"তাত বটেই শুদ্ধ না হলে তো আত্মা স্বর্গে যাবে না।"

"নেড, এমন নির্দয়ভাবে আমার সঙ্গে কথা ব'লো না। তোমার কি হয়েছে বল তো? এমন করে কখনও তো তুমি বলতে না?"

"দুঃখিত, ঈলীন: আর বলব না। ফাদার ষ্ট্যাফোর্ড শুদ্ধি করেছেন শুনে খুশী হলাম। পুরুতগুলোর মধ্যে ইনিই যা একটু বুদ্ধিমান। সব পুরোহিতই যদি ওঁর মত হ'ত, তাহলে অবিশ্বাসের কোন কারণ ঘটত না।"

"পাদ্রীরা মুর্খ হ'তে পারে, তাই বলে তো ধর্মবিশ্বাসটা মিথ্যে নয়।"

"দেখ, ধর্মে বিশ্বাসের চাইতেও মানুষকে আমি বিশ্বাস করি বেশী—সে পাদ্রী হ'লেও। ফাদার ষ্ট্যাফোর্ডকে আমার ভালই লাগে ওকে ডিনারে নেমতন্ন কর না!"

"নেড, ফাদার ষ্ট্যাফোর্ড বৃদ্ধ হয়েছেন। বাড়ী ছেড়ে কদাচিৎ বের হন। ফাদার ম্যাগের এখন ওর জায়গায় চার্চের কাজকর্ম করছেন।"

"ও। তা এই নতুন পাদ্রী মশাই কি রকম চালাচ্ছেন।"

"ভালই। তবে মাঝে মাঝে অলৌকিক ব্যাপার স্যাপারের কথা শোনা যাচ্ছে। বিড্ডি নাকি শুনেছে বলছিল।"

"তুমি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস কর?"

"জানি না। আন্দাজে বলতেও চাই না কিছু। চট্ করে কেউ-ই ওসব বিশ্বাস করে না।"

"আহা, বিড্ডি না কার কথা বললে? ওর কথা তো নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর?"

"নেড, এমন নিষ্ঠুরের মত তুমি কথা বলছ, তাও আজই—এই মাত্র পৌঁছেছ এসে!"

কিন্তু, কেন ও আমেরিকার কথা, ওখানে বক্তৃতার কথা—এসব জিজ্ঞেস করছে না নেডকে? নেড তো বলতে প্রস্তুত। মনে হচ্ছে ঈলীনের ওসবে কোনই কৌতূহল নেই। এমন কি রাতের খাবার পর যা একটু আধটু জিজ্ঞেস করল তাতে মনে হল যেন ঈলীনের এই সব রাজনীতিটিতি ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই—তার যাবার আগেও যেটা ছিল। যা হোক, সাদা পোষাক, কালো মোজা, আর রক্তিম কেশদামে সোনার কাজ করা হাড়ের চিরুনী—মুগ্ধ করে দিল নেডকে! ঈলীনকে নিজের হাঁটুর ওপর বসিয়ে আদর করতে করতে নেড ঈলীনের এই পরিবর্তনকে মেনে নিল।

•

পরদিন সকালে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে নেড বিরক্ত হয়ে

ঈলীনের উদ্দেশে বলল,—"দেখ, এই দেশটাকে বুঝি আর বাঁচান গেল না। কেবল নতুন নতুন চার্চ তৈরীর খবর। ধর্ম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করলে দেশের ক্ষতিই হয়। নাঃ! একটা কিছু করতে হবে। সে সেই দিনটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল—যেদিন তারই নেতৃত্বে এই দেশ নতুন ভাবে গড়ে উঠবে কিন্তু এই পাদ্রীদের আধিপত্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

অভিযান সুরু করল নেড। ট্রেনে-গাড়ীতে সারা দেশ ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করতে লাগল। নেড জানত যে জীবন মৃত্যু, অসুস্থতা এবং সুস্থতা, সাফল্য অসাফল্য—এ সবই একটা ভারসাম্যের ব্যাপার। একটা জাতি বা দেশ সফল হয় যখন এই ভারসাম্য বজায় থাকে; এবং উত্থান ও পতন ঘটে যখন এই ভারসাম্য ব্যহত হয়। তাই বলে ধর্মকে নেড অসৎ কিছু বলে না: জাতির জীবনে বা মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে এটাই ভারসাম্যহীনতার কারণ হয়েছে।

একেক সময় খুবই ক্লান্ত হয়ে ফেরে নেড—হয়ত সাতদিন বা দশদিন পরে। স্ত্রীকে কোলে বসিয়ে আদর করে। ছেলেটার সঙ্গে খেলে। রাতের খাওয়ার পর হয়ত পিয়ানো বাজায়। ঈলীন তখন একটা কিছু সেলাই করে। তবুও একটা অস্থিরতা অনুভব করে নেড। একটা ছোট্ট কালো ছায়া যেন ক্রমশ বড় হয়ে ধেয়ে আসছে এমনি মনে হয়।

এ পর্য্যন্ত খুবই নিপুণতার সঙ্গে সে নিজেকে চালনা করেছে। দেশের রাজনীতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য কাগজে তার বক্তৃতা বিকৃত ভাবেও বার হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টার, সম্পাদকদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভাল থাকায় মোটামুটি সামলান গেছে।

কিন্তু সেবার একদিন বাড়ী ফিরে সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। আসল কথাগুলো না ছেপে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে কিছু কথা ছাপা হয়েছে। ঈলীনও যে এতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

যাই হোক। আবার একদিন বেরিয়ে পড়ল সে। একটা বইয়ের কিছু কথা কেবলই মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল। প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছিল সে।

ঈলীন তখনও এসে পৌঁছয়নি। কোন কারণে দেরী হচ্ছিল।—ষ্টেশানের বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল ঈলীন আসছে। সারা আয়ার্ল্যাণ্ডে ঈলীনের মত সুন্দরী মেয়ে নেই। রাজনীতি, ধর্ম নিয়ে তার মতামতে ঈলীন দুঃখ পাচ্ছে, এটা ভাবতেও কষ্ট হল তার! তাই যখন ঈলীন গল্‌গল্‌ করে বলে যাচ্ছিল যে কি ভাবে ছেলেটার জন্য ওর দেরী হল আসতে—নেড শুধু হুঁ হাঁ করে যাচ্ছিল।

"কি হয়েছে বল তো তোমার?" ঈলীন লক্ষ্য করে হঠাৎ প্রশ্ন করল।—"মিটিংটা কি যুৎসই হয়নি?"

"না, না, মিটিং ভালই হয়েছে। বিস্তর লোক হয়েছিল। আমার কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।

"শুনে ভালই লাগছে।" ঈলীন বলল,—"কিন্তু আসল কথাটা কি—খুলে বলতো, নেড।"

"কিছু না। আমি আমার বক্তৃতার কথা ভাবছিলাম। আশা করি কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি হবে না। লোকেরা এত বোকা। কেউ হয়ত ভেবে বসবে যে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে বলেছি। আসলে মোটেও তা বলিনি আমি।"

"ভাল কথা," ঈলীন বলল, "তাহলে তো অন্য বক্তৃতা থেকে এটা অন্য রকম হবে।"

"কি রকম?"

"সম্প্রতি তুমি যে সব বক্তৃতা দিয়েছ সে সবই সোজাসুজি বা পরোক্ষে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে। অনেকে হয়ত বুঝতে পারবে না, কিন্তু তোমার মতামতের সঙ্গে যারা সামান্য পরিচিত তারা পরলেই বুঝতে পারবে।"

"তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাক, ঈলীন, তাহলে দেখবে যে

আমি পাদ্রীদের নিজেদের অহমিকা থেকেই ওদের বাঁচাতে চেয়েছি। সব কিছুরই তো একটা সীমা থাকা উচিৎ।”

ঈলীন শান্ত ভাবে কয়েকটা কথার উত্তর দিল। ঈলীনের এই গাম্ভীর্য ঠিক যেন মেনে নিতে পারছিল না নেড। তবু ও বলে যেতে লাগল যে অনেক লোকের সঙ্গে ওর কথা হয়েছে। তারাও স্বীকার করেছেন যে বছরের পর বছর পাদ্রীদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে।

ঈলীন অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না।

“দেখ, নেড, আজকাল আমার মনে হয় যেন তোমার জীবনে অনেক কিছুর সঙ্গে একজন স্ত্রী লোক এই পর্য্যন্ত। তুমি মাঝে মধ্যে বাড়ীতে আস, একদিন দুদিন থাক আমার সঙ্গে। আমাদের বিবাহিত জীবন ক্রমশঃ যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। তুমি ছেলেটার সঙ্গে খেল, পিয়ানো বাজাও আর চিঠি লেখ—কি লেখ আমি জানি না। তোমার ধ্যান-ধারণা, রাজনীতির কথা আমাকে কিছুই বলো না।”

“ঈলীন, সম্প্রতি আমি তোমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করিনি ঠিকই, কারণ, আমার মনে হয়েছে এসবে তোমার আর রুচি নেই।”

“তুমি যে ব্যাপারে যুক্ত তাতে আমার রুচি না থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করিনি কারণ আমি জানি যে আমার ধারণার সঙ্গে তোমার আর মেলে না। তোমার নিজের ধ্যান-ধারণা নিয়েই তুমি মগ্ন। এমন কি তুমি এখন আলাদা ঘরে শুচ্ছ’ যাতে তোমার বক্তৃতা তৈরীতে বিঘ্ন না হয়।”

“কিন্তু মাঝে মধ্যে তো তোমার ঘরে, তোমার কাছে আসি, ঈলীন!”

“হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে,” বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিল ঈলীন,—“কিন্তু বিয়ে সম্পর্কে আমার ধারণা তা নয়, এদেশের রীতিও তা নয়, এমনকি চার্চেরও তা মনপুতঃ নয়।”

"ঈলীন, এটা কিন্তু, যুক্তির কথা বললে না। অথচ, সাধারণতঃ যুক্তি দিয়েই তো তুমি কথা বলো!"

"থাক। তর্ক করে লাভ নেই," ঈলীন বলল,—"আমার আশঙ্কা হয় যে আমাদের মতের মিল হয়ত আর হবে না।"

নেডের মনে পড়ল ঈলীনকে সে প্রায়ই বলত,—"ঈলীন, সব ব্যাপারেই আমাদের মতামত অভিন্ন।"

"যদি একবারও বুঝতে পারতাম যে ঈলীনের সঙ্গে আমার এমনি করে মতভেদ ঘটবে," নেড মনে মনেই বলল,—"তাহলে কখনই এত কথা বলতাম না।" কষ্ট পেল নেড ঈলীনকে দুঃখ দিয়েছে বলে। ঈলীন—সদ্য ফোটা ফুলের মত—তার সুন্দরী স্ত্রী—এভাবে তার মনে আঘাত করা উচিৎ হয়নি তার।

"কি সুন্দর সূর্যমুখী ফুল ফুটেছে, দেখেছ!" অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইল নেড।

সোয়ালো পাখীদের একটা ঝাঁক পাশের আপেল গাছটাতে কিচির মিচির করছে। নেড ভাবল বলবে কিনা ঈলীনকে সোয়ালোদের কথা। কিন্তু ঈলীন পাখী ভালবাসে না—সে জানে। ওরা চুপচাপ হাঁটতে লাগল। হঠাৎ ঈলীন জানতে চাইল যে নেড ছেলেকে দেখে যাবে কিনা।

"হ্যাঁ," নেড বলল,—"যাও নিয়ে এস ছেলেটাকে। আপেল গাছে একটা ঝাঁকুনী দিলেই অনেক আপেল পড়বে। ছেলেটা খুশী হবে।

"মতভেদ হতেই পারে," নেড আবার মনে মনে বলে,—"কারণ, মনেরও পরিবর্তন হয়, ইচ্ছারও ক্ষয় হয়, অন্তঃকরণ থাকে শুদ্ধ; আর এই সন্তানের প্রতি টান—কি অসম্ভব রকম প্রবল।" ছেলেকে ঈলীনের কোলে দেখেই সে ভুলে গেল আয়ার্ল্যাণ্ড, ভুলে গেল পাদ্রী আর রাজনীতি—সব ভুলে গেল সে। ঈলীনের হাত থেকে ছেলেটাকে নিয়ে মাথার ওপর দুলিয়ে দুলিয়ে খেলতে লাগল সে। বাচ্চাটা খিল-খিল করে হাসতে লাগল আর আধ আধ স্বরে কত কি বলতে লাগল।

আপেল বাগানে সন্ধ্যার অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসতে লাগল। আকাশে একটা দুটো তারা ঝিকিমিকি করতে লাগল। অনেকক্ষণ খেলা করে ছেলেটা তখন নেডের কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই রাত্রে ওরা নিজেদের বিবাদের কথা ভুলে গেল। ছেলেকে ঘিরেই ওদের ভালবাসার সাগর যেন আবার ক্ষণেকের জন্য উথ্‌লে উঠল।

পরদিন আবার একটু চিড়্ খেল ওদের সম্পর্কে। নেড ঈলীনকে বোঝাতে চাইল যে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে সে তেমন কিছু বলেনি। ঈলীন কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে একমনে কি একটা সেলাই করে চলল। শেষে হতাশ হয়ে নেড ভাবল একটু পিয়ানো বাজাবে। তখনই ঈলীনের কথা মনে পড়ল। হয়ত ও পছন্দ করবে না। শেষে একটা বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। আর অচিরেই নিমগ্ন হয়ে গেল পাঠে।

এক সময় সেলাই তুলে রেখে ঈলীন বলল,—"আমি শুতে যাচ্ছি নেড।"

নেড মুখ তুলে তাকাল! আর সেদিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—এ লোকটা কে? একে তো ও চেনে না! ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—"সারা সন্ধ্যেটা তুমি বই পড়ে কাটালে। দেখা যাচ্ছে আমার চাইতেও বই তোমার অনেক প্রিয়। আমি চললাম।"

এত রূঢ়ভাবে কখনও কথা বলেনি ও। নেড ক্ষণেকের জন্য অবাক হয়ে ঈলীনের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসল। আহ্! একমাস সে যন্ত্রে হাত দেয়নি। বুকটা যেন শুকিয়ে গেছে! তার প্রিয় বাখ-এর সঙ্গীত ওর হাতে মূর্ত হয়ে উঠল। একবার মনে হল শোওয়ার ঘরে স্ত্রীর কানে হয়ত যাবে। সে জানে পিয়ানোর বাজনা ঈলীনকে ক্ষুব্ধ করে। করুক। তবু সে বাজাতে লাগল।

মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে ড্রেসিং টেবিলে বসাতে বসাতে ঈলীন থেমে গিয়ে শুনতে লাগল। চোখের আড়াল হতেই পিয়ানোতে গিয়ে বসেছে! আর ওই বাখ! সঙ্গীত তো নয় বৈদগ্ধের হামবড়ামী।

একবার ভাবল চাকরাণীটাকে পাঠিয়ে বারণ করে দেয়। তারপর নিজেরই সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে বলে চুপ করে গেল।

পোষাক ছাড়তে ছাড়তেই কান্নার আবেগে ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, আর বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ও। মনে হ'তে লাগল নেড নামে যে লোকটাকে ও বিয়ে করেছে—তার কোন নৈতিক গুণ নেই। অনায়াসেই হয়ত একদিন ঈলীনকে বলবে 'আমি যাচ্ছি'—আর চলে যাবে চিরদিনের মত। ভাবতে ভাবতে আর বাজনা শুনতে শুনতে হয়ত কোন স্বপ্নের জগতে ও চলে গেছল। হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজ পেল। কার্পেটে পায়ের শব্দ। মোমবাতি দুটো নিভিয়ে সে ওর কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল।—"আমার ছোট্ট সোনা বউটা, আমার ওপর কি রাগ করেছ তুমি?"

রাগের মেজাজেই পাশ ফিরে শু'ল ঈলীন, কিন্তু একটা হাত নেড ধরে ফেলল। ফিস্ ফিস্ করে কত আদরের-ভালবাসার কথা বলতে বলতে ক্রমশঃ স্ত্রীর রাগ কমিয়ে দিল সে। স্ত্রীর লালবর্ণের চিকণ কেশরাশি দুহাতের মধ্যে নিয়ে চুম্বন করল। তবুও মুখ ঘুরিয়ে রইল ঈলীন। কিন্তু বুকের ভেতর খুশীর ঢেউ সামলাতে পারছিল না ও। হঠাৎ উঠে বসে স্বামীর গলা দুহাতে জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলল,—"ওহ্ নেড, তুমি কি এখনও আমাকে ভালবাস?"

নেড মৃদু হেসে বিছানায় উঠে আসতেই ঈলীন নেমে দাঁড়াল। এ জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও। নেড বিছানায় চিৎ হয়ে শুতেই ঈলীন স্লিপিং গাউনটা ছেড়ে স্বামীর বুকের ওপর সটান শুয়ে পড়ল। সমস্ত শরীর দিয়ে স্বামীর শরীরকে আঁকড়ে ধরে গলার খাঁজে মুখ রেখে অঝোরে কেঁদে ফেলল। নেড কোন কথা বলল না। আদরে আদরে সব কিছু ভুলিয়ে দিল। এক সময় ঈলীন স্বামীর বুকে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম এল নেডেরও দুচোখ ভরে। কাল সকালেই ডাবলিনের ট্রেন ধরতে হবে ভাবতে ভাবতে সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গল ভোর সাতটায়। দুজনেরই। ঈলীন জানতে চাইল

ভাবলিনে কি না গেলেই নয়। ওর ইচ্ছে স্বামী যেন না যায়। কিন্তু উপায় নেই। যেতেই হবে। অগত্যা। ঈলীন অনিচ্ছা সত্বেও স্বামীকে ছেড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি স্বামীকে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিতে হবে। খাট থেকে নেমে নীচু হয়ে মেঝে থেকে স্লিপিং-গাউনটা তুলে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল ঈলীন।

দাড়ি কামাচ্ছে নেড ওর ঘরে। পেটিকোটের দড়িটা কোমরের সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে ঈলীন দরজা দিয়ে মুখ গলিয়ে কথা বলতে লাগল স্বামীর সঙ্গে। অনেক প্রশ্ন ওর মনে। ওর ইচ্ছে স্বামী দাড়ি কামাড়ে কামাতে জবাব দিক। খাবার তৈরী হচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে নেড দেখল স্ত্রীর দিকে। দুটি নিটোল স্তনের দিকে ওর দৃষ্টি আটকে গেল। ঈষৎ লজ্জা পেয়ে ঈলীন তাড়াতাড়ি জামাটা প'রে ফেলল। হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার দাঁড়ি কামাতে কামাতে স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলল সে। খাবার পর হেঁটেই দুজনে ষ্টেশনে গেল। ট্রেন এল। হাসতে হাসতে হাত নেড়ে বিদায় জানাল স্বামীকে।

বাড়ী ফিরে এল ঈলীন। কি উজ্জ্বল রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন আজ। মনের ভেতর গান গুণগুনিয়ে উঠল ওর। সূর্যের আলোয় ওর হৃদয়ের ভেতরটাও যেন আলোকিত হয়ে গেল। মনে হল ও জীবনে কোন দিনই আর অসুখী হবে না।

নেড কথা দিয়েছে ওকে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে আর কিছু বলবে না সে। আসলে ধর্ম ব্যাপারটাকেই সইতে পারেনা নেড। অবশ্য পাদ্রীরাও কিছু—সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। কিন্তু মনে হয় কতকগুলো বই পড়েই যেন নেডের ঘৃণাটা আরও বেড়ে গেছে। একটা বইতো সঙ্গে নিতেই দেখেছে ও। বাকী বইগুলো স্বামীর ঘরের আলমারীতে আছে। আস্তে আস্তে স্বামীর ঘরে ঢুকল ও। বইগুলো আলমারীর পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। নাম পড়তে পারল না। কিন্তু টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া কিছু লেখা কাগজ দেখে ওর খুব কৌতূহল হ'ল। এখন নেড যা লিখবে তাই ছাপা হবে।

কাগজগুলো হাতে তুলে নিল ও। একবার ভাবল কাজটা ঠিক হচ্ছে না। হঠাৎ নামটার ওপরে চোখ পড়ল ওর।—"এ ওয়েষ্টার্ন-থিবেট।" "তাহলে সেটাই লিখছে—যা লিখবে না বলে ওর কাছে কথা দিয়েছিল নেড!" কিন্তু রাগ এলনা মনে। বরং চুরি করে দেখার একটা লজ্জা ওকে ঘিরে ধরল। তারপর মনে পড়ল ওরই টাকায় তো আন্দোলনটা চলছে। ইদানীং স্বামী অনেক টাকা খরচা করছে। এখন ওরা রীতিমত ধনী—তা ঠিক। বিয়ের পরই বাবা মারা যেতে এখন ঈলীনই বিশাল সম্পত্তির মালিক। আর ওরই টাকায় ধর্মের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। টাকা খরচের স্বাধীনতা ও স্বামীকে দিয়েছিল। তবে কি টাকা দেওয়া বন্ধ করে ও স্বামীকে বলবে যে ধর্মের বিরুদ্ধে তুমি কিছু করতে পারবে না। না-না-সেটা খুব নীচ কাজ হবে। তাছাড়া ধমকের কাছে নতি স্বীকার করবে নেড তেমন মানুষই নয়।

কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা ওকে দায়ী করবে না? তখন কি জবাব দেবে ও! এ তো তারই দোষ!

"হায় ভগবান! এখন আমি কি করি!" নিজের মনেই কাৎরে উঠল ঈলীন! হঠাৎ ফাদার ব্রেনানের কথা ওর মনে পড়ল। ওই লোকটাকে সব খুলে বলা যায়। এখন তো দশটা বাজে। এগারটার প্রার্থনা শুরু হবার আগেই ও বাই সাইকেলে চেপে চার্চে পৌঁছে যেতে পারে! ভাবা মাত্রই নীচে নেমে এল।

ভাগ্য ভাল ওর। ফাদার ব্রেনান সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। তখনই দেখা হল। হাঁফাতে হাঁফাতে ও বলল,— "কয়েক মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, ফাদার!"

"আমি তো এখন চার্চে যাচ্ছি, কন্যা।"

"দু একটা কথা বলতে পারি না আপনি ভেতরে যাবার আগে?"

ওকে এত উত্তেজিত দেখে ফাদার সঙ্গে করে নিজস্ব ঘরে নিয়ে এলেন।—"তুমি এখানে ব'স। প্রার্থনার পরে তোমার কথা শুনব।"

যদি ফাদার টাকা দেওয়া বন্ধ করতে বলেন তাহলে ওদের বিবাহিত জীবনের ইতি পড়বে। ও নিজেই তো স্বামীকে রাজনীতিতে নামিয়েছে, টাকার অভাব হবে না বলেছে। এখন সেই টাকাই যেন জোর করে স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছে ওকে। কিন্তু এটা বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রশ্ন নয়। ফাদারকে না বলে ও থাকতে পারছে না। যদি ফাদার সত্যিই টাকা দেওয়া বন্ধ করতে বলে! তবু বলতে হবে। তাহলেই যেন ও বল পাবে। স্বামীকে বলবে ফাদারের সঙ্গে আলোচনার কথা। তখন নেড হয়ত আর ওকে ভালবাসবে না। কিন্তু উপায় নেই। স্বামীর ভালবাসা এই মরজগতের; কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসা অনন্ত। সবই ঈশ্বরের কৃপায় ঘটে। নেডের ঘরে ঈশ্বরই ওকে পাঠিয়েছেন। এখন ফাদারের কাছেও তিনিই ওকে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তিনিই জানেন স্বামীর ভালবাসা আর ওর কপালে জুটবে কিনা। এমনকি ওর সন্তানও যদি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় —তাও তো তাঁরই ইচ্ছায় হবে।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ও ফাদারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কিন্তু ঠিক গুছিয়ে কথা বলার মত মনের অবস্থা ওর নয়। কোন মতে তবু বলার চেষ্টা করল।—"আমি জানি না আমার মনে কোন পাপ আছে কিনা, তাই সব কথা আপনাকে খুলে বলছি।" তারপর বলে গেল নেডকে টাকা দেওয়ার কথা এবং কি ভাবে ওর মতের বিরুদ্ধ কাজে স্বামী সে টাকা ব্যয় করছে।— "আমার সন্তান হবার পর আগের মত রাজনীতি নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না। এখন স্বামী বলছে যে আয়ার্ল্যাণ্ডে একটা ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজন আছে।"

"কবে তিনি একথা তোমাকে বলেছেন?"

"পরশুদিন। গত পরশু। ষ্টেশনে যাবার পথে। বলছিল—আন্দোলনটা পাদ্রী বিরোধী হতে পারে, কি ধর্মবিরোধী নয়। আজ সকালে স্বামীর লেখা কিছু কাগজ আমি দেখি—দেখাটা উচিৎ হয়নি অবশ্য···।"

"যা হোক, তাতে তুমি দেখলে যে ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু লেখা আছে?"

ঈলীন মাথা নাড়ল।

"এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতেও পারছি না।" ফাদার বললেন, "বুঝতে পারছি না তোমার স্বামী এত বোকা কেন। তাকে চিনি না, জানিনা-তা ঠিক। কিন্তু উনি এত বড় ভুল করছেন কেন; আমাদের দেশকে একসূত্রে বাঁধার কাজ করেছি—পেরেছিও প্রায়। এখন মনে হচ্ছে মিঃ কারমেডী আমেরিকা থেকে এসেছেন আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে। এই চাল চেলে তার কি লাভ হবে? আমি বিশেষ জোর দিয়ে তোমাকে বলছি, কন্যা, তুমি তোমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করবে পাদ্রীদের সাহায্য না পেলে আর কাদের সাহায্যে তিনি এতবড় কাজটা করতে পারবেন?"

"স্বামীর সঙ্গে রাজনীতির কথা আর হয় না, আগে হ'ত।"

"নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনছেন। হ্যাঁ, তুমি আর একটা কথা কি যেন বলছিলে?"

"বলছিলাম—এই রাজনীতিতে আমার টাকাই খরচ হচ্ছে। বুঝতে পারছি না টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেব কিনা। এ ব্যাপারেই আলোচনা করতে এসেছি।"

"শুধু টাকা দেওয়াই বন্ধ করবে না", ফাদার বললেন,—"তুমি অবশ্যই প্রভাব খাটিয়ে তোমার স্বামীকে নিরস্ত করবে।"

"আমার আশঙ্কা হয়," ঈলীন বলল,— "যে যখনই স্বামীকে টাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলব—এবং বলব যে আপনারও তাই মত—"

"আমিও বলেছি সে কথা তোমার স্বামীকে জানাবার দরকার নেই।"

"আমি স্বামীর কাছে কিছুই গোপন রাখতে পারি না। কাজেই সমস্ত সত্যি কথাই আমাকে বলতে হবে।" ঈলীন বলল,—"আর যখনই সব বলব, কেবল যে আমার প্রভাব খাটানটাই মিথ্যে হয়ে যাবে

— তাই নয়, আমার সন্দেহ, হয়ত, স্বামী আমার সঙ্গে আর থাকবেই না।"

"কিন্তু তোমাদের বিয়ে তো ভালবাসার বিয়ে?"

"হ্যাঁ, অনেকদিন আগে। চার বছর আগে।"

"আমার মনে হয় না তোমার স্বামী তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু তবুও, আমার মনে হয়—"

"আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন?"

একটু বা গর্বিতভাবে কথাটা বলল ঈলীন। ফাদার অবাক হলেন। খানিকটা লজ্জা আর অনেকখানি আশঙ্কা নিয়ে ঈলীন তাড়াতাড়ি উঠে এল ফাদারের সামনে থেকে।

বাড়ীতে ফিরে ঈলীন দেখল নেড এসেছে। কাগজপত্র ঘাঁটছে।

"আমি কিছু দরকারী কাগজ নিতে এসেছি।" নেড বলল,—"এর পরে ট্রেন কটায় জানো?"

ঈলীন লক্ষ্য করে দেখল স্বামীর মুখে কোন সন্দেহের ভাব নেই। ট্রেনের সময় দেখতে বইটা খুলল ও।

কাগজগুলো পেয়ে গুছিয়ে নিয়ে নেড বলল,—"চল পাহাড়ের দিকে একটু হেঁটে যাই। এখনও তো সময় আছে।"

ঈলীন সম্মতি জানিয়ে স্বামীর সঙ্গে বেরুল। হাঁটতে হাঁটতে অনেক রকম কথা হল। আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস নিয়েও অনেক কথা হল! তারপর একসময় ষ্টেশনে যাবার সময় এল।

"তুমি ডিনারের জন্য একটু অপেক্ষা করো। আমি হয়ত একটু রাতের ট্রেনে ফিরব। দিনের অধিকটা তো বরবাদ হয়ে গেল কাগজ খুঁজতে এসে।"

ষ্টেশনের পথে যাবার সময়েই ঈলীনের মনে হল এখনই কথাটা বলার পক্ষে ভাল সময়।—"নেড, তুমি ডাবলিনে যাচ্ছ কেন? তুমি তো সেই সব লোকের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছ যারা ক্যাথলিকদের বিরোধী, যারা আমাদের ধর্মকে ঘৃণা করে, যারা সংস্কারাচ্ছন্ন।"

"কিন্তু" নেড বলল,—"এসব কথা বলছ কেন। যখন থেকে আমরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা বন্ধ করেছি, তখন থেকে আমরা ভালই আছি। আমরা তো অন্য সব ব্যাপারেও একমত হয়েছি।"

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে ঈলীন বলল ঃ

"কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এ ব্যাপারে আলোচনাটা আমরা এড়াব কি করে ; কারণ, আমার টাকাতেই তো এই আন্দোলনের পুষ্টি হচ্ছে।"

"আমি অবশ্য ওদিকটা কখনও ভাবিনি। সে তো ঠিকই। তা তুমি কি টাকা দেওয়া বন্ধ করতে চাও ?"

"আমার ওপর রাগ করছ না তো, নেড ? আমার খুব নীচ মন, একথা ভাববে না তো যদি টাকা দেওয়া বন্ধ করি ? হয়ত' তোমার রাজনৈতিক জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছি আমি।"

"ও ঠিক আছে", নেড বলল,—"আমি চালিয়ে নিতে পারব যাহোক করে। এবার আমি যাই। ট্রেনের সময় হয়ে এল।"

"তোমার সঙ্গে ষ্টেশনে যাব ?"

"যদি তোমার ইচ্ছে হয়। কেবল অন্য কথা বলব। রাজনীতি নয়। প্রত্যেকের বিবেক তার নিজের কাছে আইনের মত—কাজেই যে যার নিজের মত করেই চলবে।"

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নেড বলছিল যে ন্যায়-নীতি অনুসারে ঈলীনের উচিৎ নেডকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলা, অন্ততঃ পক্ষে খাওয়া থাকার জন্য টাকার দাবী করা উচিৎ। ঈলীন বারবার স্বামীকে অনুনয় করে যাচ্ছিল—এরকম। নির্মম ভাবে হাসি ঠাট্টা না করার জন্য।

বাড়ী ফেরার পথে ঈলীন ভাবছিল আর ওর বুক দমে যাচ্ছিল। স্বামীর গলার স্বরে ঠাট্টার ভেতরেও যে ইশারাটা ছিল, তা ভুল করার নয়। মনে মনেই বলে উঠল ও,—"আমার সব শেষ হয়ে গেল।"

ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে আপেল গাছটার নীচেই ঈলীন বসে পড়ল।

একলহমায় ওর শৈশব, স্কুলের দিনগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠল! তারপর শুরু অন্য জীবন। এবার বুঝি তাও শেষ হয়ে এল। অথচ বয়স হল মাত্র পঁচিশ। রাজনীতি ভাল লাগে না, বই পড়তেও ভাল লাগে না। কুমারী-জীবনে ও ছিল চালাক—বুদ্ধিমতী। এখন বয়স বাড়ার সঙ্গে ওর বুদ্ধিও যেন কমে গেছে। কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে ও।

নেড একটু রাত করেই ফিরে এল। স্ত্রীর সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে বলল,—"ফাদার ব্রেনান লোকটি বেশ চালাক। আচ্ছা। তুমি কি স্পষ্ট করে ওঁকে বলেছ যে তুমি আমাকে আর টাকা দিতে চাও না?

"হ্যাঁ, কিন্তু নেড—"

"না, না, আমি একটুও রাগ করিনি", সে বলল,—"রাজনীতি করার টাকা আমি সব সময়ই জোগাড় করতে পারব। কিন্তু, ঈলীন, তুমি বোধ হয় তোমার জীবনের সব ব্যাপারেই ওঁর সঙ্গে আলোচনা করেছ?"

ঈলীন স্বীকার করতে ফাদার ব্রেনানের উদ্দেশ্যে কয়েকটা ঠাট্টা করে হো হো করে হাসল নেড।

খাওয়ার পরে সেলাইয়ের জিনিষগুলো কোলে নিয়েই বসে রইল ঈলীন। মনের মধ্যে নানা কথার ঝড়। স্বামীর কাছে পাণ্ডুলিপি পড়ার কথা আজ হোক কাল হোক বলতে হবে। অবশ্য তাতে স্বামী কিছুই হয়ত মনে করবে না। কারণ, টাকার ব্যাপারে স্বামীর কোন রাগ তো ওর নজরে পড়েনি।

শেষে উঠে দাঁড়াল ঈলীন।—"আমি শুতে যাচ্ছি, নেড।"

"একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"বসে থেকেই বা কি করব! কথাও বলছ না আমার সঙ্গে। নিজের কাজেই ব্যস্ত!"

"এত খিটখিট করছ কেন, ঈলীন? তোমাকে আদর করে চুমু

খেলাম এতেই তো বোঝা উচিৎ যে ওই রকম ব্যবহারের পরও তোমাকে আমি ভুল বুঝিনি।

বুড়ো আঙ্গুলে সূঁচটা ফুটে গেল। এক টান মেরে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঈলীন!

"আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি, ঈলীন···এখন আর তোমার ধ্যান ধারণার কথা আমাকে বলতে হবে না। অন্ততঃ আমাদের এই শেষ সম্পর্কটুকুও যদি ভেঙ্গে যায়—কিছুই আর থাকবে না—থাকবে কি?"

"আমি ফাদার ব্রেনানের কাছে গোপনেই সব বলেছি। তুমি মনে করো না যে—"

"তোমার কাছ থেকে যা সব উনি জেনেছেন সে সব অন্য অনেক-রকম উপায়ে কাজে লাগাতে পারবেন।" বাধা দিয়ে নেড বলল!

"তুমি জান না কি পরিস্থিতিতে—আমি তোমার ঘরে, কি বই তুমি পড়, দেখতে গিয়ে তোমার পাণ্ডুলিপিটা পড়েছি। আমার উচিৎ হয়নি পড়া, স্বীকার করি! তখন—আচ্ছা, আমি চললাম।"

স্ত্রীর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে নেড ভাবতে লাগল—এখন আর স্ত্রীর পেছু পেছু যাওয়া যাবে না। বিবাহসূত্রটা বোধহয় ছিঁড়ে গেল। এখন না গেলে তাই ভাববে স্ত্রী। মুক্তি সে এযাবৎকাল চেয়েছে। যৌনজীবনের দ্বিতীয় পর্ব শেষ। তৃতীয় পর্ব তো ত্যাগের। বাপ-মায়ের জীবন সন্তানে বার্তায়। কিন্তু তার কাজ তাকে করতে হবে। ঈলীন ভাববে ছেলেকে নিয়ে। ঈলীন সব ব্যর্থ করেছে, বানচাল করে দিতে চেয়েছে। ভেবে এবার রাগ হল তার। পাণ্ডুলিপি পড়েছে, তারপর ওই পাদ্রী বেটার কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছে। নাঃ!—যেমন ভেবেছিল—মেয়েটার মন তেমন উঁচু নয়, চরিত্রও মহৎ কিছু নয়।

একদিন ঈলীন বলল,—"আমি তোমার পাণ্ডুলিপি পড়েছি, তারপর ফাদারের কাছে সব বলেছি বলেই কি তুমি আর আমার ঘরের ছায়াও মাড়াওনা, নাকি আমার কাছে আসতেই তোমার ক্লান্তি বোধহয়।"

"বলতে পারি না। সত্যি বলতে কি, এসব কথা আমাকে খুব যন্ত্রণা দেয়। আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ; কাজ ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা এখন আমার নেই।"

সেই দিন থেকে ঈলীন ভালবাসার কথা বলে আর স্বামীকে বিব্রত করতে চাইল না। কেমন নিজের মধ্যেই গুটিয়ে নিল নিজেকে।

ওদের সম্পর্কটা এরপর থেকে হয়ে গেল অনেকটা বন্ধুর মত। নেড জানত স্ত্রীর দিক থেকে ওর আর কোন বিপদ নেই। টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে, এই পর্য্যন্তই।

নেড তাই স্ত্রীকে বলছিল কিভাবে আন্দোলনটা ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছে।

"ওহ্, নেড। তোমার এই আন্দোলন যদি ধর্মের বিরুদ্ধে না হত, তাহলে আমিও তোমাকে অনুসরণ করতাম। কিন্তু তুমি তো এখন আর আমাকে বিশ্বাস করবে না।"

"হ্যাঁ, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। আমার সঙ্গে ডাবলিনে চল ; মিটিং-এ যোগ দাও। আমার বক্তৃতা শোন—এটা আমার ইচ্ছা।"

"তোমার বক্তৃতা শুনতে আমারও ইচ্ছে করে, নেড। কিন্তু মিটিং-এ যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

ওরা ষ্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। কিছু সময় চুপচাপ হাঁটতে লাগল ওরা। তারপর, হঠাৎই গম্ভীরস্বরে—যেন মনের অতলে জেগে ওঠা কয়েকটা কথা বলে ফেলল ঈলীন ঃ "কিন্তু যদি তুমি ব্যর্থ হও, নেড, তাহলে আয়ার্ল্যাণ্ডে তুমি অচ্ছুত বলে গন্য হবে, আর যদি তাই-ই হয়, তাহলে তো তুমি চলে যাবে, কোনদিন আর দেখতে পাব না তোমাকে।"

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল নেড। মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল মনে মনে ভাবল—ব্যর্থ হওয়া এবং অচ্ছুত হওয়া—কোনটাই অসম্ভব নয়। স্ত্রীর কথাগুলো যেন দৈববাণীর মত শোনাল।

ট্রেন এসে গেল। উঠে পড়ল নেড। স্ত্রীকে বিদায় জানাল। ট্রেন ছেড়ে দিতে মনে মনে বক্তৃতার মহড়া দিতে লাগল।

সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। সাহস ভরে আমি সবই বলব! বলব যে আয়ার্ল্যাণ্ড প্রোটেষ্ট্যান্টদের দেশ হয়ে যাচ্ছে। এবং ক্যাথলিকরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কারণ, এদেশে আর কোন আনন্দ নেই।

এই 'আনন্দ' কথাটার ওপরেই সে জোর দিল তার বক্তৃতায় সর্বত্র। একটা বিরাট মিটিং-এ সে বলল,—"হয়ত আপনারা বলবেন যে আইরিশ জনসাধারণ খুব গরীব তাই 'আনন্দ' করার ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু বছরে পনের মিলিয়ন মুদ্রা তো ধর্মের জন্য ব্যয় করছেন।" এবারে সময় এসেছে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কিছু করার। কেবল পাদ্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কোন লাভ নেই. কেবল চার্চ বানালেই জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হয় না।" একেবারে তথ্য এবং তত্ত্ব দিয়ে নিজের বক্তৃতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল নেড।

ফাদার মারফি জবাব দিতে উঠলেন। ফাদার মারফি সুবক্তা। তিনি বললেন যে মিঃ কারমেডী পাদ্রীদের ব্যর্থতাকে নয়, পাদ্রীদের সাফল্যকে কটাক্ষ করেছেন এবং নিন্দা করেছেন। এটা একটা অদ্ভুত অভিযোগ। এদেশ থেকে লোকজন চলে যাচ্ছে—যার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত—মিঃ কারমেডীর কথায় তারা নিষ্পাপ ছিল, এখন পাপের মুখে যাচ্ছে। অদ্ভুত অভিযোগ! অর্থাৎ, তার কথার অর্থ দাঁড়াল—লোকেরা নোংরা জীবন যাপন করবার জন্য এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মিঃ কারমেডী ঐ কথাটাই ঘুরিয়ে বলেছেন—

"আনন্দময় জীবন।" কিন্তু অর্থটা সকলের কাছেই, আশাকরি, পরিষ্কার।

নেড মনে মনে কেমন অসহায় বোধ করল। সে আমেরিকাতে কি কি বলেছিল সেই সব মনে করার চেষ্টা করতে লাগল।

এরপর একজন তরুণ যাজক বক্তৃতা দিতে উঠল। এবং নেড ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য এবং শিহরিত হতে লাগল। কারণ যাজক যা বলল তাতে

নেডকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা বোঝায়। অন্যান্য উপস্থিত তরুণ যাজকরাও তাকে সমর্থন করল।

মোটমাট একটা অপ্রত্যাশিত ফলাফল। নেড লক্ষ্য করল যে ফাদার মারফির আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা কেমন ম্লান হয়ে গেল। আর নেড ভাবতে আরম্ভ করল যে দেশের যুবকেরা তার দলেই আছে।

পরের সপ্তাহে আরেকটা মিটিং-এ বক্তৃতা করে আরও বিপুলভাবে অভ্যর্থনা পেল সে। বাড়ী ফিরতে ফিরতে সে স্ত্রীর কথাই ভাবছিল। তার এই সাফল্যে স্ত্রী কি ভাবছে। যাই ভাবুক। আসল কথা—আয়ার্ল্যাণ্ডের ঘুম ভাঙ্গছে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে চার্চ থেকে চার্চে। মনে হচ্ছিল যেন এই আন্দোলন একটা অসম্ভব কিছু ঘটাতে যাচ্ছে, এবং এই গল্-দেশ মুক্ত হতে যাচ্ছে।

তরুণ যাজকদের ক্ষোভ ছিলই। তাদের এবং নীচুতলার পাদ্রীদের সে ওপর তলার বিশপদের বিরুদ্ধে সে উত্তেজিত করল। বলল যে বিশপেরা আরাম কেদারায় বসে শ্যাম্পেন পান করেন আর তরুণরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বিনিময়ে পান সামান্য আহার পানীয়।

এই অবস্থায় বিশপদের পরিষদীয় সভা বসল। তরুণ যাজকদের দাবী মেটাতে এবং জনসাধারণের দাবী মেটাতে বিবাহ-কর ইত্যাদি কমিয়ে দেওয়া হল। স্থির হল দেশের সমস্ত চার্চ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে নামবে। এই সময় নেডের সামান্য অসতর্কতায় চার্চের জয় সুনিশ্চিত হল। নেড তার একটা বক্তৃতায় উত্তেজিতভাবে জন মিচেল এর বই থেকে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করে বলল,—"আইরিশ জনতা অনেকদিন আগেই মুক্ত হ'ত কিন্তু ওরা ভীরু এবং কাপুরুষ তাই এই দুরবস্থা।"

তার এই দুর্বল উক্তির সুযোগ নিয়ে একজন বিশপ সংবাদ পত্রে লিখল যে ফরাসী বিপ্লবের দমন নীতি চাপিয়ে দিতে চাইছেন মিঃ কারমেডী আইরিশ জনতার ওপর। আরেকজন বিশপ লিখলেন—এটা খ্রীষ্ট ধর্মের এবং স্বয়ং খ্রীষ্ট-বিরোধী। তরুণ যাজকরা এবং ছোট পাদ্রীরা

ওদের ক্ষোভ মিটে যাওয়ায় সরে পড়ল। আর এক মুহূর্তে নেডের মনে হল যুদ্ধটা চালান আর অসম্ভব।

এরপর যত জায়গায় সে মিটিং করতে গেল—বাধা পেল, ইঁট-পাটকেল খেল এবং সংবাদপত্র গুলিতে বিষোদগার সুরু হল তার বিরুদ্ধে। চিঠি লিখলে তাও আর ছাপা হল না।

একদিন সকালে স্ত্রীকে সে বলল,—"কাগজের এইসব খবর দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে?"

"দেখ, চক্র একটা ঘুরছে।" ঈলীন বললে,—"তুমি হয়ত এখন নীচে পড়ে গেছ—কিন্তু চক্রটাতো ঘুরছেই। তবে আমার মনে হয়, যে দেশের যা ঐতিহ্য এবং মানসিকতা—সে সবের বিরুদ্ধে গিয়ে কোন বিপ্লব করা যায় না। আইরীশবাসী মরুক—বাঁচুক, ক্যাথলিক হিসেবেই তা ঘটবে।"

"হ্যাঁ, রেড ইণ্ডিয়ানরাও মানুষের কাটামুণ্ডু কোমরে ঝুলিয়ে রেখেই বাঁচবে।" মুচকী হেসে নেড বলল।

"ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের কথা না বলাই ভাল। আমরা যে সব ব্যাপারে একমত—সে সব কথাই বলব। আমি তো শুনেছিলাম যে এদেশে এসে তুমি জীবনটাকে সত্যি উপভোগ করেছ, তাই আমেরিকাতে আর ফিরে যাবে না।"

"সেটা তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ঈলীন!"

"শুনেছি আয়ার্ল্যাণ্ডের মত এমন সুন্দর সহানুভূতি সম্পন্ন দেশ পৃথিবীতে আর একটাও খুঁজে পাওনি তুমি!"

"সত্যি, এদেশের লোককে আমি ভালবাসি। যদি সত্যিই আমি ওদের একজন হয়ে থাকতে পারতাম!"

"ওদের একজন হয়ত হতে পারতে। কিন্তু তখন তুমি ওদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে! কেননা, তুমি যেমনটা চাও ওরা তো কখনও তা হত না।" ঈলীন জবাব দিল।

বৃথা তর্ক করতে নেডের আর স্পৃহা নেই। মাঝে মাঝে তাই সে

ভাবে এবার যেটা লিখতে শুরু করেছিল—সেই পশ্চিমের থিবেট বইটা লেখা শেষ করে ফেলবে কিনা। মনে মনে ভাবে, প্রত্যেক জাতিরই একটা নিজস্ব প্রতিজ্ঞা আছে! জার্মানরা সঙ্গীতজ্ঞ। ফরাসী বা ইটালিয়ানরা ছবি আঁকে বা ভাস্কর্যে নিপুণ। ইংরেজদের কবিত্বশক্তি প্রখর। আর আইরিশ জাতির ধর্মীয় গোঁড়ামি।

একটা বই পড়েছিল। কয়েকটা লাইন মনে পড়ল তার—আমরা যেন জাহাজের মত। একই ঘাটে নোঙর ফেলি কিছু দিনের জন্য। তারপর যে যার লক্ষ্যের দিকে চলে চাই। সমুদ্র আর সূর্য এমনি করেই আমাদের ভিন্ন করে দেয়। জীবন আমাদের অতি সংক্ষিপ্ত, দৃষ্টি দুর্বল। তাই শেষ পর্যন্ত পরস্পরের অচেনা থেকে যাওয়াই মানুষের বিধিলিপি।

সে যাই হোক, ভাবল সে, আয়ার্ল্যাণ্ডের জীবন তার শেষ হয়ে গেছে।—একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনে সে তাকিয়ে দেখল এক ঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে। বনহংসীর ঝাঁক, সে জানে। সুদূর দক্ষিণের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধ বেঁধেছে। আইরিশ বাসীরা যাচ্ছে যুদ্ধ করতে অচেনা মানুষদের সঙ্গে। অথচ নিজের দেশের অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এরা লড়তে অপারগ বা নারাজ। আশ্চর্য! একটা জঘন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এইসব পাদ্রী আর বিশপদের কল্যাণে।

একটা রাখাল ছেলে দূরে কোথায় বাঁশী বাজাচ্ছে। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল সে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে সুরটাকে পিয়ানোতে তুলে নিল। কি করুণ সুর। বুকের ভেতরটা তার কেমন করে উঠল। মনে হল এই লোকসঙ্গীতের সুরের মধ্যে দিয়েই একমাত্র আয়ার্ল্যাণ্ডের স্মৃতি তার মনে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

পেছনে এসে দাঁড়িয়ে শুনছিল ঈলীন, বলল,—'নেড আমার মনে হয় এখান থেকে তোমার চলে যাওয়াই ভাল। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিন হৃদয়ের ক্ষত এখানে থেকে বেড়েই যাচ্ছে।"

"আমাকে যেতেই হবে—এমনটা ভাবছ কেন? তোমার মাথায় এ ধারণাটা এল কি করে?"

"দেখতেই পাচ্ছি তুমি সুখী নও এখানে।"

"কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে চক্রটা ঘুরবেই এবং এখন যে দিকটা নীচে—সেটা ওপরে উঠে আসবেই।"

"হ্যাঁ, বলেছি, নেড। কিন্তু কখনও কখনও চক্রটা ঘুরতে অনেক সময় নেয়। কাজেই অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যেও বাইরে ঘুরে এলে তোমার পক্ষেই ভাল হবে।"

নেড ঈলীনকে বলল বনহংসীর সেই উড়ে যাওয়া ঝাঁকের কথা।

"আমি তো তোমার কাছেই প্রথম বনহংসীদের কথা শুনেছি। পাথরের ওপর বসে আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসও তো তুমি আমাকে বলেছ।" নেড বলল ঈলীনকে।

"তুমি তো যেতেই চাইছ, নেড? ওই বনহংসীদের ঝাঁকের মতই তোমার মধ্যেও তো যাবার ইচ্ছেটা প্রবল।"

"হতে পারে। তবে, আমি আবার ফিরে আসব, ঈলীন।"

"তুমি কি সত্যিই ফিরে আসবে? তোমার মনে হয়? কি করে ফিরবে তুমি যদি বুয়রদের পক্ষে লড়াই করতে যাও?"

"এখানে আমার কিছুই করার নেই। আমি একটা নতুন জীবন চাই। তুমিই তো আমাকে বলেছ যেতে।"

"পাঁচ বছর ধরে আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষে কাজ করেছ তুমি। আর এখন, আয়ার্ল্যাণ্ড আর তুমি দুটি জাহাজের মত আলাদা হয়ে গেছ।"

"হ্যাঁ, দুটো ভিন্ন জাহাজের মতো। আয়ার্ল্যাণ্ড রোমের পথেই পা বাড়িয়েছে। আর রোম তো আমার গন্তব্য নয়।"

"তুমি নিজেই একটা জাহাজ, নেড। আয়ার্ল্যাণ্ডে নোঙর—ফেলেছিলে। তুমি আর আমি দুটো জাহাজের মতই। বন্দরে এতদিন পাশাপাশি ছিলাম। আর এখন—"

"আর এখন কি? বল, বলে যাও, ঈলীন।"

"বললামই তো যে আমরা দুটো আলাদা জাহাজের মত।"

"ঠিক এই কথাই পাহাড়ের নীচে শুয়ে শুয়ে আমি—ভাবছিলাম। একটা বইয়ের কতক লাইন মনে পড়ছিল।

"কাজেই এই পৃথিবীতে আর আমাদের আশা করার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে আমি তোমার শত্রু নই, কখনও হবও না। আমাদের সন্তান—তাকে তো তুমি নিশ্চয়ই ভালবাস নেড?"

"হ্যাঁ", নেড বলল,—"আমার সন্তানকে আমি ভালবাসব না!···কিন্তু তুমি ওকে ক্যাথলিক হিসেবে গড়ে তুলবে। এমন সব জিনিষকে ভালবাসতে শেখাবে যেগুলোতে আমার ঘৃণা।"

"আজ রাতে আমাদের মধ্যে আর তিক্ততার সৃষ্টি করো না; নেড ডীয়ার। আজ শুধু ভালবাসা—ভালবাসা না হোক, অন্ততঃ স্নেহটুকু থাক। আজ যে আমাদের শেষ রাত্রি।"

"কেমন করে?"

"কারণ, নেড. কেউ যখন চলেই যেতে চায়, তখনই তার উচিৎ চলে যাওয়া। আমার দিক থেকে তুমি মুক্ত। সকালেও যেতে পার বা যখন খুশী। কিন্তু মনে রেখ, নেড, তুমি ফিরেও আসতে পার যখন খুশী। তোমার দেখা পেলে আমি সব সময়ই খুশী হব।"

ধীর পায়ে ঈলীনের ঘরে এল দুজনে। বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ, একটা অদ্ভুত ভালবাসার জোয়ার উথলে উঠল নেডের বুকে। ডান হাতে ছেলের কপালে, মুখে স্পর্শ করল। এ এক অদ্ভুত টান। অথচ এদেশে থাকতেও ইচ্ছে করছে না আর। মুখ নামিয়ে বাচ্চার গালে চুমু খেল সে। মুখ তুলে ফিরে দেখল ঈলীন তার দিকেই চেয়ে আছে।

"নেড," ঈলীন নম্রস্বরে বলল,—"এবার আমাকে একটা চুমু দাও! ভেবনা যে চলে যাবে বলে আমি তোমার ওপর রাগ করেছি। আমি জানি এখানে তুমি কেমন ভোঁতা মেরে যাচ্ছ দিনের পর দিন। কেন না, আয়ার্ল্যাণ্ডে তো তোমার আর কিছু করার নেই। কিন্তু তুমি যখন ফিরে আসবে, তখন হয়ত অবস্থাটা পাল্টে যাবে।"

"এটা কি তুমি সত্যিই বলছ, ঈলীন, যে আমার চলে যাবার জন্যে তুমি রাগ করনি?"

"তুমি চলে যাবে ভেবে দুঃখ পেয়েছি নেড। তবে সবচে' দুঃখ পেতাম যদি তুমি এখানে বসে থেকে কেবল আমাকে ঘৃণা করতে।"

"তুমি খুবই বুদ্ধিমতী। কিন্তু কেন আমার পাণ্ডুলিপিটা পড়েছিলে?"

"আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমি সেটা পড়ে ছিলাম।"

ঈলীনকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে, ওর নরম, উষ্ণ, দুটি বুকের উত্তাপ নিতে নিতে সুদীর্ঘ চুম্বন করল নেড। তারপর বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল।

শোওয়ার আগে ভাবছিল নেড যে একটা জিনিষ আয়ার্ল্যাণ্ড তার জন্যে করেছে, আর সেজন্যে এ দেশের কাছে সে চিরকৃতজ্ঞ—আয়ার্ল্যাণ্ড একজন মহীয়সী মহিলা তাকে দিয়েছে; দূরে গেলে আকর্ষণ তো বাড়েই; তখন তো আরও বড় মনে হবে ঈলীনকে। নিশ্চয়ই হবে। সে পুরুষ ভাগ্যবান যে ঈলীনের মত নারীকে জীবন সঙ্গিনী করতে পায়।

খুব ভোরে চলে গেল সে। ঈলীনকে ইচ্ছে করেই আর জাগাল না। শেষ মুহূর্তের যন্ত্রণা থেকে অন্ততঃ রেহাই পাক।—সারাটা দিন সে ডাবলিনের পথে পথে ঘুরে বেড়াল। মনের মধ্যে বনহংসীদের মত মুক্ত তার স্বাদ। প্রান্তরেখায় পাহাড় এখন কুয়াশার মেঘে অদৃশ্য। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় খানিকটা স্পষ্ট করে তুলছে; আবার হারিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সে ভাবল—ভালই হয়েছে যে সব ছেড়ে সে চলে এসেছে। থাকলে কেবল মনের মধ্যে গ্লানির পাহাড়ই জমে উঠত। আর কোন কুয়াশার মেঘেই তা ঢাকা পড়ত না। —আবার খানিকটা কুয়াশা সরে গেছে। সবুজ পাহাড়ের অংশ দেখা যাচ্ছে। যা কিছু সে এদেশে করেছে, তার জন্য একটা লজ্জা এসে তাকে ঘিরে ধরল। পরক্ষণেই মনে মনে সে উৎফুল্ল বোধ করল যে একটা বিরাট নাড়া তো সে দিতে পেরেছে! সেটাই বা কম কি?

———

সমরসেট মম

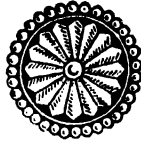
রেড

[ইংল্যাণ্ড]



ভাষান্তর ঃ

শেখর সেনগুপ্ত



যেহেতু তাঁর নাবিকসুলভ ট্রাউজার্সের পকেট দুটো জানুর ওপর, ক্যাপ্টেনকে পকেট থেকে বড় রূপালী ঘড়িটা বের করে আনতে খানিকটা কসরৎ করতে হলো। তিনি একবার ঐ ঘড়ির দিকে, আর একবার পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের দিকে চোখ মেললেন। হুইলের কাছে বসে থাকা কানাকা উপজাতির খালাসীটা এদিকে বারেকের জন্য তাকালেও, নিঃসাড়। ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি প্রশান্তি লাভ করেছে দ্রুত এগিয়ে আসা দ্বীপভূমিকে দেখে। তাঁর সুনিশ্চিত প্রত্যয়, জায়গাটা একটা জাহাজ ভিড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত ; জাহাজ যত অগ্রগামী হয়, তাঁর নোঙর পাতবার সম্ভাবনা ততই প্রবল হ'য়ে ওঠে। যদিও বিন্দু বিন্দু ছায়া শিথিলতা আনছে, দিনের পরমায়ু আরো ঘন্টাখানেক তো বটেই।

প্রবালদ্বীপের মধ্যস্থ সমুদ্রজল গভীর, যেখানে অনায়াসে একটা জাহাজ বিশ্রাম নিতে পারে।

প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের আছাড়ি-পিছাড়ি হেতু শাদা ফেনার দীর্ঘ রেখা।

গ্রামের প্রধান, যাকে নারিকেল গাছের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, এই জাহাজের একজন আদিবাসী নাবিকের বন্ধু। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমন আদিম এলাকায় রাত্রিযাপন রোমাঞ্চকর হতে পারে।

মোড়লের সঙ্গে পরিচিত সেই জাহাজী গুটি গুটি এগিয়ে এলো, ক্যাপ্টেন তার দিকে ঘুরে তাকান।

"বুঝলি, এক বোতল কড়া মদ সঙ্গে নিবি," ক্যাপ্টেন বললেন, "আর কিছু স্থানীয় মেয়েমানুষও যোগাড় করবি, যাদের নাচ দেখে আমাদের নেশাটা আরো জমে উঠবে।"

"কিন্তু ক্যাপ্টেন, এখানে যে জাহাজ ভেড়াবার মতন কোন খাঁজই

নজরে আসছে না।" জাহাজী বিমর্ষ গলায় বললো। এই লোকটা ও মানাকা উপজাতীয়, সুদর্শন, কৃষ্ণবর্ণ— অনেকটা যেন পতোন্মুখ রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটের মতন পেশীবহুল পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য, কিন্তু ওর মুখখানা নরম সুন্দর মসৃণ।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস,নোঙর পাতবার মতন জায়গা ওখানে ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে," ক্যাপ্টেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, "তুই যে কেন তেমন জায়গা খুঁজে পাচ্ছিস না, বুঝি না। এখানকার লোক ছিলি তোরা, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছিস ?·· হুঁ, যাক, একজনকে পাঠা ঐ মাস্তুলের উপর। সে দেখুক।" ক্যাপ্টেনের মর্জি মাফিক তার এক খালাসীকে নির্দেশ দেওয়া হলো। ক্যাপ্টেন দেখলেন, কালো চাবুক চেহারার লোকটা সরসরিয়ে মাস্তুল বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে একেবারে শীর্ষে, তারপর তার সন্ধানী দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'য়ে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই তার চিৎকার নীচে আছড়ে পড়ে, "ক্যাপ্টেন, তেমন জায়গা দেখছি না। খালি ফেনা আর ফেনা।"

ক্যাপ্টেন এদের স্থানীয় ভাষা স্যামোনে বেশ পারঙ্গম, ক্ষোভে ঐ ভাষাতেই চোস্ত খিস্তি ঝাড়লেন একখানা।

"আমি কি এখানে বসে থাকবো ?"— মাস্তুলকে আঁকড়ে ধরা নাবিক বিপন্ন গলায় জানতে চাইলো।

"তুই ওখানে বসে বসে কার পিণ্ডি চটকাবি ?" ক্যাপ্টেন আবার গালি গালাজ করলেন, "এক পয়সার মুরোদ নেই, জাহাজে কাজ করতে এসেছে ! আমি যদি ওখানে গিয়ে জায়গা খুঁজে পাই তো তোর মাথা কেটে নেবো। বুদ্ধু কাঁহাকার !" ক্যাপ্টেন জলন্ত দৃষ্টিতে পরিমাপ করলেন তেল-কুচকুচে মাস্তুল-দণ্ডটাকে। নারিকেল গাছে ওঠা-নামায় অভ্যস্ত নেটিভ নাবিকদের পক্ষেই সম্ভব এই মাস্তুল বেয়ে ওঠা। কিন্তু তিনি তাঁর চর্বিবহুল বপু নিয়ে এমন মাস্তুল-বিজয়ের স্বপ্নও দেখতে পারেন না।

"নেমে আয়, হতভাগা," অক্ষম আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন,

"তুই একটা মরা কুকুরেরও অধম।···জাহাজ ঐ প্রবাল-প্রাচীর ধরে ধরে নিয়ে চল। নোঙর পাতবার মতন জায়গা ঠিক নজরে আসবে।"

জাহাজটি একাধিক মাস্তুল সজ্জিত, দণ্ডগুলি কোন এক সময় স্ফটিকবৎ মসৃণ-ছিল নিশ্চয়। বাতাসের প্রতিবন্ধকতা না থাকলে গতি ঘণ্টায় চার থেকে পাঁচ নট। ধূলি-ধূসরিত চেহারা দেখলেই মালুম হয়, এ প্রায় বয়স-প্রাচীন, অনেককাল আগে সর্বাঙ্গে শাদা রং বোলানো হয়েছিল, এখন নিছকই বিবর্ণতা। জাহাজের পাটাতনে পা রাখলেই লবণ, মোম, পোড়া তেল এবং নারিকেলের ছোবরার গন্ধ।

প্রবাল প্রাচীরের এক শ' ফিটের মধ্যে পৌঁছানো মাত্র ক্যাপ্টেনের হুকুমে খালাসীরা হাসিল, বয়া ইত্যাদি নিয়ে নোঙর পাতবার জন্য তড়িঘড়ি ছুটে যায়। কিন্তু কোথায়, জাহাজকে বেঁধে রাখবার মতন উপাদান কৈ? আরো মাইল কয়েক পথ লম্বালম্বি অতিক্রম করবার পর তিতিবিরক্ত ক্যাপ্টেনের হুঁশ হলো, গতি মত্ততায় ইতিমধ্যেই তারা কখন যেন আদত অনুকূল স্থানটিকে হারিয়ে ফেলেছে। মাথায় রক্ত উঠবার যোগাড়। সমুদ্র তার তটরেখাতেও সময় সময় এমন বেইমানি করে বৈকি! ফলতঃ জাহাজের মুখ ঘোরানো হলো এবং এবারে গতি তুলনামূলকভাবে অনেক শ্লথ। রাশি রাশি ফেনা অনবরত ফুঁসে উঠছে, সূর্যও নেমে যাচ্ছে সমুদ্রের অতলান্তে, সমুদ্র এখন রক্তের মতন লাল, একটু পরেই শ্লেটের মতন কালো হ'য়ে উঠবে। সেই অবস্থায় জাহাজ ভেড়াবার চেষ্টা করে কোন মূর্খ নাবিক? সুতরাং ক্যাপ্টেন আর একদফা খিস্তি দিলেন অধস্তনদের—উপায় যখন নেই, আবার বারো ঘণ্টা প্রতীক্ষা, সূর্যের উদয়ে নতুন উদ্যমে সন্ধান করা যাবে।

"জাহাজ দূরে সরিয়ে নে," তাঁর স্বরে হতাশা প্রচ্ছন্ন, "এখন আর নোঙরা পাতা সম্ভব নয়।"

জাহাজ ডিঙ্গি মেরে পিছিয়ে এলো আরো কালো গহিন জলে, যেখানে কখনো কখনো ফসফরাসের চাকচিক্যময় নর্তন নাবিকদের কাছে অতি

পরিচিত এক ঘেয়ে দৃশ্য। ওরা পারতপক্ষে জলের দিকে চোখ মেলে না। এখানেই অপেক্ষা করতে হবে একটি রাত, একটি ব্যর্থ রাত। জাহাজ বেশ দুলছে দুর্বল মানুষের হৃৎস্পন্দনের মতন। জনা কয়েক খালাসী নিজেদের মধ্যে এশিয়া ভাষায় বলাবলি করছে, এ জাহাজটার পরমায়ু আর বেশি দিনের নয়। এর মালিক জর্মন-মার্কিন শংকর রক্তের হিসেবী জীব, জাহাজটাকে তাজা ক'রে তুলতে আর একটি পয়সাও খরচ করতে নারাজ।

জাহাজের বাবুর্চি জাতে চাইনিস, শাদা ট্রাউজার্সের দুর্দশা দেখলে বমি আসে, ভোঁতা নাক তুলে যান্ত্রিক স্বরে খবর দিয়ে গেল, খানা প্রস্তুত। এবং ক্যাপ্টেন যখন খাবার ঘরে ঢুকলেন, জাহাজের এঞ্জিনীয়ার সাহেব ততক্ষণে টেবিলের সামনে বসে পড়েছেন। এঞ্জিনীয়ার রোগা, লম্বা, অস্থিসার ঘাড়। পরনে নীল রঙের স্লিভলেস জার্সি —লিক পিকে হাত দুটো যেন শরীর থেকে পৃথক অবস্থায় ঝুলছে। "দূর শাল্লা, কি ভাবলাম, আর কি হলো। শেষ মেষ জাহাজেই রাত কাটাতে হচ্ছে।" ক্যাপ্টেনের মেজাজ এখনো তিরিক্ষি।

এঞ্জিনীয়ার এখনো নিরুত্তর। নিরুচ্চারেই তাঁরা তাঁদের ভোজন শেষ করলেন। কেবিনে একটা টিম টিমে তেলের বাতি জ্বলছে, আলো ও ছায়া পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ আবিষ্কারের মুহূর্তে। খাবারের প্লেট শূন্য হবার পর এক কাপ ক'রে চা এলো। কয়েক চুমুকে চা শেষ ক'রে ক্যাপ্টেন সিগার ধরালেন, লম্বা লম্বা পা ফেলে আপার ডেকে চলে এলেন!

প্রবালদ্বীপ এখন অন্ধকারের পিণ্ড। নক্ষত্ররা কৃষ্ণপক্ষের সুযোগে অসম্ভব উজ্জ্বল। যা কিছু সরবতা, সমুদ্রের উত্থান-পতনে। এটা রাত্রির অনুজ্ঞা, যার আরো অনেক পল্লবিত রূপ আছে। ক্যাপ্টেনের যেহেতু এখন কিছু করণীয় নেই, বিশেষত অবিভাবক সুলভ তর্জন-গর্জন, ডেক চেয়ারে শরীরটাকে ডুবিয়ে নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন। দুর্বোধ্য বিস্ময় অথবা রহস্য এই যে, প্রচুর অভিবাকত্ব ফলানো সত্ত্বেও

খালাসীরা ওকে দূরের মানুষ মনে করে না এবং এই জাহাজে কোনদিন বিদ্রোহ অভিষিক্ত হবে বলে মনে হয় না।

তিন/চার জন···তারপর আরো কয়েকজন জাহাজী ভূত ভূত চেহারা নিয়ে ক্যাপ্টেনের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, আপার ডেকের আর এক কোণে ওরা ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়ছে। জাহাজ যখন সমুদ্রের বুকেই বিশ্রাম নেয়, উৎসবের আকস্মিক সম্পাতে এরা সকলকে চমকে দিয়ে থাকে। একজনের হাতে ব্যাঙ্গো, অন্যজনের বগলে কনসার্টিন্যা। খালাসীদের গান শুরু হলো. সমবেতভাবে গলা মেলানো সৌহার্দ্যের সম্ভার, সঙ্গে সঙ্গে এই দুই তার-বাদ্যের বিচিত্র উদ্‌গার। তবে, হ্যাঁ, সুশ্রাব্য হোক না হোক, স্বর উদাত্ত। স্বর ও শাগির্দদের তাল—এই দুই একটা পর্যায়ে পৌঁছে যাবার পর খালাসীরা প্রকৃতই আদিবাসী হ'য়ে নাচ শুরু ক'রে দিলো। অন্ধকারে অর্ধোন্মাদিনী সমুদ্রের বুকে আদিম বন্য নৃত্য, অতি দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালন, জোয়ানদের চাঙ্গাড় চাঙ্গাড় পেশীগুলি নরম ময়দার মতন থর থর কাঁপছে, পা থেকে বুক অব্দি—সর্বত্র ঐ কম্পন।

এই নাচ স্নায়ুপীড়ক, উত্তেজক, এমনকি যৌনজ। এই নাচ পাশবিক, একরোখা, অ-জটিল, ব্যাকরণবহির্ভূত, অনেকের মতানুযায়ী নেহাৎ শিশুসুলভ। নাচতে-নাচতে-তারা প্রচুর ঘামছে···সামুদ্রিক লোনা উষ্ণতায় মুখগুলি কুঁকড়ে আছে···ক্রুদ্ধ সজারুর মতন রোয়া ফুলিয়েছে মাথার চুল···দু'জন একজন ক'রে একসময় সকলেই ছিটকে পড়লো পাটাতনে, মুখ হাঁ ক'রে দেখলো উলঙ্গ আকাশ···তারপর ঘুম, গভীর ঘুম।

অতিকায় মৃত অজগরের মতন চারদিকে নির্ঝঞ্ঝাট নীরবতা নামবার পর ক্যাপ্টেন তাঁর ভারী শরীরটাকে টেনে তুললেন। নীচে পৃথুলা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে প্রাত্যহিক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আপার ডেক থেকে এক রকম টলতে টলতে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর

নিজেরই পদশব্দ কিছুক্ষণ তাড়া ক'রে এলো তাঁকে। এই কেবিনটা তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন, নিয়মিত সাফসুতরো করা হয়। ক্যাপ্টেন এবার প্রকৃতই ক্লান্ত, বুদ্ধিবৃত্তিগুলিও যখন ঠিক ঠিক সজাগ নয়। একটা প্রাণান্তকর প্রয়াস ব্যর্থ হলো। আবার একটা সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা। ক্যাপ্টেন তাঁর শরীর থেকে পোশাকগুলিকে খুলে দূরে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে থাকেন। এ সময় তাঁর চাল-চলন-চেহারা সবই যেন বদলে যায়। শেষপর্যন্ত তাঁর বিশাল লালচে আর রূপালী শরীরে একটা জাঙ্গিয়া মাত্র অবলম্বন—কেবিনের দোলনা-বিছানায় সেই শরীরটা সারা রাত ধরে দোল খেতে থাকে।

পরদিন সকাল হতেই উল্লাস ও বিস্ময়। এরা দেখলো, নোঙর পাতবার যে অকুস্থান খুঁজে বের করতে গত সন্ধ্যায় তাদের অনেক মেহনত করতে হয়েছে, সে টি তো প্রায় নাকের ডগায়—ঐ তো সামান্য পূবে সরলেই জাহাজের আশ্রয়।

প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ে অর্ণবপোতটি আশ্রয় নিলো। সমুদ্রজল এখানে তিরি তিরি, কোন লহরী নেই। প্রবাল প্রাচীরের গা বেয়ে হরেক রঙের মাছ সাঁতার কাটছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সবুজ পাতা শাদা ফেনার সঙ্গে জমাট বেঁধে এগিয়ে যায়, পিছিয়ে আসে।

নোঙর ফেলবার পর ক্যাপ্টেন মৌজ ক'রে প্রাতরাশ সাড়লেন এবং ডেকের ওপর উঠে এসে পারিপার্শ্বিকতা পরিমাপ করলেন। সকালবেলার ধাতটাই আলাদা। সব তরতাজা। মেঘহীন আকাশে ঝকঝকে সূর্য, বাতাস রমণীয়, শীতল। জাহাজের ভেতর কথঞ্চিৎ গোজগাছ শুরু হয়েছে, চারদিকে ছত্রখান হ'য়ে ছড়িয়ে থাকা রকমারী কল-কব্জাগুলি তুলে তুলে জায়গামতন রাখা হচ্ছে। আজ রবিবার এবং সামনেই ক্যাপ্টেনের রবিবাসরীয় বনবাস পর্ব। শান্ত পরিবেশ। মনে হয় যেন রবিবার বলেই প্রকৃতিও বিশ্রাম নিচ্ছে। ক্যাপ্টেনের মনে আর কোন বিরক্তি বা, ব্যর্থতাবোধ নেই। তিনি ডেকে বসে বসে অদূরের বনসমৃদ্ধ

উপকূল, গাছপালা পাখি-পতঙ্গের সংসার দেখতে থাকেন। প্রশান্তি ও আলস্য তাঁকে সুখী করেছে। তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসির সূক্ষ্ম রেখা, সিগারের পোড়া টুকরোটা টোকা মেরে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। রকমারী পাখি আর বুনো ফুলের শোভা তাঁকে হাতছানি দিচ্ছে, তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন আবার।

"আমি এবার তীরে নামবো," তিনি চিৎকার করে বললেন, "জলে নৌকা নামা।"

ছোট্ট শাদা নৌকাটা ভাসিয়ে দেওয়া হলো, এক প্যাকেট তাস শাফ্‌লের মতন ফস্ ক'রে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো দড়ির সিঁড়ি। নৌকা দুলছে, সিঁড়ি কাঁপছে এবং ক্যাপ্টেন ঝুলতে ঝুলতে নৌকার ওপর নামলেন। নিজের হাতে দাঁড় বাইতে বাইতে সমুদ্র ছেড়ে একটি খালের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। বুনো গন্ধের হাওয়া তাঁর নাকের ভেতর দিয়ে মগজে পৌঁছে যায়। খালের দু'পাশে নারিকেল গাছ, দূর থেকে সারিবদ্ধ বলে মনে হলেও আদতে অবস্থান অতটা সুশৃঙ্খল নয়। রেসের মাঠে স্টার্ট নেবার আগে দৌড়বীরদের মতন দেহভঙ্গিমা এদের, বয়সের গাছ-পাথর নেই বলেই প্রতিটির গোড়ায় প্রচুর সবুজ ছ্যাতলা, নাইটজারের ডাক ঘুর ঘুর করে এগাছ থেকে সে গাছে। সকাল হলেও ঠিক ঠিক সকাল নয়, আলোর মধ্যেই সলজ্জ অন্ধকার। ক্যাপ্টেন তাঁর নৌকাকে বেঁধে খালের অন্তিম কিনারায় ভেজা নরম মাটিতে পা রাখলেন। মাটির স্পর্শ, মাটি— ঘোর লাগার মতন অবস্থা। অন্ধকার ফুঁড়ে কোন জীবের আবির্ভাবের মতন বনজ পটভূমিতে ভেসে উঠলেন ক্যাপ্টেন। শুরু হলো তাঁর সফরী পদযাত্রা, ভারী ভারী পা ফেলে শরমে জট পাকানো উদ্ভিদ মাড়িয়ে মাড়িয়ে…।

খানিকটা দূর যাবার পরই ক্যাপ্টেনের গতিরুদ্ধ হলো, যেহেতু সামনেই একটি গভীর খাঁড়ি এবং খাঁড়ির ওপরে বিচিত্র সেতু। সেতু মানে নারিকেল গাছের কয়েকটা সরু খণ্ড কোনক্রমে জোড় লাগিয়ে পাতা হয়েছে, যাদের পিচ্ছিলতায় ও অবলম্বনহীনতায় যদি কেউ

টালমাটাল হয়ে চকিতে ভীষণ জঙ্গলের অট্টহাসি শুনতে শুনতে খাঁড়ির মধ্যে তলিয়ে যায়, সেটাই হবে স্বাভাবিক। এই পুল পার হওয়া তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা নিজেদের শারীরিক ঋজুতা সম্পর্কে আস্থাবান।

'আমার পক্ষে এ হবে এক বিপ্লব।···এত ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে কি ?'—স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে ক্যাপ্টেন ভাবলেন।

কিন্তু ঠিক তখনই তাঁর নজর পড়লো, ওপারে গাছ-গাছালির ছায়ায় এক শ্বেতাঙ্গের আবাস। এই ঘন জঙ্গল ও খ্যাপা জানোয়ারদের রাজত্বে অমন একটি আবাস! ক্যাপ্টেন উৎসাহ পেলেন, কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে পুলের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। একখণ্ড···ঘোর বর্ণ মেঘ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।···এক দমক আঁতকা বাতাসে হুটোপুটি খেলো গাছপালা।···ক্যাপ্টেন কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিজেকে আরো বিচলিত করে তুললেন না। গা ছম ছম মুহূর্তগুলি পার করে দিতে তাঁর সমস্ত তন্ময়তা এখন কেন্দ্রীভূত। প্রতিটি জোড় পার হবার সময় নিজের পায়ের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন; যেখানটা উঁচু-নীচু, সেখানটা পেরিয়ে আসবার সময় একটু কেঁপে কেঁপেও উঠলেন। এইভাবে এই রহস্যময় ইঙ্গিতে ভরা সাঁকোটার শেষ খণ্ডে পৌঁছে যাবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এবং অবশেষে অপর প্রান্তে শক্ত জমি খুঁজে পেয়ে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালেন। তাঁর কপালে ঘাম, ঠোঁটের ওপর এখনো দাঁত চেপে আছে, ভয়ের ফলাগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সাঁকো পার হবার সময় তিনি নিজের সম্পর্কে এত বেশি তন্ময় ছিলেন যে. খেয়াল করতে পারেন নি, অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে কে একজন তাঁকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে এবং মাটিতে পা রাখবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মানুষের স্বরে বড় ধন্দ লাগে তাঁর, "এই ধরণের সাঁকো পার হতে গেলে বেশ সবল স্নায়ুর দরকার। আর আপনার তো অভ্যেসই নেই।"

ক্যাপ্টেন চমকে মুখ তোলেন, তাঁর সম্মোহন কাটতে কিছুটা সময় লাগে।

একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ—নিশ্চয় ঐ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"আপনার দ্বিধা আমি লক্ষ্য করেছি," লোকটার ঠোঁটে মৃদু হাসি আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

"আমার তো ভয় হচ্ছিলো, যে কোন সময় আপনি উল্টে যেতে পারেন ; বিশেষত, যখন হু হু করে বাতাস বইছিল।"

"সে রকম দৃশ্য আপনি কোনদিন দেখতে পাবেন না বলে আমি দুঃখিত।"

—আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ায় ক্যাপ্টেনের গলায় শ্লেষ ফুটে ওঠে।

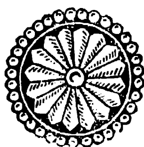
"স্যার, পতনটা কিন্তু অস্বাভাবিক ছিল না," সে দৃষ্টান্তে টানে, "এই কিছুদিন আগে আমি নিজে দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। মনে আছে, ভর সন্ধ্যায় শিকার করে ফিরছি। কাঁধে বন্দুক, হাতে গুলি বিদ্ধ পাখি। বেশ হাঁটছিলাম। হঠাৎ যে কি হলো! পা পিছলে একেবারে খাঁড়ির মধ্যে—আমি, আমার বন্দুক, মৃত পাখি—বিলকুল সব। তখন জল বেশি ছিল, তাই প্রাণটা যায়নি। একটি স্থানীয় ছেলে অনেকটা সাঁতরে আমার বন্দুকটা উদ্ধার করে দিয়েছে।"

লোকটার বয়স হয়েছে, অন্ততঃ তাকে আর যুবক বলা চলে না ; তদুপরি, দীর্ঘকাল নাগরিক পরিচর্যা পাচ্ছে না ব'লে সর্বাঙ্গে এক ধরণের রং-চটা ভাব, গায়ের চামড়ায় খড়ি উড়ছে, গালের কুচি কুচি দাড়ি ধূসর বর্ণ, মুখের গড়ন সরু লম্বাটে। তার গায়ে হাতবিহীন শরীর-আঁটা জামা, পরণে হাঁস-মুখ ট্রাউজার্স, পায়ে কিন্তু কোন জুতা বা, মোজার বালাই নেই—সব মিলিয়ে এই আরণ্যক পটভূমিতে সে বুঝি এক শিহরণ জাগানো চরিত্র, যে ইচ্ছানুযায়ী দৃশ্যান্তর ঘটাবার ক্ষমতা রাখে। ঈষৎ শ্বাসাঘাতের সঙ্গে সে ইংরেজিতেই কথা বলছিল।

"আপনিই তবে নেইলসন?"—ক্যাপ্টেনের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

"হাঁ, আমিই।"

'আমি আপনার কথা শুনেছি। ভেবেও রেখেছিলাম, কাছাকাছি কোথাও ঠিক আপনার দেখা পাবো।"



ক্যাপ্টেন ধীরোদাও বনবাসী আমন্ত্রণকর্তাকে অনুসরণ ক'রে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই সুন্দর ছোট্ট বাংলোটার মধ্যে প্রবেশ করলেন। ধাপাস্ ক'রে একটা চেয়ারে বসে পড়ে নিজের কররেখা দেখলেন। কাঠের পুরনো চেয়ার, ভারী শরীরের চাপে মচ্ মচিয়ে ওঠে। নির্বাসিত হলেও গৃহকর্তা নিয়মের তালে তালে পা মেলাতে জানে, অতিথিকে পুলকিত করবার মতন বিষয়-বস্তু মজুদ। নিগূঢ় সুপ্তিমগ্ন খানিকটা ফুল-বাগান, আধুনিকতার কাছাকাছি এই বাংলো, ভেতর বাড়িতে উত্তেজক পানীয়—আদিবাসীনীদের সরল সারঙ্গ দৃষ্টিও যে উঁকি-ঝুঁকি মারে না, কে বলবে? কর্তা নেইলসন যখন অতিথির জন্য হুইস্কি ও গেলাস আনতে ভেতর ঘরে গেল, ক্যাপ্টেনের সন্ধানী দৃষ্টি জরিপ করতে থাকে ঘরখানাকে। যত দেখেন, ততই তাঁর কূট চোখে বিস্ময়ের ছায়া নামে। কোন একটা ঘরে যে এত বইয়ের সমাহার সম্ভব, তাঁর ধারণার বাইরে। বই, বই আর বই। মেঝে থেকে আরম্ভ ক'রে সিলিং অব্দি—চার দেয়াল জুড়েই কেবল বইয়ের ঠাসবুনোট। এ যে রীতিমতন গ্রন্থাগার। একটি চমৎকার পিয়ানোও দৃষ্টি কাড়ে—গৃহস্বামী তবে সংগীত চর্চাও করে থাকে। কি গান গায়? ফেলে আসা সভ্যজীবনের গান না, আদি-বাসীদের চোখ বুজে সিঁটিয়ে যাওয়া কীর্তন? আর একটা টেবিলের

ওপর রাশিকৃত পত্র-পত্রিকা। লোকটা কি তবে তার আশ্চর্য সহনশীলতার মধ্যেও বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর রাখে?

সত্যি কী আশ্চর্য! নেইলসন আজ এক প্রবাদ পুরুষ, যদিও তার সম্পর্কে খুব কম কথাই লোক জানে। কেবল এটাই প্রচলিত যে বিদগ্ধ লোকটা বহু বৎসর ধরে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছে।

"আপনার দেখছি বইয়ের পাহাড়।"—নেইলসনকে ফিরে আসতে দেখে ক্যাপ্টেন বললেন।

"ওরা কিন্তু ক্ষতিকারক নয়"—মুচকি হাসির সঙ্গে নেইলসনের মন্তব্য।

"আপনি কি সমস্ত বই-ই পড়ে ফেলেছেন?"—ক্যাপ্টেনের জিজ্ঞাসা।

"অধিকাংশই।"—নেইলসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"পড়াশুনার সামান্য অভ্যেস আমারও ছিল। ইদানিং স্যাটারডে ইভিনিং পোস্ট কাগজখানাই অবলম্বন।"—ক্যাপ্টেনের দীর্ঘশ্বাস।

নেইলসন তার দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে গেলাস এগিয়ে দেয়, গেলাসে টলটলে হুইস্কি; হুইস্কিতে ঠোঁট ডুবিয়ে দেবার আগেই সিগার অফার করা হলো। নিখুঁত নাগরিক আপ্যায়ন, এ আদিম পট ভূমিতে অভাবনীয়।

'চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।'

ক্যাপ্টেন গলা দিয়ে শব্দ তুললেন, নেইলসনের মুখের দিকে চেয়ে কথা হাতড়ে বেড়ান। কুশল-বিনিময়ের আগেই নিজের সদ্যলব্ধ প্রায় অনুত্তেজক অভিজ্ঞতাকে মেলে ধরলেন, "আমি কিন্তু গত রাত্রিতেই এসেছি। না, ঠিক রাত নয়, পড়ন্ত বিকেল। কিন্তু তখন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও জাহাজ ভিড়িয়ে দেবার মতন জায়গা পেলাম না। ফলে, রাতটা সমুদ্রেই কাটাতে হলো।...আসলে, জানেন মশাই, আমি

এই পথ দিয়ে সাধারণতঃ জাহাজ নিয়ে যাই না। কেবল কিছু স্থানীয় খালাসীরা বললো গ্রে নামক এক চালানদার নাকি তাঁর প্রচুর জিনিস এই জাহাজে তুলে চালান দিতে চান! চেনেন নাকি সেই মিঃ গ্রে কে?"

"চিনি, এখান থেকে সামান্য দূরে তাঁর স্টোররুম।"

"ঠিক আছে, পরিবহনের মতন জায়গা আমার জাহাজে এখনো আছে।"

নেইলসন আবার গেলাসে হুইস্কি ঢাললো, আবার সিগার। সুন্দর মদ এবং লম্বা সিগার। তবু একটা অস্বস্তি গুন গুন করছে ক্যাপ্টেনের চারপাশে। সাধারণতঃ তিনি মৌনস্বভাব। কিন্তু নেইলসনের ভেতর এমন কিছু একটা আছে, যা তাঁকে এক ধরণের অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। লোকটা বনবাসী হয়েও বুনো নয়; পোশাকে চাকচিক্য না থাকলেও মানসিক স্থৈর্যে ও গাম্ভীর্যে ক্রমশই বিশালতর হ'য়ে উঠছে।... নিজের অস্বস্তি কাটিয়ে তুলতেই ক্যাপ্টেন কেবল কথার জাল বুনে চলেছেন।

সুইডীস গৃহস্বামীর চোখ দুটো কালো, কালো চোখে গভীরতা খেলে ভালো, ঠোঁটে কৌতুকের অতি সূক্ষ্মরেখা—বক্তার সবকিছুই বুঝি তার নাগালের মধ্যে।

ক্যাপ্টেন: বেশ চমৎকার ছিমছাম ছোট্ট বাংলোটি আপনার।

নেইলসন: আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি এটিকে রমনীয় ক'রে রাখবার।

ক্যাপ্টেন: গাছগুলির আরো যত্ন নেবেন। সুচারুভাবে পাতা-গুলি ছাঁটতে পারলে ওদের রূপ আরো খুলবে। আমিও এককালে বাগান-টাগান করতে খুব ভালোবাসতুম। এখন ওসব শিকেয় তুলে কেবল জল আর জল।

ক্যাপ্টেনের চোখ আবার চারদিকে ঘুরতে থাকে। ঘরখানা খুব ছোট নয়। কিন্তু এ যে একটা লাইব্রেরী! কোন বিচ্ছিন্ন মানুষের

ব্যক্তিগত সংগ্রহ শালায় এতগুলি বইয়ের অবস্থান যেন ভাবাই যায় না। বই, বই আর বই—এই বইগুলি ভীষণ জীবন্ত। কোন গ্রন্থাগারে ঢুকলে কিন্তু ঠিক এমন একটা অনুভূতি আসবে না। ক্যাপ্টেনের মনে হলো, প্রতিটি বই তাঁর দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। ক্যাপ্টেনও মনে মনে ফুঁসে ওঠেন। তাঁর বুকের ভেতর পুষে রাখা হিম্মৎবাদ থাবা তোলে। তাঁর স্বর অনেকটা আক্রমনাত্মক হ'য়ে ওঠে, "এই বই, এমন সুন্দর বাংলো সবই কিন্তু ব্যর্থ মনে হয়, যখন ভাবি, আপনি এক ভয়ঙ্কর নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন।"

নেইলসনের দৃষ্টি সামান্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে, "না আমি আমার প্রাত্যহিক জীবনকে ভয়ঙ্কর নির্বাসন বলে মনে করি না। আমি এই নির্জনতার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত হ'য়ে আছি। এক-আধ বছর তো নয় স্যর, সুদীর্ঘ পাঁচিশ বছর!'

ক্যাপ্টেনের মুখে রা নেই।

নাক দিয়ে নিসৃত কুল কুল ধোঁয়া জালিপথ খোঁজে। নেইলসনকে দেখলে মনে হয়, সে কখনোই কোন নীরবতাকে ভাঙতে রাজি নয়। দাঁতে দাঁত চেপে অদম্য সাহসে পায়ের তলায় ঝোপঝাড় ভাঙতে ভাঙতে যারা বিপদসঙ্কুল প্রকৃতির সঙ্গে একদা একাত্ম হ'য়ে ওঠে, অনিবার্যভাবেই তারা নিজেদের বাহাদুরীকে কথায়-কথায় ফাঁপিয়ে তুলতে চায় না। বরং নেইলসনের গভীর কালো দৃষ্টি আরো প্রসারিত হ'য়ে ছড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেনের ওপর। শারীরিক গঠন থেকেই একটি মানুষের মানসিক গঠনের অনেকখানি হদিশ পাওয়া যায়। আপাতঃ ভাবে এটাই প্রতিষ্ঠিত, ক্যাপ্টেন মদ খান প্রচুর। দৈর্ঘ্য ছ'ফিট তো হবেনই, পরতে পরতে চর্বি জমায় তিনি একটি নরম সরম দৈত্য। লাল মুখে অসংখ্য কাটাকুটি জ্যাবড়া দাগ, ইতি উতি হারিয়ে যাওয়া ও ফুলে-ওঠা শিরা উপশিরা, যেগুলি প্রমাণ করে, লোকটি এক সময় প্রচুর সংগ্রাম ক'রে আজ থিতিয়ে পড়েছেন। তাঁর বুড়োটে চুলগুলির অবস্থান এবং কপালের গড়ন দেখেই ধরে নেওয়া যায়, তিনি বুদ্ধিমান

এবং এখনো রণে ক্ষান্ত দেবার মানুষ নন। চেয়ারে ক্রমশই শরীরটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন, হাতলের ওপর পড়ে থাকা দুটো হাত যেন জলে-ডোবা মরা মানুষের, দুটো ছড়ানো পা ভাল্লুকের মতন থপ থপে এবং বিশাল উদর যেন তিমি মাছের পিঠ। নেইলসন অবাক হ'য়ে ভাবছে, এই লোকটি কি সত্যি সত্যি একদা বালক ছিল এবং পরস্পরবিরোধী ভাবাবেগে মাটি দাপিয়ে ছোটাছুটি করতো? দৃশ্যটা আজ কল্পনা করাও কষ্টকর। সাট্ সাট্ সাট্ চোরাবালির উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটি বালক একদিন বিপুলবপু সমুদ্র-মানুষ বনে গেল।

আর একটা গেলাস ফর্সা, ক্যাপ্টেন একটা পিঁপে সাবাড় করবার মতন তাগদ নিয়ে এসেছেন। নেইলসন এবার গোটা বোতলটাই ওঁর দিকে ঠেলে দেয়, "নিজে ভরে নিন।"

ক্যাপ্টেন সাদরে বোতলটাকে ওপরে ওঠালেন. পেটর ওপর রাখলেন, বুক অব্দি তুললেন, গালে ঘষলেন, যথেষ্ট পুরাতন স্বাদ মদ্য —ঢক-ঢক-ঢক···আবার এক পেয়ালা টইটম্বুর। তাল মিলিয়ে নতুন সিগার। ধোঁয়ার রিং শূন্যে ভাসিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, "আপনি এখানে এলেন কিভাবে?" নেইলসন বললো, "আমি এসেছিলাম স্বাস্থ্যের কারণে। ডাক্তাররা রায় দিয়েছিলেন, আমার ফুসফুসের অবস্থা নাকি খুবই শোচনীয়, পরমায়ু বড় জোর বছর খানেক। সেই ফরমান নিয়ে এখানে ঢুকি এবং দেখতেই পাচ্ছেন, তাঁদের বিধানকে নস্যাৎ ক'রে অদ্যাবধি আমি কেমন বহালতবিয়ত্।"

"কিন্তু দুনিয়ায় কত চমৎকার জায়গা থাকতে আপনি ঠিক এই জায়গাটাকেই বেছে নিলেন কেন?"

"কারণ, আমি একজন ভাবপ্রবণ ব্যক্তি।"

ক্যাপ্টেন ঠোঁট উল্টে শব্দ তুললেন, "ও।"

নেইলসন কিন্তু টের পায়, ক্যাপ্টেন তার কথার মর্মার্থ গ্রহণে ব্যর্থ।

ঐ মোটা চেহারা এবং এক পেট এ্যালকহল সূক্ষ্ম চিন্তার নিশ্চিন্ত প্রতিবন্ধক।

তবু সে বললো, "আপনি যদি একবার চারদিকটা ভালো ক'রে দেখতেন, তা হলে বুঝতেন, জায়গাটা সত্যি কী সুন্দর!"

ক্যাপ্টেন ভারিক্কী গলায় বললেন, "তা আপনার বাড়িটা প্রকৃতই রমণীয়।"

"ওহ্, আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন এই বাংলোটার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এখানে ছিল আদিবাসীদের ছোট্ট একটি কুঁড়ে, যার চালে মৌচাক আর খুঁটিগুলিতে নানা রকম পোকা-মাকড়। কুঁড়েটা ছিল মস্ত একটা গাছের তলায়, যে গাছে ফুটে থাকতো অজস্র লাল ফুল। ছোট ছোট বাহারি ঝোপগুলিতে বসন্ত চিরায়ত, হলুদ-লাল-স্বর্ণাভ পাতাগুলি বাতাসের হিল্লোলে হিল্লোলিত। সর্বোপরি, এই নারিকেল গাছগুলি—দেখুন, কেমন লাস্যময়ী মেয়েদের মতন কোমর বাঁকিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি জলজ আয়নায় নিজেদের রূপ দেখছে! আমি আমার দুর্বল শরীর নিয়ে এ-গাছ থেকে সে-গাছ ছোটাছুটি করলাম। প্রায় রাতগুলিই হয়ে ওঠে মেঘলা। সমুদ্রের জল কালো। কোন এক লাল আলো-বজরা থেকে গান ভেসে আসে।···তখন তো আমি যুবক, সেই পঁচিশ বছর আগে, যখন নিজেই পঁচিশ বছরের তরুণ—সহসা এমন অনন্য স্বর্গের মুখোমুখি। সীমিত জীবন ফুরিয়ে যাবার আগে আমি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে চাইছিলাম এই স্বর্গীয় সুধা। কচি ঘাস, বুনো ফুল, নারিকেলের সবুজ পাতা, মৌমাছির গুণ গুণ রব, ভেসে আসে মাতাল করা গন্ধ। উষ্ণ মাটির বুক অব্দি ভেসে আসতো ভরত পাখির গান। আমার মনে হলো, এর চেয়ে সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আর নেই।

প্রথম দর্শনেই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরটা হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো—হায়! আমার পরমায়ু যে ফুরিয়ে এসেছে। যার পরমায়ু আর বারোটা মাসও নয়, সে এই পার্থিব

স্বর্গে মাথা ঠুকবেই! মাত্র পঁচিশ বছরের যুবক, শ্বাসকষ্ট, দুই হাত তুলে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ কোথেকে প্রত্যয় জন্মালো, এখানকার প্রতিটি সৌন্দর্য-আধার আমাকে মানসিক শক্তি দেবে অপ্রতিরোধ্য দৈবকে স্বীকার ক'রে নিতে। মৃত্যু—সে তো আসবেই! কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবো, এই অকৃপণ প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকে উপভোগ করে যাবো পর্যাপ্ত নির্জনতায় স্বয়ং সম্রাটের মতন। কিছুদিনের মধ্যেই আমি ওখানে চলা ফেরা করতে করতে নিজের গভীরে অদ্ভুত এক শক্তি অনুভব দেরি। সেই শক্তির মহিমা, আজ, এতদিন পরে, আপনাকে আমি ঠিক মৌখিক ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আসলে আমি তখন খুব দ্রুত আমার পিছনের দিনগুলিকে ভুলে যাচ্ছি। বলতে পারেন, সেটা আমার নবজন্ম, একটা নতুন মনেসিকতার উন্মেষ। স্টকহলমের নাগরিক স্মৃতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যস্ত দিনগুলি, বননগরীর বেপরোয়া জীবন-যাত্রা—প্রতিটি ছবি অস্পষ্ট, ঐগুলি যেন আমার গতজন্মে ঘটেছিল। কিন্তু বুকের কোনে থেকে থেকে সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটা থাবা বসায়—তোমার দিন কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে, বৎস্য! বাঘা বাঘা ডাক্তারদের অমোঘ রায়, পরমায়ুর দৌড় মাত্র একটি বৎসর!

সত্যি, কি আমি এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবো? মানুষের শরীরবৃত্তের ওপর মনের কি কোন প্রচণ্ড প্রভাব থাকে না? না, আমি মরবো না, যেহেতু আমি এই স্বর্গে আরো বহুকাল রাজত্ব ক'রে যেতে চাই।

আসলে, স্যর, পঁচিশ বছর বয়সের যুবকরা বড় বোকা ও ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে। তবে ঐ বয়সটায় অমন আবেগ থাকে বলেই আমরা পঞ্চাশ বছর বয়সে থিতিয়ে থিতিয়ে অতীতের মূল্যায়ন করতে পারি।...যাক, বন্ধু, আপনি পান করুন। আমার ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসকে তেমন গুরুত্ব দেবেন না।"

—শীর্ণ হাত বাড়িয়ে নেইলসন আবার বোতলটা এগিয়ে দিলো।

"আপনি কিন্তু প্রায় কিছুই খেলেন না।"

—সযত্নে স্বয়ং হুইস্কি ঢালতে ঢালতে অনিবার্য সৌজন্যে ক্যাপ্টেন বললেন। "মাল টানার ব্যাপারে আমার একটা পরিমিতিবোধ আছে."
মৃদু হাসি ও কণ্ঠমাধুর্যের সঙ্গে সুইডীস বললো, "আমার প্রাণময়তা বলুন, নেশা বলুন, সব অন্যত্র। অবশ্য এটা আমার শূন্যগর্ভ তাৎক্ষণিক অহঙ্কারও হতে পারে। তবে, হাঁ, আমার নেশারবস্তুতে মৌতাত দীর্ঘস্থায়ী এবং শরীরেরও ক্ষতির সম্ভাবনা কম।"

"শুনেছি, এখান থেকে অঢেল কোকেন বাইরে পাচার করা হয়।"—ঢিলেঢালা মেজাজে কথা খুঁজতে গিয়ে ফস্ ক'রে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন।

নেইলসন ঠোঁট চাপা হাসি হাসলো, "শাদা চামড়ার মানুষ এখানে খুব বিরল। কোকেনের কারবার ফাঁদবেটা কে? এখানে এই কম ক্ষতিকারক হুইস্কি ছাড়া প্রত্যক্ষ নেশার আর কোন বস্তু আমার জানা নেই।" নেইলসন এবার নিজের গেলাসেও খানিকটা ঢাললো, কিছুটা সোডা মেশালো, আলতো ভাবে চুমুক দিলো।

"এখন আমি বুঝতে পারি, এই স্থানটিতে এমন অপার্থিব সৌন্দর্য কেন! একটি পরিব্রাজক পাখি যখন সুদূরের উদ্দেশ্যে উড়তে উড়তে সমুদ্রে একটি ভাসমান জাহাজের ফলকায় বিশ্রামের সুযোগ পায়, তখন তার মনে তো অপার শান্তি ও স্বস্তিবোধ আসবেই!···আমি কি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি, ক্যাপ্টেন?," আপন আকুলতায় সে সলজ্জ হাসি হাসলো, "হয়তো আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না।"

ক্যাপ্টেন নিরুত্তর।

সে আবার বললো, "জায়গাটা সুন্দর বোধ হয়েছিল এই জন্যে যে, আমিও একে সুন্দরভাবে ভালোবাসতে পেরেছিলাম।"

একটু থেমে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "আমার কাব্যানুভূতি প্রবল ও তৃপ্ত হয়েছে যৌবনের প্রেম এবং প্রকৃতির মনোরম অবস্থানে।"

ক্যাপ্টেনের চেয়ে অনেক কম রসিক ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও

নেইলসনের এই জ্বলজ্বলে উক্তিতে ঈষৎ আলোড়িত হতো। কিন্তু ক্যাপ্টেন, নিজের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন, নেইলসনের উক্তিতে বিচলিতবোধ করলেন না। মদের গেলাস হাতে তিনি যেন এক ভাবপ্রবণ ব্যক্তির উদ্ভট প্রলাপ নির্বিকারে শুনে যাচ্ছেন মাত্র। বনবাসী লোকটা তো সূচনাতেই কবুল করেছে, সে ভাবপ্রবণব্যক্তি এবং কঠিনস্বভাব ক্যাপ্টেন ভাবালুতার প্রতি বরাবরই নিষ্ঠুর।

নেইলসন অনেকক্ষণ ধরে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তার মুখে দ্রুত ভাবান্তর। বুক উঠছে-নামছে, কি যেন স্মরণ করবার ব্যর্থ প্রয়াসে তার কষ্ট। স্মৃতি অতীত থেকে নির্যাস গ্রহণ করেলও উৎসকে ধরতে পারছে না। একটু হতবুদ্ধি, এক পলক গভীর ছায়া নিয়ে সে বললো, "ক্যাপ্টেন, আপনি কি আমার পূর্ব পরিচিত? আমার স্মরণশক্তি দুর্বল।...তবু, তবু মনে হচ্ছে, কোথায় যেন এর আগে আপনাকে আমি দেখেছি।"

"আমার কিন্তু মনে হয় না, আপনাকে এর আগে কখনো দেখেছি বলে।"

—ক্যাপ্টেন নেইলসনের দ্বিধার সারাৎসার তথা পূর্বপরিচিতির সম্ভাবনাকে এক রকম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন।

তবু নেইলসন তার সন্দেহকে জিইয়ে রাখে, "শান্তি, নিরাপত্তা, প্রেম ও জীবিকার সন্ধানে মানুষ অনন্তকাল ধরে চলেছে এবং চলার পথে কত জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, হঠাৎ-হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন ভবিষ্যতে তা আবার মনে পড়ে যায়। ঠিক সেই ভাবেই আপনার মুখখানা আমার যেন কেমন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কবে, কোথায়, কখন যেন আপনার সঙ্গে আমার একবার মুলাকাৎ হয়েছিল।"

ক্যাপ্টেন তাঁর বিশাল কাঁধ ঝাঁকালেন।

সামান্য দু'চার চুমুকেই নেইলসনের মনে এমন প্রহেলিকা!

নেইলসন বলছে, "প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে আমি লোকাচারের অতীত এই অরণ্যময় দ্বীপভূমিতে প্রবেশ করি। এই সময়ের আগে বা,

ঠিক পরে যদি কোন দেওয়ানার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেও থাকে, এই মুহূর্তে তাকে যথার্থভাবে স্মরণ করা সহজসাধ্য নয়।…আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, পৃথিবীতে এমন এক-একটা আদিম জায়গা আছে, যেখানে পা দিলেই কিন্তু আপনার ঘোর লাগবে এবং মনে হবে, স্থানটি যেন আপনার পূর্বপরিচিত। কোন সুখকর বা নৃশংস ঘটনা যেন স্মৃতির পর্দায় নিজেদের প্রতিচ্ছবি ফেলতে চাইছে। কেবল স্থান নয়, কোন কোন মানুষের মুখ দেখলেও মন এমন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। যেমন, আপনাকে দেখে এই মুহূর্তে আমার যা মনে হচ্ছে।"

ক্যাপ্টেন ঠোঁট ওল্টালেন।

কেবল বুক ভরা নিঃসীম একাকিত্বই নয়, লোকটা মাত্রাতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণও বটে! নেইসনের মুখে বিচিত্র রহস্যময় হাসি ফুটে উঠছে। স্বেচ্ছামতন নিজের জীবন গড়তে চাইলেও, মানুষ তা পারে না। দৈবের স্বৈরাচার এই ক্যাপ্টেনের মতন এক একজনকে হঠাৎ মুখোমুখি এনে বসিয়ে দেবে এবং প্রায়ান্ধকার অন্দরমহল থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি যুগ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে।

বাতাস বইছে মন্দ মন্দ।

চমৎকার হুইস্কি।

ক্যাপ্টেনের চক্ষু দুটি নিমীল।

নেইলসনের দুর্বোধ্য সংলাপ আরো জীবন্ত হ'য়ে ওঠে, "হয়তো সুদূর অতীতে আপনার সঙ্গে আমি ছিলাম। আপনি ছিলেন প্রভু, আমি ছিলাম আপনার বেওকুফ বেহুদা দাসানুদাস। ধরুন, সেই রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে আপনি ছিলেন একটি পালতোলা জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং আমি সেই জাহাজেরই দাঁড়-হাতে এক পরিশ্রমী ক্রীতদাস। অথবা, আপনি কোন ডাকসাইটে ধনী ভারতীয় তাঞ্জামে এসে বসলেন, আর আমি আরো কয়েকজনের সঙ্গে কাঁধ পেতে সেই তাঞ্জাম বয়ে বেড়াচ্ছি। কিংবা, বিচারাসনে বসে আপনি আমাকে সাব্যস্ত করলেন বেওয়ারিশ উন্মাদ এবং নির্বাসন দণ্ড দিয়ে পাঠালেন এমন একটি

পাণ্ডব বর্জিত সমুদ্র-এলাকায় বা, কোন ধু-ধু মরু প্রদেশে। এমনও তো হতে পারে। আচ্ছা, ক্যাপ্টেন, ত্রিশ বৎসর আগে আপনি কি এই পথ দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাতায়াত করতেন না?"

ক্যাপ্টেন সায় দিলেন, "কখনো কখনো।"

"তাহলে সেই সময় রেড নামক কোন লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল?"

অসম্ভব এক বিস্ময়বোধে বিমূঢ় সমুদ্র-মানুষ কেবল উচ্চারণ করলেন. "রেড?"

"হাঁ, এই রেড নামেই আমি তাঁকে জানতুম। দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাবার মতন সেই মানুষ—রেড! আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। কোন মশালধারী আদিবাসীর মতন আমি তাঁর মুখের দিকে কখনো সবিস্ময়ে তাকাবার সুযোগ পাইনি। তবু অনেকের চেয়েই তিনি যেন ছিলেন আমার খুব পরিচিত; এমনকি, আমার ভাইয়েরা, যাদের সঙ্গে জীবনের অনেকগুলি দিন কাটিয়েছি, রেডের মতন ঘনিষ্ঠ ছিল না। তিনি জীবিত আমার কল্পরাজ্যে, যুগ-যুগান্ত ধরে মনে জীবন্ত হ'য়ে আছে মেলোটেস্টা অথবা, রোমিও। মাপ করবেন, দান্তে ও শেকসপীয়র কি আপনার পড়া আছে?"

"না, তেমন গভীরভাবে কিছু নয়।"—ক্যাপ্টেন বললেন।

ক্ষণিক নীরবতা। নেইলসন সিগার ধরিয়েছে। চেয়ারে পিছনে মাথাটা হেলানো। জানালা দিয়ে দেখা যায়, বনভূমির রাজ রাজেন্দ্রানীর ভঙ্গিমা। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে-দেওয়া ধোঁয়ার রিংগুলির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নেইলসন। মুখে তার তখনো সূক্ষ্ম হাসি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি ক্রমশ দারুণ জীবন্ত হয়েও অস্বাভাবিক। আবার সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো। আবার কৌতূহলী বিচিত্র অনুভূতি। আগন্তুক নিছক চর্বির পাহাড়ে আত্মগোপন করে আছেন! সরিয়ে দাও এই তাল তাল মাংস, সেই আদত পুরুষটি আত্মপ্রকাশ করবেন…।

নেইলসন কোমল কণ্ঠে বললো, "তাহলে ধরে নিচ্ছি, রেডকে

আপনি দেখেন নি এবং সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এমন অনেক মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলেছি যারা রেডকে চিনতো। এই নিয়ম ও অরাজকতার পৃথিবীতে রেড একমেবাদ্বিতীয়ম্, যাঁকে অনুভব করার মধ্যেও আছে অনবদ্য অভিজ্ঞতা। তিনি শ্বেতাঙ্গ—প্রথম দর্শনেই আকর্ষণ করবার মতন রূপ ছিল তাঁর। তাঁর চুলের রং ছিল আগুনের লেলিহান শিখার মতন টকটকে লাল এবং সেই জন্যই তিনি রেড নামে পরিচিত ছিলেন। আয়ত দুই চোখে কখনো চঞ্চলতা, কখনো হিমশীতলতা। সমুদ্রকে বে-ইজ্জত করবার জন্যই দোলায়মান ঢেউ-এ তিনি একটি নৌকা নিয়ে প্রায়ই জলবিহারে যেতেন এবং নীল সাগরের বুকে তাঁর সেই অনায়াস বিচরণ ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলির অন্যতম। বিপজ্জনক ভাবে কখনো কখনো সুদূরে লীন হ'য়ে যেতেন, আবার প্রকৃতিকে আশ্বস্ত করবার উদ্দেশ্যে পুনরায় ভেসে উঠতেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ, দৈর্ঘ্যে ছ'ফুটের চেয়েও ইঞ্চি দুয়েক বড়। আমার এই আবাসের পূর্বতন রূপ আদিম কুটিরে তিনি বাস করতেন এবং এর বুকে ছুরির দাগ দিয়ে তিনি অনেক স্মৃতি চিহ্নও রেখে গিয়েছিলেন। গেরুয়া মাটি ও পাতার রস দিয়ে তিনি কিছু ঝাপসা ছবিও এঁকেছিলেন, তন্ময়তার সঙ্গে অনুবাধন করলে দেখা যেত, ঐ সব ছবিতে উড়ন্ত রাজহংসী, ফসফরাসের আলোকমালায় সজ্জিতকালো সমুদ্র, ছুটন্ত আদিবাসিনী —নূপুরের নিক্কন শোনা যায়, হাঁ. শোনা যায় বৈকি! এমন সৃষ্টি, যা কোন রইস ব্যক্তির বৈঠকখানায় দৃষ্ট হবে না অথচ নিশিভোর প্রতীক্ষা করবে আচমকা আবিষ্কৃত হবার রোমাঞ্চে।...

"...গোলমরিচ রঙ পুরনো ঝাঁকড়া গাছের তলায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—দৃশ্যটা কল্পনা করুন। ঈশ্বর নেশার ঝোঁকে কখন যেন তাঁকে তৈরি ক'রে ফেলেছেন ঠিক গ্রীক দেবতারই আদলে, নচেৎ মানুষ কখনো অমন নিখুঁত সুন্দর হতে পারে না। বৃষস্কন্ধ, এতটুকু বাড়তি নেই, তিনি যথার্থই এপেলো; মুখে ধবল জ্যোৎস্নায় মাখামাখি মসৃণ

কমনীয়তা, যা প্রকৃতই নারীসুলভ রহস্যময়। দুধের মতন ধব ধবে ত্বকে অদ্ভুত চাকচিক্য—এও নারী সুলভ।"

ক্যাপ্টেনের রক্তাভ চোখ এই সময় হঠাৎ ঝিলিক খায়, নিজের সম্পর্কে তিনি মুখিয়ে ওঠেন, "আরে বাচ্চা বয়সে আমরা যা ত্বক ও রং ছিল! সকলে তো বলতো, ছেলেটা অবিকল একটি সুন্দরী মেয়ের মতন।"

নেইলসন কিন্তু ক্যাপ্টেনের হক কথায় কর্ণপাত করলো না। ক্যাপ্টেন তার গল্পের সমঝদার হোন, বা নাই, হোন, গল্পের চুম্বক থেকে সে আর নিজেকে এই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনতে পারবে না; বরং ক্যাপ্টেনের এমন উটকো কথায় তার কপালে বিরক্তির ত্রিশূল ফুটে ওঠে। সে বলতে থাকে, "যেমন শারীরিক গঠন, তেমনি মুখাবয়ব। ঐশ্বরিক প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর চোখ ছিল আয়ত এবং কালো। কোন রক্তাভ চুল মানুষের ভ্রূজোড়া অমন কুচকুচে হতে পারে, তা ভাবা যায় না। এই নিখুঁত দৈহিক অবয়ব নিয়ে তিনি যখন এখানে এলেন, তখন তিনি যৌবনের সিংহদ্বারে—বয়স মাত্র বিশ।"

এই অব্দি বলে সুইডীস থামলো বুঝি কোন নাটকীয় মোড় নেবার পূর্বক্ষণে। গোঁজ হ'য়ে বসে থাকা ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু দৃষ্টি হারিয়ে গেছে ভিন্ন জগতে। এক চুমুক হুইস্কিও নেমে গেল তার গলা বেয়ে। ক্যাপ্টেনের ভাবভঙ্গী এখন পুরো নেশাড়ুর। হাঁ ক'রে শ্বাস ছাড়লেন, পুরনো চেয়ারে ভড়কে দেবার মতন শব্দও একটা উঠলো।

নেইলসন বলছে, "…কোন শহরের শত শত মানুষের জমায়েতেও তাঁকে সনাক্ত করা কঠিন নয়। কোন গলিঘুঁজির মধ্য দিয়েও যদি তিনি হেঁটে যান, সকলে সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দেবে। তিনি অতুলনীয়। অমন রূপবান সর্বকালে বিরল। তিনি যেন বনের মধ্যে ফুটে থাকা একটি অদ্ভুত সুন্দর ফুল। প্রকৃতির আশ্চর্য সৃষ্টি।

"একদিন সকালে আপনার মতন তিনিও নৌকা ভাসিয়ে এই

দ্বীপের মধ্যে ঢুকেছিলেন। বিচিত্র আরণ্যক নকশা চেখে পরিতৃপ্তির হাসি হেসে ছিলেন।

শোনা যায়, তিনি নাকি একজন অ্যামেরিকান নাবিক, কোন এক দ্বীপে জাহাজ থেকে নেমে ঘুরতে ঘুরতে বহুদূর চলে গিয়েছিলেন ; ফিরে এসে দেখেন, তাঁকে ত্যাগ করেই জাহাজ দূর সমুদ্রে ভাসমান। কোন সংকেত পাঠালেন না। আপন আনন্দে দৃশ্যটা উপভোগ করলেন মাত্র। তারপর স্থানীয় আদিবাসীদের হৃদয় জয় ক'রে তাদের সহায়তায় নাও ভাসালেন এবং দুলতে দুলতে এসে উপস্থিত হলেন এখানে।

জাহাজ তাঁকে ত্যাগ করেছিল, না, তিনিই জাহাজটিকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এটা আমার কাছে একটা ধাঁধাঁ। আমার কিন্তু মনে হয়, তিনিই জাহাজটিকে নীরবে বিদায় দিয়েছিলেন। নাবিকদের এক ঘেয়ে দিনাতিপাত, ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে ধুরন্ধর মানুষদের অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, জঘন্য সমুদ্র আইন, বন্দরে বন্দরে বেশ্যা নিয়ে হুল্লোড়··· ইত্যাকার জলজ্যান্ত নিরেট বাস্তব তাঁকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল। সামনে ছড়ানো-ছিটানো সুন্দর আদিম অলৌকিক দ্বীপগুলি তাকে হাতছানি দিচ্ছিলো। ঐ সব চাক বাঁধা সবুজ পাহাড়, সাঁই সাঁই বাতাস, ঘিরে-থাকা আদিগন্ত নীল সমুদ্র—প্রকৃতিই তাঁকে ঈশ্বর হবার জন্য প্ররোচিত করেছিল।

যাই হোক, তিনি আত্মগোপন করলেন এবং জাহাজটা দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যাবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কোথায় থাকবেন, জেব থেকে ক'টা ডলার বের করতে পারবেন—এই সব প্রশ্ন তখন তাঁর কাছে গৌন।

এটাই আমার অনুমান।

এবং এটাই সত্যি।

"··তিনি সাদা-কালো-সবুজ-নীল পটভূমিতে পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ঐ বিপজ্জনক সাঁকোটাকে দেখে যেন খুব মজা পেলেন। আরো এগিয়ে যেতে হলে, আরো সৌন্দর্যের খনিতে প্রবেশ করতে হলে,

সাঁকোটা পার হ'তেই হবে। অকুতোভয়ে অনায়াস ভঙ্গীমায় তিনি ওটা হাঁটি হাঁটি পা পা অতিক্রম করতে থাকেন। নজর, ঠিক আপনারই মতন, পায়ের দিকেই ছিল ; তবে এ কথা বলতে পারি, পর্যাপ্ত শারীরিক সক্ষমতা হেতু আপনার মতন তাঁর কপাল ঘেমে ওঠেনি, বরং খাঁড়ির ঘোলাটে জলের দিকে তাকিয়ে গভীর চাপা প্রগাঢ় স্বরে তিনি গুন গুন গান গাইছিলেন।

কিন্তু এপারে আসবার পরই তাঁর বিস্ময় অনিবার্য হ'য়ে ওঠে।

প্রথমত, তিনি অদূরে একটি ছোট্ট ছিমছাম নেটিভদের কুটির দেখতে পেলেন।

দ্বিতীয়ত, সেই কুটির থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি যুবতী।

আদিবাসিনী, অনার্য যুবতী, কিন্তু ঐ আরণ্যক রাজ্যে অপরূপা। আগন্তুকের আগুনের আঁচে ঝলসে না গিয়ে শাদা দাঁত মেলে স্মিত হাসলো।

মেয়েটি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো।

স্থানীয় লোকদের ভাষা রেড প্রায় জানতেন না বললেই চলে ; মাত্র দুটো শব্দের অর্থ তাঁর জানা ছিল। আর ঐ মেয়েটিও ইংরেজি যা জানে, তাতে মনের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

তবু ভাষা তাঁদের ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হলো না।

যুবতীর মৃদু হাসিতে বিদ্ধ হলেন রেড। তিনি গ্রহণ করলেন ওর নীরব আমন্ত্রণ। যুবতীকে অনুসরণ করতে থাকেন।··মৌমাছিরা কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ছে। পাখিরা সুরেলা গলায় ডাকছে। তখন নির্ঘাৎ মধুমাস।

রেড মাথা নীচু ক'রে কুটিরে গিয়ে ঢুকলেন, যুবতীর ইশারায় মাদুরের ওপর বসলেন। ছিমছাম ঘর, এতটুকু নোংরা নেই কোথাও। যুবতী একটি পাত্রে আনারস কেটে খেতে দিলো তাঁকে। রেড পরম বিস্ময়ে আবার চেয়ে থাকেন যুবতীর মুখপানে এবং যুবতীও তাঁর দিকে স্থির নয়না।

অন্থ“রেড সম্পর্কে এ যাবৎ আমি যা বলেছি, তাঁর অত্যাশ্চর্য কার্যকলাপ ও মানসিকতা সম্পর্কে যে বর্ণনা আমি পেশ করেছি, তা সবই তিল তিল সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে। আমার বর্ণনায় অন্তঃসার শূন্যতা খুঁজতে যাবেন না, যেহেতু রেড সম্পর্কে প্রত্যেকেই ঠিক এই কথাগুলিই বলে গেছেন। সবচেয়ে নিগূঢ় বিস্ময় ও আনন্দের ব্যাপার হলো কি জানেন, পরবর্তীকালে সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার মুলাকাৎ হয়েছিল। রেডের সঙ্গে তার প্রথম চাক্ষুষ পরিচিতির ঠিক তিন বৎসর পর আমি তাকে দেখেছিলাম। তখন তার বয়স কত? বড় জোর উনিশ বৎসর। চমকিত হলাম, ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলাম। সৌন্দর্যের বিচারে এই মেয়েটিও যে কত অপরূপা, কল্পনা করতে পারবেন না। অফুরন্ত আবেদন তার যৌবন হিল্লোলিত দেহে, গায়ের রং ঝক ঝকে তামাটে; ছক কেটে কেটে ঈশ্বর তার প্রতিটি অংশ নিখুঁত ভাবে নির্মাণ করেছেন। বেশ লম্বা, ছিপ ছিপে, আদিবাসী সুলভ ঋজুতা, পাম গাছের নীচে স্থিরবদ্ধ জলাশয়ের মতন তার দুটি চোখ। ঢেউ খেলানো ঘোরকৃষ্ণ কেশদাম পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে, চুলে বাঁধা আছে সঙ্গতিপূর্ণ একগুচ্ছ বুনো ফুল। নগ্ন বাহু দুটি যেন পিচ্ছিল সর্পশরীর, দুটি স্তন পাগল ডমরু, নিতম্ব শূণ্যে-ফুলে-ওঠা সমুদ্র। কথায় কথায় সে যখন হেসে ওঠে, যে কোন অন্যমনস্ক পুরুষের বুকেও ঝড়ের ডাক। অমন মাধুর্যময় হাসি আমি আর কোন নারীর দেখিনি। ঐ হাসি দেখলে এ বয়সেও মশাই আপনার হাঁটু কেঁপে উঠবে। আমার কাছে শব্দের অত পুঁজি নেই যে নিখুঁত চিত্রটি তুলে ধরবো। কেবল বলতে পারি, ঐ মেয়েকে দেখলে পুরুষমাত্রেরই একধরণের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। আপনার মনে হবে, আহ্, এ কেন আমার হলো না! আপনার শরীরের উত্তাপ বাড়বে এবং নিজেকে নিশ্চিত বঞ্চিত মনে হবে।

এমন প্রতিক্রিয়া রেডের ভিতরেও হয়েছিল। বিস্ময়ের বিহ্বলতাকে তিনিও যে প্রথম দর্শনেই অতিক্রম করতে পারেননি, এটা আমার

স্থির সিদ্ধান্ত। এবং ঐ বিস্ময়, যার অপর নাম পূর্বরাগ, একত ছিল না।

"সেই দুটি প্রাণী, ষোল বছরের কুমারী এবং কুড়ি বছরের রোমান্টিক যুবক দর্শন মাত্রই পরস্পরের প্রেমে স্তম্ভিত। প্রকৃত প্রেম, যার উৎপত্তি কোন সহানুভূতি, সাধারণ স্বার্থ বা, বুদ্ধিগ্রাহ্য আদান-প্রদান থেকে নয়। এ হলো নিখাঁদ, সরল, অকলঙ্ক প্রেম—দীর্ঘ দূর অতীতে যাদের সাক্ষাৎ আমরা পেতাম। পৃথিবী যত যান্ত্রিক ও জটিল হয়েছে, এ প্রেমের রেশ ততই বিরল হয়ে পড়েছে।

ঘুম থেকে উঠে লেবু ও আপেলবনের মঞ্জরীমাখা ঈভের ভেজা চোখ দেখে আদম যেমন প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমবিদ্ধ হয়েছিলেন, এদের বেলাতেও সেই একই অনুভূতি অনুরণন তুলেছিল। এই সেই প্রাকৃতিক প্রেম, যার তাগিদে জন্তুদের মধ্যেও নারীরা ছুটে যায় পুরুষের কাছে; এই সেই অনুভূতি যা দেবতাকে উন্মাদ অবস্থায় টেনে নিয়ে যায় দেবীর কাছে, এই সেই শিহরণ, যা পুরুষকে প্রলুব্ধ ক'রে নিজেকে নিঙড়ে দিয়ে নারীর বীজ বপন করতে; এই সেই কৃতজ্ঞতাবোধ, যা নারীকে উৎসাহিত ক'রে নতুন প্রাণের জন্ম দিতে।

আপনি হয়তো সেই বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণধি ফরাসী ডিউকের নাম জানেন না, যিনি বলেছিলেন, যখন একজোড়া নর-নারী শারীরিক ও মানসিক উন্মাদনায় যূথবদ্ধ, তখন তাদের একজন প্রচণ্ড রকম ভালোবাসতে চায় এবং অপরজন সেই ভালোবাসাকে আদায় করে নেয় মাত্র; অর্থাৎ দু'জনের মানসিক স্তর একই পর্যায়ে থাকে না।

অপ্রিয় হলেও, এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

কিন্তু কখনো ক্বচিৎ এর ব্যতিক্রমও দেখা যায় বৈকি, যেখানে প্রেমের ভাণ্ডার দু'জনই সমভাবে উজাড় করে দিচ্ছে। রেড এবং তাঁর প্রেমিকা সেই দৃষ্টান্তেরই সামিল।

"তারপর বহু বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে, যখন আমি তাদের বয়স, রূপ ও প্রেমের কথা চিন্তা করি, ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রবল যন্ত্রণা

অনুভব করি। এটা কেমন যন্ত্রণা জানেন? পূর্ণিমার রাত্রিতে জোয়ারে স্ফীত সমুদ্রের বুকে সহস্র চন্দ্রের অসহ্য রূপ দেখলে মনে যে কষ্ট অনুভূত হয়, সেই বস্তু। যা প্রকৃত সুন্দর, সেটাই তো মানুষের মনে বেদনাবোধ জাগ্রত করে।

"তারা তখন নেহাৎই নাবালক। মেয়েটি হাসিখুশি, সরল, মিষ্টি ও দয়ালু। একটি পাখির বাচ্চা বা, একটি ছোট্ট চারাগাছের জন্যও তার গভীর মমত্ব।

রেড সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারনা না থাকলেও অনুমান করতে পারি, সুমসাম নীরবতার মধ্যে লালিত তাঁর দয়া, সহানুভূতি ও মুগ্ধতাবোধ। আমি মনে করি, তাঁর শরীরের মতন হৃদয়ও ছিল স্বর্গীয়।···

যাই হোক, রেড যখন এই দ্বীপে এলেন, তার কিছুকাল আগে এখানে একটা মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে গেছে। শ্বেতাঙ্গ জাহাজীরা মাঝে মধ্যেই এই দ্বীপে এসে ক্ষণিক বিশ্রাম নেয় এবং স্থানীয় অধিবাসীরাও তাদের যত্নের ত্রুটি রাখে না। কিন্তু পরিবর্তে আদিবাসীরা যা পেলো, তা এক কুৎসিৎ কালব্যাধি। নাবিকের দূষিত শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়লো বনজ মানুষদের অভ্যন্তরে। অভিনব রোগ, যার কোন প্রাকৃতিক চিকিৎসা এদের জানা নেই। হু হু বেগে মড়ক এসে গ্রাস করলো গোটা দ্বীপটাকে। টপা টপ মরতে লাগলো অসহায় মানুষগুলি। রোগাক্রান্তকে সমুদ্রের ধারে ফেলে রেখে যে পালালো, সেও রেহাই পেলো না। ঘরে ফিরতে না ফিরতেই সর্বশরীর জুড়ে যন্ত্রণা ও কম্পন, অসম্ভব তাপ, কালো কালো দাগ শরীর ময় এবং পরিণামে মৃত্যুর অনিবার্য থাবা। দ্বীপের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীই শেষ হয়ে গেল!

মেয়েটির পরিবারও রেহাই পেলো না। ওর ভয়কুণ্ঠিত দৃষ্টির সামনে আপনজন প্রায় সকলেই মারা গেল। ফলে দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়র আস্তানায় সে অনাথা, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পারিবারিক মঙ্গলরূপকে আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে। বাড়িতে থাকে

মাত্র তিনটে প্রাণী—সে নিজে, একজন বয়স্ক পুরুষ এবং একটি বালক। যতক্ষণ সে ঘরে থাকে, প্রাণের হিল্লোল ; যখন সে ঘরে থাকে না, ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার।

বৈচিত্র্যময় আরণ্যক দৃশ্যাবলীর মধ্যেই নড়বড়ে কুটির, যেখানে রেড আশ্রয় নিয়েছিলেন, যার খুঁটি ও দেওয়ালে রেড আপন মনে কিছু ছবিও এঁকে ছিলেন!

"...রেড কিন্তু ওখানে বেশিদিন ছিলেন না, স্থানত্যাগের শশব্যস্ততা তাঁর চাপা থাকবার নয়। ঐ ক'দিনেই চুপি চুপি প্রেম-পরিচয় তুঙ্গে। মেয়েটি রেডকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দিচ্ছিলো না, আর রেডও অবাক হয়ে দেখছিলেন, নারীর উঠতি যৌবনের অপূর্ব লালিত্য।

কিন্তু রেড তার ঠিক ঐ আশ্বাসে অবস্থান করতে রাজি ছিলেন না। এর কারণ, আমার মনে হয়, দুটো। প্রথমত, জায়গাটা সামুদ্রিক তটভূমির কাছাকাছি—কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়ালেই ঝিকিমিকি সমুদ্র দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে নোঙর-পাতা জাহাজের নাবিকরা অনায়াসে এই অব্দি হেঁটে আসে এবং শ্বেতাঙ্গ যুবক রেডকে যদি তারা একবার দেখে ফেলে, কেলেঙ্কারি হতে আর বাকি থাকবে না! একজন শ্বেতাঙ্গ তরুণকে এই আদিম রাজ্যে ফেলে রেখে যেতে তারা চাইবে না, প্রাণের কোন রকম গোপন ভাবনাকে পাত্তা না দিয়ে তারা একরকম কয়েদ করবে রেডকে। পলাতক জাহাজীদের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা নেহাৎ বিরল নয়। দ্বিতীয়তঃ, রেড তখন আরো নিরালা আবাসের সন্ধানে ছিলেন! কাছে থেকে বা, দূরে দাঁড়িয়ে যুবতীর প্রেমপূর্ণ হাসি ও দৃষ্টি তাঁকে অত্যন্ত ব্যাকুল ক'রে তুলছিল। তিনি ওর সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হতে চাইছিলেন। যুবতীর তরফ থেকেও উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু এই দু'ঘরের কুঠুরিতে সেই সুযোগ কোথায়? গৃহকর্তা বয়স্ক, নেশাড়ু, কি এক পাতায় বিড়ি বানিয়ে বেশির ভাগ সময়ই ঘরের মধ্যে অজগর হ'য়ে আছে। ছেলেটা পরিশ্রমী, কিন্তু সতর্ক—এক জোড়া

নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখতে পেলে অযাচিত হাঙ্গামাও টেনে আনতে পারে।

তাই একদিন রেড পালালেন। যথারীতি একা নন, সঙ্গে সেই হরিণী—চঞ্চলা। যা কিছু তোড়জোড়, সবটুকুই মানসিক; নচেৎ, ক'টা কথাই বা তাঁরা পরস্পরের প্রতি উচ্চারণ করেছিলেন?

তখন সবে সূর্যোদয়, তট-ছোঁওয়া রক্তাভ জাহাজের মতন ধীরে ধীরে সূর্য বিস্তারিত; তাঁরা দু'জনে হাত জড়াজড়ি ক'রে দূরে—দ্বীপের আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করছেন। এখনো তাঁদের যা কিছু জল্পনা-কল্পনা, মনে মনে। কেবল যুবতী অশান্ত পুলকে অনুভব করছিল, রেডের মুষ্ঠি-বন্ধন অসম্ভব তীব্র ও উষ্ণ।

ঐ বন্ধন কোনদিন শিথিল হবে না, কোনদিন নয়।

"সম্মুখে অস্ফুট আলোকে তাঁদের অগ্রগতি তখনো কারুর দৃষ্টিগোচর হয়নি। স্থানীয় যুবতীদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকদের বাড়াবাড়ি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, অনেক দুঃখ ও হাহাশ্বাসে দ্বীপের গাছগাছালি কুহেলিকাচ্ছন্ন আজো। তবু এদের কোন প্রতিবাদ নেই। যুবতীরা লুণ্ঠিত হয়, অজানা রোগের আমদানিতে এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সাবাড় হয়ে যায়। এরা প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে না।···

তাঁরা দু'জনে বুঝি চলেছেন আলিবাবার দস্যুগুহায়। রেডের কাঁধে ঝুলছে একটা কাপড়ের ব্যাগ—দু'জনের ব্যবহারযোগ্য কথঞ্চিৎ টুকিটাকি। পোষাকী বিলাসিতা যুবতীটি জানে না; যেটুকু না হলেই নয়, ঠিক ততটুকু। রেডও কখনো ভবিষ্যতের জন্য বোঝা বাড়িয়ে রাখেনি।

দু'পাশে সারবদ্ধ নারিকেলগাছের মধ্য দিয়ে ঘাসের জমিতে পা ফেলে ফেলে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন। চলতে চলতে তাঁরা আর একটা সাঁকোর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যার অবস্থিতি আরো বিপজ্জনক, অমোঘ ও মর্মস্পর্শী। মাত্র বিঘৎখানেক চওড়া, কিন্তু দৈর্ঘ্যে অনেকখানি,

দেহভারে দুলে উঠবে, নীচে ঝোঁপ ও নোংরা জলে হরেক পোকা-মাকড় দীপ্যমান। এটা পার হতে হবে, ভাবলেও সুস্থির থাকা দায়; রেডের স্ফূর্তিময় ব্যক্তিত্বে শঙ্কার ছায়া ঘনায়। তাঁর দাপট ও অব্যর্থতা চোট খেয়েছে।

হঠাৎ যুবতী খিল খিল করে হেসে ওঠে এই প্রথম রেডকে আতঙ্কিত হতে দেখে। সে রেডের হাত ধরে স্বকীয় বিন্যাসদক্ষতায় সাঁকোর প্রথম গিটটা পার হয়। কিন্তু তখনই হৃদয়াবেগের চেয়ে আতঙ্ক বড় হ'য়ে দাঁড়ালো রেডের। তিনি নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছু হটে এলেন। তিনি জাহাজী জীবনের অনেক হুজ্জত দেখেছেন, আদিবাসীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নারিকেল গাছে উঠেছেন, পলকা নাও সমুদ্রে ভাসিয়েছেন, এখানে এসেও একটি বিপজ্জনক সেতু অনায়াসে পার হয়েছেন,···কিন্তু এর সঙ্গে যেন কোন বিপদেরই তুলনা হয় না। মনোদুঃখে ঠোঁট কামড়ালেন রেড। তবে একেবারে হার মানতে রাজি নন; দেহটা যথাসম্ভব ভারমুক্ত করে নিলেন তিনি, তাঁর কাঁধ থেকে কাপড়ের ব্যাগটা খুলে রাখলেন, কোটটা নামিয়ে রাখলেন মাটিতে, মায় ট্রাউজার্স খুলে ফেলতে ফেলতে বিড় বিড় করে বললেন, "আমি আনাড়ী নই, যা ভাবছো তা না। হু···"

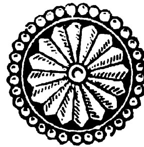
তাঁর টক টকে শরীরে সামান্য লজ্জানিবারক আবরনী মাত্র। যেন প্রকৃতই গ্রীক দেবতা এপেলো প্রায় নগ্ন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন, নাশায় ঈষৎ ক্ষোভের কম্পন, ইচ্ছে হলেই সব লণ্ডভণ্ড করে দেবেন আর কি!

যুবতী রেডের ঐ জ্বলন্ত রূপের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার মুখে বিস্ময় ও কাতরতা। সে কোন ধান্দাবাজি বোঝে না, শরীর শির শিরিয়ে ওঠায় মনের ভেতরও এক উষ্ণ বাসনা মন্থন করতে থাকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রেডের বুকে রেশম-লোমে দুটো আঙুল রাখে, যেন আপনসুখে বিলি কাটে। প্রাচীন রোমক কলোসিয়ামে পশু-বিজয়ী রেড আপন পুরস্কারলাভের প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে পেয়ে গেলেন

স্বয়ং রাণীকে, বুকের সঙ্গে পিষতে পিষতে দুটো ঠোঁটকেই জিভের তলায় টেনে নিলেন। সেই প্রথম, কিন্তু একটা ধুম ধড়াক্কা ভূমিকম্পের চেয়েও শক্তিশালী।

মেয়েটা জানে, রেডও জানেন, তাঁদের যৌথ প্রত্যাশা এখনই পূর্ণ হবে না। কিন্তু এই উন্মাদনার হাত থেকে ততক্ষণ রেহাই নেই। যুবতী বাহু মুক্ত হয়ে প্রেমপূর্ণ হাসি হাসলো। রেডের ব্যাগ ট্রাউজার্স, কোট টুপি, জুতো—সমস্ত কিছুই মাথার উপর তুলে নিলো এবং অবলীলায় তর তরিয়ে পার হয়ে গেলো সাঁকোটা। ওপারে গিয়ে ঐসব নামিয়ে রেখে আবার সে এপারে ফিরে এলো এবং হাত ধরে ধীরে ধীরে পার করলো ভীরু রেডকে।

এরপর রেড অনেকবার ঐ সাঁকো পার হয়েছেন; কিন্তু কোন বারই তাঁকে এমন ভীরুতা ও আচ্ছন্নতা এসে গ্রাস করেনি।



ওপারে গিয়েই তাঁরা পেলেন দৈবের আশীর্বাদ—একটি পরিত্যক্ত কুটির, আপন নিঃসঙ্গতায় মহান, বৃক্ষতলায় থাকায় টুপ টুপিয়ে শিশির ঝরছে মাথায়। পারিপার্শ্বিকতা আরো নিভৃত, অসংখ্য গাছ-গাছালি একান্নবর্তী পরিবার, যাদের মধ্য দিয়ে বহু কাঁচা সর্পিল পথ। বনস্পতির মাথায় সুনীল সমুদ্র পার হ'য়ে আসা যাযাবর পাখিদের অস্থায়ী নিবাস। অনেক দূরে একটা ঝরণাও আছে, যার জলে কখনো রূপো, কখনো বা রক্ত গুলে দেওয়া হয়। আর কত রকম যে ফুল আপন আহ্লাদে রাজত্বের পরিধি বাড়িয়ে চলেছে, ইয়ত্তা নেই। হুতিতি রডড্রেনডো, গ্রিমূলা, বিচিত্র সব অর্কিড নিয়ে এই নয়নাভিরাম হিরন্ময় অঞ্চল। এই বিজন পথে হেঁটে গেলে খুব পরিশ্রমী মানুষও ভাবুক হয়ে উঠবে; রাগীর রাগ থাকবে না; মৃত্যু পথের যাত্রীর মুখেও স্মিত হাসি। আপনি যদি

এখানে অসতর্ক মুহূর্তে কোন আদিবাসিনীকে দেখে ফেলেন, নিজের নাগরিক প্রিয়াকে ভুলেও যেতে পারেন।

বন-সুষমায় সুমসাম এমন একটি আবাস তাঁদের সামনে।

সম্ভবত কোন ব্যবসায়ী তাঁর অস্থায়ী অবস্থানকালে এটি নির্মান করেছিলেন। অথবা, এখানে ছিল কোন নেটিভ পরিবার, যারা সাম্প্রতিক মড়কের শিকার হয়েছে। সে যাই হোক, এই আবাসের ওপর রেড ও তাঁর সঙ্গিনীর কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলবার মতন কেউ তখন সে তল্লাটে ছিল না। সক্রিয় জীব বলতে সেই মুহূর্তে মধু চুষে চুষে মাতাল মৌটুসীরা, একটি বৃদ্ধ প্রাচীন সামুদ্রিক পাখির আচমকা কর্কশ ডাক।

সহর্ষ উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন রেডঃ এই দুনিয়াটা আমাদের, আমাদের আমাদের-ই...।

কাঠ-ব্যবসায়ীদের রেখে-যাওয়া ঝুলন্ত ম্যানিলা রোপ ধরে তাঁর টক টকে নগ্ন শরীর বাতাস কেটে সাঁ সাঁ দোল খেতে থাকে।

আর মেয়েটি এখন যথার্থ ই হরিণী। সে চারদিকে ঘুরছে ফিরছে নিজেদের সংসারটাকে সাজিয়ে তুলতে। কাক-ডাকেনি ভোরে ঘর থেকে বেপাত্তা হয়েছিল, এখন মাথার উপর খর সূর্যের তাপকে অগ্রাহ্য ক'রে সংসার পাতবার নেশায় বাবুই পাখির মতন গৃহ-শিল্পী হ'য়ে উঠেছে। শুকনো ডাল পুতে খুঁটি বানিয়ে তার ওপর কাঠ ফেলে বেঞ্চি করলো দু'খানা। একপাশে গর্ত খুঁড়ে উনান, পাতা কেটে হাতপাখা, ঘাস বিছিয়ে মাদুর—সর্বত্র পরিপূর্ণতা। এবং তারপরই রেডকে জাপটে ধরে শুয়ে পড়লো। রেড ওর লজ্জা ও গোপনীয়তাকে নির্মম হাতে চূর্ণ করলেন। তারপর পারস্পরিক আস্বাদনে অসহ্য সুখ আর সুখ। জড়ানো গলায় তাঁরা তখন কত কথাই যে বললেন, আলাদাভাবে শুনলে যাদের হয়তো কোন অর্থ ই হয় না।

রেড অনুভব করলেন, এ বন্ধন বড় গভীর! আদিবাসিনী তাঁর প্রাণাধিক। রেডের কাছে ছিল ভাঙ্গা দূরবীনের গোটা কয়েক কাঁচ-খণ্ড,

মেয়েটির চোখে লাগিয়ে তিনি ওর ভেতর বিস্ময় ও বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা জাগ্রত করলেন। দিন গড়ায় রাত ঘনায়, সূর্য ওঠে, বনের অভ্যন্তরে তাদের ব্যস্ত যাত্রা, বনের মধ্যেই বিশ্রাম, স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টিতে পুলক উপচে পড়ে এক সাহেবের সঙ্গে এক নেটিভ কন্যাকে ঘর বাঁধতে দেখে এবং সেটা কিনা এখানেই, যেখানে পূবের লালচে রোদ ঐ সাহেবের টক টকে লাল চুলেরই মতন নারকেল গাছের ডগায় ঝিকি-মিকি ঝিকিমিকি। নেটিভ মেয়ে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে জ্বালানি কাঠ আনে, শস্য সংগ্রহ করে। প্রেম ও সহানুভূতিতে রেডের মন আপ্লুত। ওর মতন পোক্ত গৃহিনী তমাম মার্কিন মুলুক চষে ফেললেও পেতাম না। তদুপরি ও যেন মুহূর্তে মুহূর্তে আরো সুন্দরী হচ্ছে। ক্ষিপ্র বাদামী শরীরে অবর্ণনীয় স্বপ্নময় যৌবন নামছে, প্রায় সব সময়ই ছোটাছুটি করছে, এমন ছন্দোময় অহঙ্কারী নিতম্বের উত্থান-পতন কেবল এর পক্ষেই সম্ভব। একবার একটা মজা পুকুরের কাদা জলে ওকে জাপটে ধরে ভীষণ কাণ্ড করে ফেলেছিলেন রেড। ও কিন্তু রাগ করে নি, কেবল সর্বাঙ্গে কাদা-মাথা অবস্থায় ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়েছিল রেডের লোভী ও উল্লসীত মুখের দিকে। নিসর্গের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন বলেই তাঁদের তখন কিছু হারাবার ভয় নেই। কেবলই প্রাপ্তি এবং এত অঢেল পাচ্ছেন যে কোথায় রাখবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। আশ্চর্য, তবু এই দ্বীপে দুর্ভিক্ষের সময় ঘনায়, মড়ক লাগে, চারদিকে হাহাকার শুরু হয়—এখানেই! এখন এখানে গ্রীক দেবতা সমুদ্রদ্বীপের বনদেবীকে নিয়ে ভিটের অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে প্রকাণ্ড সুখের সন্ধান পেয়েছেন; সুতরাং, এখানে দুর্ভিক্ষের সময় ঘনাবে না, মড়ক লাগবে না, চারদিকে থেকে হাহাকার উঠবে না।...

সতত্‌ই কল্পনাবিলাসী রেড অজস্র গাথা তাঁর শ্রীমতীকে নিয়ে মনে মনে তৈরি করেন, আবার মুছে ফেলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর, তাঁর যে কোন একটা অতীত ছিল, যেখানে এক একটা জটিলতা যে যার বরাদ্দ তুলে নিত, আজ আর মনে পড়ে না। অতীত কি নেহাৎই শ্লেটের রেখা?

ঘষে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়? কোথায় গেল সেই খানাপিনা? রাতে কেবিনে ঢুকে একটা গোটা বোতল গলায় ঢালছেন লাল চুল ডাকাবুকো তরতাজা সমুদ্র-মানুষ!···মনের পারদ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে নামছে। নীরব গহন আরণ্যক রাজ্যে রেড এক অসামান্যাকে নিয়ে উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

···উত্তেজনা ও উল্লাসের পর শিথিলতা এবং তখন মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে প্রেম ও সোহাগের বাণী-বিনিময়।

"লোকেরা বলে থাকে, সুখী মানুষদের কোন ইতিহাস নেই; তেমনি নিছক সুখনির্ভর প্রেমেরও কোন ইতিবৃত্ত নেই। প্রতিটি দিন অভিমানহীন মোলায়েম, প্রতিটি রাত অতিমাত্রায় রেশমী। বস্তুতঃ, সারাটা দিন রেড ও তাঁর সঙ্গিনী যে ঠিক কি করবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। তবু তাঁদের মনে হয়, বৃহদাকার দিনগুলি বড় হ্রস্ব ও ক্ষণায়ু।

"যুবতীর একটি নেটিভ নাম নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেটা না-পছন্দ হওয়ায় রেড ওর নাম রাখলেন স্যালী। জিভের ডগায় নামটা ছুঁড়ে দেওয়া মাত্র মেয়েটি অত্যুৎসাহে তাঁর বাহুবন্ধনে। গম্ভীর ভারিক্কি থাকবার চেষ্টা করেও রেড ব্যর্থ হন, তাঁদের যৌথ হাসি রাতের বুক চিরে বহুদূর প্রায়শই বিস্তারিত।···আগে না জানলেও এখন বেশ অনায়াসেই স্থানীয়দের সঠিক ভাষাটি চটপট শিখে নিচ্ছেন রেড। মাদুরের ওপর শুয়ে শুয়ে সঙ্গিনীর অজস্র কথকতা তিনি শোনেন এবং বহুশব্দ মনে গেঁথে রাখেন। রেড আগে নীরবতাই পছন্দ করতেন, সম্ভবতঃ মনের দিক থেকেও তিনি ছিলেন ঈষৎ মন্থরস্বভাবের। অবুস্থবুসময়ে তাঁর বিলাসিতা ও আসক্তি ধূমপানে, ধোঁয়ার রিংগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের মতন ঘুরতে থাকে।

প্রিয়র এই আসক্তি মেটাতে স্যালীর খুব তৎপরতা; সে বেচারি দূর দূর জায়গায় ঘুরে কাঁচা তামাক নিয়ে আসে; সেই তামাক হাতে ডলে, আঙুল এবং নোখের টানে বড় বড় চুটা বানিয়ে রেডকে উপহার দেয়। চুটাতে টান দিতে দিতে রেড ভাবেন, মন্দ নয়, তবে ঠিক সেই

স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না। স্যালী রেডের উন্মীল দু'টি তারা দেখে খুশি হয়। খুব নেশা হয়েছে বটে চুটাতে।

চুটা টানতে টানতে রেড মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁর স্যালী শন দিয়ে কেমন চমৎকার মাদুর বুনে চলেছে। মেয়েটা একমুহূর্ত স্থির থাকতে পারে না। কিছু না কিছু একটা করছেই—নির্বাক স্বরে রেড ওর তৎপরতাকে তারিফ করেন।

প্রায় সন্ধ্যাতেই স্থানীয় প্রবীণ আদিবাসীরা আসে তাঁদের ঘর-সংসার দেখতে। বিচিত্র নির্বিকার মানুষগুলি, সারা মুখময় এত বলিরেখা সত্ত্বেও কোন গভীর সংশয় তো নেই। তারা রেডকে শোনায় এই দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস।

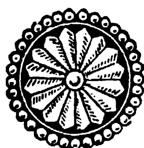
এই বাদুড়-ঝোলা অন্ধকারের দেশটা চিরদিন এমন শান্ত ছিল না। এখানেও যুদ্ধ, কাটাকাটি ইত্যাদি হতো। এক উপজাতি অন্য উপজাতির কুঁড়ে ঘরগুলিতে আগুন লাগাতে আসতো। তারপর সময়ের বিবর্তনে ক্রমশই তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, মানুষগুলিরও রক্তে আর সেই তেজ ও উন্মাদনা নেই।···

রেড কিন্তু সব সময়ই থিতিয়ে বসে নেই। সময় সময় কাজ করবার মানসিকতা তাঁর ভিতর আগ্রাসী হয়ে ওঠে। তিনি তখন মাছ ধরতে বেরিয়ে যান খালে-বিলে, ঝড় ও জীবন যুগপৎ তখন তাঁর তালুবদ্ধ। ঐ বিপজ্জনক সেতুটা পার হ'য়ে আসেন ঝুড়িভর্তি হরেক রঙের মাছ নিয়ে। আর পা টলে না, নিয়তির গাঢ় উপচ্ছায়ার উপস্থিতি তিনি তো আর টের পান না।

কোন কোন মধ্যরাত্রিতে তিনি ও স্যালী লণ্ঠন ও হাত-জাল নিয়ে বিলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ান গলদা চিংড়ির সন্ধানে। মোটা মোটা কালো চিংড়ির ঠ্যাং ধরে কাপড়ে বাঁধেন। স্যালীর হাতে বাতিটাকে দূর থেকে দেখায় যেন কোন অলৌকিক রক্তাভ তর্জনী।

কুঁড়ের চারপাশে কত রকম ফলমূল, কবন্ধের মতন মাথাহীন গাছটার

গায়ে বেয়ে উঠেছে পুষ্টিকর লতা-পাতা, যাদের তুলে এনে স্যালী তাদের পরিমিত আহার প্রস্তুত করে।



রন্ধনে ও পরিবেশনে স্যালী সার্বিক দ্রৌপদী। এই ব্যাপারে তার উদ্ভাবনী শক্তির যথেষ্ট সমুন্নতি ঘটেছিল। নারিকেল থেকে হরেক রকম সুস্বাদু খাবার তৈরী ক'রে রেডের মুখের সামনে তুলে ধরতো। রেডকে খাওয়াবে বলে বন থেকে কত রকমের পাকা ফল তুলে আনতো সে। তার সেই প্রেম আর তখন নেহাৎ নীতিমন্ত্র নয়, এটা জীবনের সওয়াল।

উৎসাহকে নবীকরণ করবার জন্যই যেন রেড একদিন পাথর ছুঁড়ে একটি ছোট্ট শূকর ছানা শিকার ক'রে ফিরলেন। ওটার ঠ্যাং ধরে বীরদর্পে ফিরছেন তিনি, বক্ষঃপট উন্নত ও বলিষ্ঠ প্রসারতা—দূর থেকে দেখেই স্যালী সোল্লাসে হাততালি দেয়, তার উচ্চকণ্ঠ নাদিত করে সামগ্রিকতাকে। চকমকি জ্বালিয়ে মাংসকে ঝলসানো হলো, খাদ্য হিসেবে বস্তুটা কেমন হলো সেটা তে এহ্ বাহ্য। আসলে রেডের শক্তিকুশলতায় পুলকিত স্যালী কিভাবে যে নিজেকে বার বার নিবেদন করবে, ভেবে উঠতে পারছে না।

খালের জলে তাঁরা একসঙ্গে নগ্ন হ'য়ে সাঁতার কাটতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিৎ হ'য়ে উপুড় হ'য়ে রাজহাস রাজহংসীর কার্যান্বিত দৃশ্য বুঝি। ঐ অবস্থাতেও স্যালীর মুখে খৈ ফুটছে। রেড ডুব সাঁতার দিয়ে ওর পা ধরে টানাটানি করেন; স্যালীও পাল্টা তাঁর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়। জলজ গভীরতায় বিশাল স্তব্ধ প্রকৃতি ছাড়া তাঁদের সেই অনবদ্য কেলির কোন সাক্ষী নেই। সামাজিক মানুষের তত্ত্বের দর্পণে তারা প্রতিবিম্বিত নন। কোন আদিবাসী পুরুষের দৃষ্টি সেদিকে পড়লেও

পরমুহূর্তে সে সেই স্থান ত্যাগ করে। রেডের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা প্রায় অপার্থিব এবং স্যালী প্রত্যেকের কন্যাসমান। চঞ্চলিত মনকে সংযত রাখতেই হবে।

সন্ধ্যায় তাঁরা বনভূমি অতিক্রম ক'রে সমুদ্রতীরে যেতেন; প্রবাল প্রাচীর, যা এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিষন্নতা যেন, সমুদ্রের অত্যাচার নীরবে সহ্য করছে। কিন্তু রেড ও স্যালী সেই শক্তিশালী সমুদ্রেই একটি শালতিতে চেপে নেমে পড়লেন! রেডের হাতে দীর্ঘ বৈঠা. ঢেউয়ের তালে তালে শালতি নাচে, সমুদ্রের প্রতি অধীনতাসূচক কোন অভিব্যক্তি নেই। আনন্দে গান ধরলো স্যালী। সমুদ্র ঘন নীল, পশ্চিমাকাশের প্রভাবে ক্রমশঃ তা মদের মতন লাল, গ্রীক মহাকবি হোমার তাঁর মহাকাব্যে ঠিক এই ধরণের সমুদ্রের বর্ণনাই দিয়েছেন। ওলট পালট আছাড়ি পিছাড়ি রীতিমতন সন্ত্রাসবাদী সমুদ্র প্রবাল-প্রাচীরের গা বরাবর এই রং বৈচিত্র্য আরো চমকপ্রদ ক'রে তুলেছে। কখনো কখনো মনে হয়, ওটা জল নয়, রক্তও নয়, মদও নয়, টগবগে গলিত সোনা ও তজ্জনিত রং-বাহার। কিন্তু কোন বৈচিত্র্যই যে স্থায়িত্ব লাভে অসমর্থ। লেমনেডের ক্রেট থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে অন্য রকম একটা বোতল ঢুকিয়ে দেবার মতন। মৃত প্রবালরা যেন কিছুক্ষণের জন্য জাগ্রত হয়ে জলের রং রক্তাভ ক'রে তোলে, তারপর চকিতে ভাসমান মেঘের ছায়ায় ঝুল ঝুল অন্ধকার, মেঘ সরে যেতেই বাদামী প্রভাব, পরক্ষণে ধব ধবে শাদা, ভ্যাপসা গন্ধ ময়লা ফেনা ভেসে আসায় ঘোলাটে কলঙ্ক, কলঙ্ককে মুছে দিয়ে এলো বেগুনী, বেগুনীর উপর আবার খানিকটা লালিমা, এ যেন রাজরাজড়াদের ঘন ঘন সাজবদল।

এমন দৃষ্টিনন্দন পরিবর্তন ঈশ্বরের কী অসাধারণ বিলাসিতা! কোন মানুষ গরাদ চেপে ধরে সারাটা জীবন কেবল ঐ দৃশ্য দেখেই কাটিয়ে দিতে পারে। রেডও পারবেন। তাঁর মুখে রবীনসন ক্রুশোর মতন দাড়ি গজাক, জামাটা ছিড়ে যাবে, মোটা জিন্-এর প্যান্টটা হাঁটু

অব্দি কালো কালো হ'য়ে ঝুলবে, তবু তিনি স্যালীকে নিয়ে প্রতিদিন এখানে আসবেন, তাঁর কখনো একঘেয়ে বোধ জাগবে না।

সমুদ্র তো নয়, যেন একটা ম্যাজিক উদ্যান এবং শ্রেণী-বৈষম্যের ধার-না-ধরা চঞ্চল মাছগুলি উড়ন্ত মক্ষিকা। এমনি সব অতিকায় অথচ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি অপার্থিবতার কাছাকাছি। সমুদ্রের জল কোথাও কোথাও প্রবাল প্রাচীর উপচে আসছে এবং এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নাতিদীর্ঘ বালিয়াড়ি, যেখানে মার্বেল পাথরের মতন টলটলে হিম জলাশয়। ঐ জলে স্নান করাটা অনবদ্য অভিজ্ঞতার সামিল। রেড ও স্যালী সমুদ্র ফেরৎ ওখানে আর একদফা স্নান সারেন। তারপর ফিরতি পথে বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, নরম ঘাসের রাজত্বে পা ফেলেন, নারিকেল বনে মীনাহ্ পাখিদের কলকাকলি শোনেন।

অনেকদিন যাবৎ রেডের বুকে উপর্যুপরি কয়েকটা ছ্যাঁকা দিয়ে যাবার মতন কোন জাহাজ এখানে ভিড়ছে না। তিনি প্রায় ভুলেই যেতে বসেছেন, সত্যিই কোন একটা জাহাজ হঠাৎ এক সকালে এ তল্লাটে এসে ঢুঁ মারতে পারে এবং তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠতে পারে তেমনি কোন নাবিক—কপালে বিরাট কালশিটে, ঠোঁটে চুরুট, হাতে বোতল, এলোমেলো লাল চুলে নীল রঙের ফিতে, কনুই হাঁটুতে কালি ঝুলি। হাড্ডিগুড্ডি পাকা ক্যাপ্টেন, বাঁ চোখে কালো এক টুকরো কাঁচ, কেবিনে তাঁর দামী দামী বোতল ও সিগার, জাহাজ বন্দরে ভিড়লে প্রবাসী ইয়াররা সেখানে আমন্ত্রিত হয়, আদিম মানুষের হিংস্রতা নিয়ে হা-হা-হা হাসি···ঐ হাসি, ঐ হাসিতেই রাগের পুঞ্জীভূত ধোঁয়া···না, না, রেড আর ফিরে যাবেন না ঐ জগতে। হাতের তেলোয় চুল গজাবে, তবু নয়। মনের জোর খুঁজতে স্যালীকে প্রচণ্ড জোরে আঁকড়ে ধরেন রেড। তীব্র অধিকারবোধে ওর অসাধারণ স্তন দুটিতে পাগলের মতন গাল ও ঠোঁট ঘষতে থাকেন। কোন কথা নেই, সতৃষ্ণ আনন্দে স্যালী সেই উন্মত্ততা উপভোগ করে। নিষ্কলঙ্ক মনে তার কোন সন্দেহ নেই, দ্বিধা নেই। সে হলো সেই বিরল যুবতীদের একজন, যে

কোনদিন আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে তার সঙ্গীর কাছে কোন কৈফিয়ৎ তলব করবে না। সে হলো সেই নারীদের একজন, যারা মরমে-দুঃখে পুড়ে খাক হ'য়ে গেলেও কাউকে দোষারোপ করবে না। সে হলো সেই অবুঝ আদিবাসিনী, যে তখনো খালাসীদের মেজাজ-মর্জির খবর রাখতো না।...

"ঘুমন্ত দ্বীপের আকাশ য়ুরোপের যে কোন দেশের আকাশের চেয়ে আয়তনে বড়। সব সময় সন্ সন্ বাতাসের দাপটে নিঃঝুমভাব আরো গভীরতর। গাছ-গাছালি জুড়ে পাখিদের যে মেলা, তাকে মায়ার জগত বলা চলে। দীর্ঘরাত্রিগুলি মধুময় বলেই প্রত্যাশা যেন আর মেটে না। মানুষ এখানে আছে, মানুষের অনুকারী সঙ্গীরাও আছে। কিন্তু কোন জটিলতা নেই বলেই তাদের যেন ঠিক জাগতিক বলে মনে হয় না।

এবং তখন ওখানে স্যালী ষোলো, রেডের বয়স বড় জোর কুড়ি। তারা যখন নিদ্রামগ্ন, তখন মনে হবে, যেন এক জোড়া শিশু মাতৃস্তন থেকে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করতে করতে একসময় পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাছ ও ঘনপাতার আড়ালে তেজী সূর্যের প্রকাশ বড় উদাসীন ও গম্ভীর থাকায়, এক একদিন ঘুম ভাঙতে তাঁদের অনেক বেলা হয়ে যায়। এই ভাবেই সুখে আকণ্ঠ বহমান মুহূর্তগুলি একটার পর একটা দিন পার করায়, সপ্তাহকে পিছনে ফেলে দেয়, দ্রুততায় মাসগুলিকে অতিক্রম ক'রে একটা গোটা বৎসরকে প্রদক্ষীণ সারে।

তখনো তাঁদের প্রেম, তাঁদের কাম সমান তপ্ত, তখনো আড়কাঠিদের মতন সতর্ক নীরবতায় আচমকা স্যালীকে জাপটে ধরেন রেড, তখনো জলের তলায় রেডের গোপনস্থানে আঘাত ক'রে সাঁতরে পালায় স্যালী। এমনি আবেগ। না, একে ঠিক আবেগ বলবো না। কারণ মানুষের আবেগ ক্ষণায়ু এবং পরিনামে আসে প্রচণ্ড শূন্যতাবোধ।

কিন্তু রেড ও স্যালীর পারস্পরিক আকর্ষণ চিরায়ত। রেড ভাবতেন: নিজেকে নিয়ে আমার কোন ভয় বা ভবিষ্যৎ চিন্তা নেই।

স্যালী ভাবতোঃ আমার সোনামণি, আমাকে ছেড়ে কোথাও একটি দিনও থাকতে পারবে না।

স্নিগ্ধ রাত্রি যেমন সব কিছুকে জড়িয়ে ধরে নিজের মহিমা প্রকাশ ক'রে, পরস্পরের প্রতি অগাধ আস্থাই এদের প্রেমের মহিমাকে তেমনি প্রকাশ করছিল।

বহু লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে আশীর্বাদ লাভ করছেন তাঁরা। ভীতি নেই, দুশ্চিন্তা নেই অতীত নেই, ভবিষ্যতের জন্য কোন ভাবনা নেই—ভাবুন তো, কী অসাধারণ জীবনযাত্রা!

"মশাই, আমি হলপ করে বলতে পারি, ওঁদের কাব্যিক জীবনে প্রত্যক্ষভাবে বিচ্ছিন্নতার ছায়া পড়েনি। কিন্তু সময়, বুড়ো সময়, টানা পোড়েনের খেলায় শক্ত সুতোকে কখন যেন নরম ক'রে ফেলে। আত্মিক যোগাযোগে কবে যে চিড় ধরলো, মালুমই হয় না। না, না, এ দোষাবহ নয়, এ বড় কঠিন বাস্তব। অথবা, অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারি, প্রেম একাধারে যেমন ঈশ্বরের আশীর্বাদ, অন্যধারে তেমনি একটি বিষফলও বটে। মারীচ মায়ায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক লগ্নে স্বপ্নভঙ্গের সূচনা। আপনি যদি কখনো কোন প্রেমিকের স্বীকারোক্তি নেন, এক সময় শুনতে পাবেন ছোট ছোট বিচ্ছুরণে সেই হাহাশ্বাস।

একটি দুর্বার বৎসরময় অবিশ্রান্ত নেশায় আচ্ছন্ন থাকবার পরও ওঁদের জীবনে বিষফল এলো এবং তা যথারীতি পুরুষ রেডেরই হৃদয়ে।

রেড চাননি, এমন কোন যন্ত্রণাকে লালন করতে এবং স্যালীর মনেও কোন সন্দেহ দানা বাঁধেনি। কিন্তু যা অমোঘ, তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

সমুদ্রের ডাক শুনতে শুনতে রেড উদাসী হ'য়ে পড়েন। কিসের আন্তরিক তাগিদে শূন্যতা অনুভব করেন। স্যালীর শরীর ও সোহাগের বাইরে অন্য কোন ঈপ্সিত বস্তু কি তাঁকে অল্প-অল্প নাড়া দিতে শুরু করেছিল? সম্ভাব্য ধ্বংসলীলার পশ্চাৎপটটা কোথায়? সেদিন

সকালে একটি আদিবাসী বালক ছুটতে ছুটতে খবর দিয়ে গেল তাঁদের, একটি প্রকাণ্ড ইংরেজ জাহাজ এসে ভিড়েছে প্রবাল-প্রাচীরের কাছে। অনেক নাবিক, খুব হল্লা, সুন্দর রঙিন পতাকা পত পত ক'রে উড়ছে।

" একটি প্রকাণ্ড ইংরেজ জাহাজ এসে ভিড়েছে—খবরটা রেডের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে, ক্রমশই সেটা জোরদার হতে থাকে। অতীত, যা প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে সিল্যুটচিত্র হয়েছিল, এই মুহূর্তে অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে উঠলো। নাবিকদের সঙ্গে একটু পঙক্তিভুক্ত হ'য়ে হুল্লোড় ক'রে আসা—এমন কি অন্যায় কাজ?

এই প্রথম একটি দুপুর রেড স্যালীর সান্নিধ্য এড়িয়ে খানিকটা দূরে অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ হ'য়ে রইলেন। তাঁর পবিত্র স্বর্গীয় মুখে জটিল ছায়া নামলো।

শেষে আর স্থির থাকতে না পেরে উস্কো খুস্কো চুলে স্যালীর সামনে এসে দাঁড়াল, কোমরে দুই কঠিন বলিষ্ঠ হাত, স্বর কিন্তু যথার্থ অকম্পিত নয়ঃ আমি একবার ঐ জাহাজে যাবো!

স্যালীর সরল সারঙ্গ দৃষ্টিঃ জাহাজে কেন যাবে?

রেডের অভিব্যক্তি পেন্সিল স্কেচের মতন অস্পষ্টঃ বাণিজ্য করবো।

ঃ কিসের বাণিজ্য গো?

ঃ কিছু নারিকেল, আম, লেবু, আপেল ও ফুলের পরিবর্তে দু'এক পাউণ্ড তামাক নিয়ে আসবো। কতদিন মনের সুখে ভালো সিগার টানি না।

এবার একটু ব্যথার ভার বেজে উঠলো স্যালীর বুকেঃ ভালো সিগার খাবে? তা হ'লে যেও।

রেড ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে স্যালীর শরীরের ওম নিতে থাকেন কিছুক্ষণ ধরে। স্যালী রেডের লাল চুলে বিলি কাটতে কাটতে আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। শিকারী বাজের আতঙ্কে কুঁকড়ে পড়া একটি পাখি যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মাটির কাছাকাছি নেমে আসবার।

"স্যালী তো তাঁকে চমৎকার শক্ত সিগার পাকিয়ে দেয়, মেঘের মতন ভাসমান ধোঁয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে এতদিন তারই কত প্রশংসা করেছেন রেড। হঠাৎ শহুরে সিগারের প্রতি তাঁর লোভটা চাগিয়ে উঠলো! এক বছর ধরে পাইপ-না-টানতে পারার শোক তাঁকে পেয়ে বসলো। পাইপ টানবার মৌতাত—রেডের মুখের ভেতরটা লালায়িত হ'য়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বর্গীয় স্বপ্ন আস্তে আস্তে ফিকে হ'য়ে আসছে। অনেকে হয়তো বলবে, স্যালীর তখন উচিত ছিল, রেড্‌কে আটকানো। কিন্তু কেন? প্রকৃত প্রেম তাকে শিখিয়েছিল, বিশ্বাস করতে, নির্ভর করতে। তার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, রেডকে কেউ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বরং সে উৎসাহে গুন গুন গাইতে গাইতে রেডকে মদত দিলো। আহ্, সোনা কতদিন ভালো সিগার পায় নি! হয়তো দু'এক বোতল ব্রাণ্ডিও মিলতে পারে।

প্রভাতী লগ্নে স্যালী রেডের সাহায্যে এগিয়ে এলো। তাঁরা দু'জনে দ্বীপের অনুচ্চ পাহাড়টাতে গিয়ে উঠলেন। আকাশ মুচড়ে শিশির পাতে তরুশাখা অপূর্ব মঞ্জরিত। সারাটা দিন ধরে তাঁরা বুনো লেবু তুললেন। সবুজ রং, কিন্তু মিষ্টি ও রসালো। হরেক রকম ফুলও তুললেন তাঁরা। তারপর নারিকেল গাছ থেকে কেটে নামালেন বহু নারিকেল। টসটসে আপেল এবং সুস্বাদু আম ও ঝুড়িতে ভরলেন। কোন কাজটাই ব্যঞ্জনাহীন নয়, যেহেতু কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্যালী ছুটে গিয়ে রেডকে আদর জানিয়ে আসছিল।

পরদিন সকালে প্রচণ্ড পরিশ্রম ক'রে তাঁরা ঐ সব স্তূপাকার কাঁচা রসদ বয়ে নিয়ে গেলেন খালের মুখে। তাঁদের সঙ্গে জাহাজের সংবাদ-বয়ে আনা সেই নেটিভ ছেলেটাও ছিল। একটি ছোট্ট আদিম নাও শিহরিত জলতরঙ্গে দুলছে। ওটাতে সব মাল তুলে চেপে বসলেন রেড। সঙ্গে সেই ছেলেটা সহকারী হিসেবে।

স্যালীর দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হাসলেন রেড।

দৃষ্টিকে উন্মোচিত রেখে স্যালীও হাত তুললো।

সবলে লগি দিয়ে নৌকাকে ঠেললেন রেড। নৌকা দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে। রেডের টক টকে লাল চুল বাতাসে উড়ছে।

ভারি নিঃশ্বাস চাপতে পারলো না স্যালী। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভাসমান রেডের দিকে।

সেই শেষ—রেডকে সেই শেষবারের মতন দেখছে সে।

"...সারাটা রাত স্যালী দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না। কান পেতে রইলো—এই বুঝি ওরা ফিরলো! এই প্রথম একটি রাত্রিকে তার সীমাহীন দীর্ঘ মনে হলো।

পরদিন সূর্য উঠলো। চকিত চমকে উম্মোচিত হ'য়ে উঠলো পূবের আকাশ। খাল পাড় অব্দি একবার ছুটে যায়, আবার ফিরে আসে স্যালী।

অবশেষে দেখা মিললো।

না, রেড নন, সেই হতভাগ্য নেটিভ ছেলেটা—প্রকৃতই ভগ্নদূত। বুক খোলা বিপর্যস্ত অবস্থায় টলতে টলতে ফিরছে, ভেজা শরীর শুকিয়ে গেলেও চুল থেকে জল গড়াচ্ছে; আর জল গড়াচ্ছে দু'চোখ বেয়ে।

স্যালী চিৎকার করে উঠলো: সে কো-থা-য়?

উত্তরে হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ছেলেটা: দিদি, ওরা রেডকে ফেরৎ দিলো না...জাহাজ চলে গেছে।

না, আর কোন চেঁচামেচি, ব্যস্ততা নেই! কেবল পাথরের মূর্তি হয়ে গেল স্যালী। স্যালী ও রেডের মায়াময় সংসার, বনের রাজ্যে হরিহরছত্র—সমস্তই ঝুর ঝুর ভেঙ্গে পড়ছে। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় মস্ত চওড়া হাতে বিধাতাই গড়েছিলেন। এখন যেন তিনিই ভাঙ্গলেন।

কান্না থামলে বালকটি ঘটনার যে বর্ণনা দিলো, তা এই রকম—

লগি মেরে মেরে নৌকাটাকে সাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন রেড। হঠাৎ কেমন যেন বাগ্মিতাবিলাসে পেয়ে বসেছিল তাঁকে। তিনি

দ্বীপটার থমকে দাঁড়ানো ভুতুড়ে পরিবেশকে আক্রমণ করছিলেন। বলছিলেন, সুযোগ পেলে স্যালীকে তিনি নগর দেখিয়ে আনবেন। ক্রমশঃ জাহাজটা তাঁদের দৃষ্টির সামনে অতিকায় রূপে প্রতিভাত হলে রেড স্তব্ধ কঠিন হ'য়ে গেলেন। তাঁর দুই চোখ জ্বলছিলো। বিরাট জাহাজ, য়ুনিয়নজ্যাক পত পত ক'রে উড়ছে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলিকে ক্ষুদে ক্ষুদে ভিন্নতর জীব বলে মনে হয়। নৌকা যত কাছে আসে, ততই ওদের অবয়ব বড় হতে থাকে। চাঞ্চল্য পড়ে গেছে জাহাজেও। একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক আদিম নাও বেয়ে জাহাজের দিকেই আসছে। চমৎকার স্বাস্থ্য, পোষাকে মলিনতা সত্বেও ওর রূপ বিশাল সমুদ্রের বুকে আকর্ষনীয়। একমুখ কালো কুচ কুচে দাড়ি এবং টক টকে লাল চুল বাতাসে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে।

রেড মুখে তুলে দেখলেন, একটি লোক সকলের আগে পাটাতনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রেড চিনলেন—ক্যাপ্টেন। জাহাজের সম্রাট। খুব দশাসই চেহারা নয়, কিন্তু সামুদ্রিক স্পর্শে ও আভিজাত্যে ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন। ঠিক চোখে দূরবীন ঘোরাতে ঘোরাতে একটা চোখ আর একটার চাইতে ছোট। মিলে যাচ্ছে। যে ছবিটাকে মুখে ফেলতে চেয়েছিলেন রেড, সেটাই নিরেট কঠিন বাস্তব হয়ে তাঁকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তিনি নিশ্চয় বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু কিছু করবার ছিলনা। মানুষের মন তার জীবনের চাইতে বহুগুণে বেশি রহস্যময়, দুর্বোধ্য, জটিল।

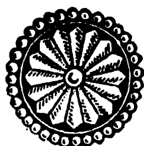
ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিতে দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। রেড বেয়ে বেয়ে উঠলেন, পিছন পিছন ছেলেটা। আংটা দিয়ে তোলা হলো তাঁদের সামগ্রীগুলিকেও।

ছেলেটা দেখলো, রেডের উপস্থিতি নিয়ে জাহাজীদের মধ্যে, বিশেষতঃ যারা শাদা চামড়ার মানুষ, একটা সাড়া পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন বেশ আগ্রহের সঙ্গে রেডের সঙ্গে কথা বলছেন। সেই আলাপের বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছে না নেটিভ বালক। সে কেবল বড় বড় চোখ

মেলে ঘটনা প্রবাহের উপর নজর রাখছে মনে হচ্ছে, রেড ওদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে উপনীত হতে পেরেছেন। তাঁকে বেশ খুশী ও আগ্রহী দেখাচ্ছিলো। দু'জন খালাসী জাহাজের খোলে ঢুকে প্রচুর বাদামী তামাক নিয়ে এলো, কয়েক কার্টুন বড় বড় সিগারও এলো। রেডকে একটা কুমীরমুখো পাইপ দেওয়া হলো। সোল্লাসে পাইপ ধরালেন রেড। ছেলেটি হাত নেড়ে দেখালো. রেডের বড় দীর্ঘ বড় বিলম্বিত একটি টানের পর কী বিরাট শাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী তাঁর মুখ ও নাক দিয়ে গল গল ক'রে বেরিয়ে আসছিল। কথা বলতে বলতে রেড ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সুসজ্জিত কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। কেবিনের দরজা খোলা থাকায় ছেলেটা স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছিলো। একটা গোলাকার টেবিল ঘিরে রেড বসলেন, ক্যাপ্টেন বসলেন, আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ জাহাজী এসে বসলেন। কুশ্রী দর্শন বাবুর্চি নিয়ে এলো একটা পেটমোটা বোতল এবং গুটি কয়েক স্ফটিক গেলাস। বোতলে রক্তের মতন লাল মদ। তৃষ্ণার্ত মানুষের মতন পৌনঃপুনিক চুমুকে মদ খেতে থাকেন রেড। ক্যাপ্টেন তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বললেন। জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে হো-হো হেসে উঠলেন রেড। অর্থাৎ, কড়া পানীয়র প্রভাবে ইতিমধ্যেই তিনি নেশাগ্রস্ত। অনবরত রেডের গেলাসে মদ ঢালছেন ক্যাপ্টেন, নিমিষে সব উধাও। আবার একটা বোতল এলো। কখনো সিগার, কখনো বা পাইপ—ধূমপানেরও অন্ত নেই। সকলের নিরুদ্বিদ মুখের দিকে চেয়ে নিজের দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কি যেন বলছেন রেড, আপন উল্লাসে হেসেও উঠছেন কেবিন কাঁপিয়ে। একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে চেয়ার উল্টে দিলেন। ফলে আবার বসতে হলো। একী অকুল অকরুণ দৃশ্য! এ কী পরিবর্তন!

শ্রীহীন ছাঁদহীন ভঙ্গিমায় তাঁরা প্রলাপ বকছেন, অনবরত মদ খাচ্ছেন, হা-হা-হা হাসছেন···কাঁহাতক আর এমন একঘেয়ে দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায়। ধীরে ধীরে নির্জীব, নিরুৎসাহী হয়ে পড়লো ছেলেটি।

সে ক্রমশঃ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছিল। কাল দুপুর থেকে শরীরের ওপর দিয়ে কম ঝড় বয়ে যায়নি। জাহাজের চৌহদ্দীর মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করলো, তারপর লোয়ার ডেকের এক কোনে দু' হাঁটুর মধ্যে ঘাড় নিচু মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলো। অবসন্ন শরীর নিয়ে এক সময় শুয়েও পড়লো। ঘুম।



ঘুম ভাঙ্গলো খালাসীর লাথি খেয়ে। সে এমন অভ্যস্ত পাপের হদিশ জানতো না—মানুষ মানুষের গায়ে পা চালাচ্ছে!

আঁতকে উঠে পড়লো সে।

কিন্তু সে আরো আতঙ্কিত হলো জাহাজের দুলুনি টের পেয়ে। নোঙর তুলে মন্থর আলস্যে জাহাজ যে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এ হটকারিতার কোন জবাব নেই!

সে পড়ি-কি-মরি ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো সেই কেবিনটার সামনে, যেখানে গত সন্ধ্যায় এবং সম্ভবতঃ সারা রাত্রি ধরে রেড জাহাজীদের মালের আসরে হুল্লোড় করছিলেন। এ কেবল ফুর্তি করা নয়, নিজের ভাগ্যদুয়ারকে আবার তালা বন্ধ ক'রে রাখা! সে দেখলো টেবিলের ওপর হাতে মাথা পেতে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন রেড। পরিচ্ছন্ন কেবিনটা এখন লণ্ডভণ্ড, নোংরা।

ছেলেটা চাইলো, রেডকে জাগিয়ে দিতে। তীক্ষ্ণ আওয়াজও বেরিয়ে এলো তার গলা থেকে ঃ রেড।

আর ঠিক তখনই দ্বিতীয় লাথি এসে পড়লো তার শিশু পাছায়। অ-জানা ভাষার চোস্ত, অশ্লীল খিস্তি এক ডেলা থুতুর সঙ্গে তার মুখের উপর। কত কি তখনই বদলে যাচ্ছে তার অভিজ্ঞতার দর্পণে।

ছেলেটার দুই হাত ও ঘাড় ধরে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী খালাসী

জাহাজের কিনারা অব্দি টানতে টানতে নিয়ে গেল এবং অলৌকিক নির্মমতায় ছোট্ট দেহটাকে তুলে ছুঁড়ে মারলো সমুদ্রের দিকে।

সে কিন্তু মরলো না। কিংবদন্তীর একটা অপ্রয়োজনীয় চরিত্র হলেও বেঁচে গেল নিজের স্বাভাবিক দক্ষতায়। সে সাঁতার কাটতে কাটতে জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রাখা শালতিটাকে উদ্ধার করলো। তটভূমিতে পৌঁছেই ছুটতে শুরু করলো স্যালীকে খবর দেবার জন্য।...

"স্যার, ঘটনাটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সভ্যতার শীলমোহর নিয়ে আপনারা এমন কাণ্ড তো হামেশাই করে থাকেন! তাই নয় কি? বাণিজ্যিক জাহাজগুলিতে প্রায়শই খালাসীর অভাব, আর অভিজ্ঞ জাহাজী এক একটা জাহাজে আর ক'জন থাকেন? উৎসাহের প্রাবল্যে রেড ক্যাপ্টেনকে তাঁর পূর্ব-পরিচয় জ্ঞাপন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলকিত ক্যাপ্টেন তাঁকে ফুসলে নেবার চেষ্টা করেন। চুক্তিপত্র ও প্রস্তুত। কিন্তু রেডের বিবেক, স্যালীর প্রতি তাঁর প্রেম দ্বিধা ও অনিচ্ছাকে অনিবার্য ক'রে তুলছিল। কিন্তু জাহাজীরা অনেক তাজ্জব তামাশা জানে, তাদের কাছে কড়া মদ আছে, ভালো তামাকের সিগার আছে, চাইলে বন্দর থেকে মাগীও এনে দিতে পারবে। রেড সরল যুবক—বার্ধক্য তথা ব্যর্থতার দিকে ঢলে পড়তে তাঁর অনেক দেরী। যুবকের রক্তে লোভ, কাম, প্রেম ত্যাগ ··সবই সমানভাবে কার্যকরী হয়। সুতরাং, অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন বাণিজ্যের অছিলায় দামী তামাক ও সিগার এনে দিলেন, একটা কুমীরমুখো বয়ার পাইপ উপহার দেওয়া হলো, তারপর মদের আসর বসলো,···দারুণ কড়া মদ ও গল গল ধোঁয়া —দেখতে দেখতে আসল রেড প্রেতায়িত হয়ে গেলেন। পড়ে রইলো স্থূল, নেশাড়ু নাবিক রেড-অনির্দেশ গন্তব্য যার প্রাত্যহিক ভাগ্যলিপি।

"এই ভাবেই ভালোবাসা বিকিয়ে যায়। এইভাবেই স্বরচিত স্ব গর্বে নিজেরই হাতে চূর্ণ করে।

স্যালী একাকী, অবর্ণনীয় তার হাহাকার। গোত্রহীন ব্যথায় তার

বুকের ভিতরটা পুড়তে থাকে। কখনো নীরবে, কখনো বা চিৎকার ক'রে কাঁদে।

প্রতিদিন সমুদ্রের কিনারে গিয়ে দাঁড়ায়; আবার অন্ধকার ঘনালে অনতি অতীত জঙ্গল মাড়িয়ে ফিরে আসে। রক্তমুখী সূর্যের দিকে চেয়ে নিজের কপাল চাপড়ায়। পাহাড়ের উপর উঠে দেখবার চেষ্টা করে, দূর সমুদ্রে জাহজের কোন বিশীর্ণ রেখা যায় কি না! কালে ভদ্রে কোন জাহাজ এসে ভিড়লে, সে উন্মাদিনীর মতন সেখানে ছুটে যায়। ফিরে আসে আরো কঠিন আঘাতে কাঁদতে কাঁদতে—রেডের সন্ধান তো সে পায়-ই নি উপরন্তু এক ক্যাপ্টেন তাঁর কেবিনে ঢুকিয়ে শরীরটাকে চুষে খেয়েছে। তবু তার মনে কিন্তু ঠিক ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই, জগতের কিছু কিছু জিনিসকে সে নিয়ম বলেই মেনে নিতে শিখেছে। কোন শ্বেতাঙ্গের মুখোমুখি হলে সে জড়োসড়ো হয় এবং কথা বলবার সময় প্রচণ্ড যন্ত্রণা থাকা সত্বেও ঠোঁটের কোনে সেই আশ্চর্য সুন্দর হাসি ফুটিয়ে তোলে।

এক একটা জাহাজ আসে, স্যালী প্রতারিত হয়, অপস্রিয়মান মাস্তলের দিকে সজল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সাহচর্যহীন থম থমে বেদনায় সে তার যৌবনের মধ্যস্থলে, এরপর ঢলে পড়বার কাল শুরু হয়ে যাবে—সারাটা জীবন ব্যর্থ, কেবল ঐ একটা বৎসর স্বর্গীয় ও মহিমময়।

স্থানীয় আদিবাসীরা এসে তাকে বৃথাই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। তারা সস্নেহে কথা কয় আর স্যালী ভূতুড়ে আবছায়ায় মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে।

অনেকদিনই অভুক্ত থাকে, পেটে সন্তান, খাবার স্পৃহা নেই। ক'দিন আগেও খুব তুচ্ছ সব কারণে যে মিষ্টি হাসিতে হুটোপুটি খেতো, এখন তার মুখে হাসির বদলে গাঢ় বিষন্নতা।

কোন আশা নেই, পরিত্রাণ নেই, তবু ধু ধু বালিয়াড়ির বুকে বসে শ্রান্তিহীন সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। ভাগ্যিস, এখানে জাহাজ ভেড়ে

খুব কম, নচেৎ কোন-না-কোন উৎসাহী চিতাবাঘ তাকে একেবারে তুলে নিয়ে যেতো।

তার আত্মীয়রা এসে তাকে সঙ্গে যাবার জন্য পীড়াপিড়ি করে। কিন্তু সে নারাজ। তখনো তার প্রত্যয়, বহু দূর পরিধিকে ছুঁয়ে তার রেড আবার একদিন, ঠিক ফিরে আসবেন। ফিরে এসে তাকে তো এখানেই খোঁজ করবেন। ব্যর্থ প্রেমের অজস্র জীবাণু তখন তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

রেড হারিয়ে যাবার চার মাস পর স্যালী একটি মৃত শিশুর জন্ম দিলো। যে জাঁহাবাজ আদিবাসিনী প্রসব করাতে এসেছিল, সে-ই বলেছে, বাচ্চাটা হাড়ে-মজ্জায় ঠিক যেন সেই রেড। কিন্তু, আহারে, প্রাণ নেই!

এটা স্যালীর জীবনে দ্বিতীয় প্রচণ্ড আঘাত। জীবনের সমস্ত আশা, আনন্দ, উৎসাহ নিভে গেল। তার মনে, মগজে আর কোন বাস্তব প্রত্যাশা নেই। তাকে সংসার জীবনে টেনে আনবার জন্য একাধিক আদিবাসী যুবক প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সেই পরিষ্কার জবাব: রেড তো ফিরেও আসতে পারেন।

নেইলসন থামলো।

এক বিপুল আলো ও গভীর অন্ধকারের রাজত্ব ছুঁয়ে আসায় এখনো তার দৃষ্টিতে উদ্‌ভ্রান্তির ছাপ।

"শেষ পর্যন্ত কি হলো স্যালীর?" এই প্রথম ক্যাপ্টেনের স্বরে আগ্রহ ফুটে ওঠে। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে আসেন। তাঁর লাল চোখে কেবল আগ্রহ নয়, ভয় ভয় ছায়াও। তাঁর কপালের একটা নীল শিরা কাঁপছে, লাল ও সোনালী চুল বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম ঝরলো।

নেইলসন তিক্ত হাসি হাসে, তার সমস্ত রোমাঞ্চ যেন এক কঠিন সচেতনতায় দানা বাঁধে, গম্ভীর স্বর ধ্বনিত হয়: সে? তিনটি বৎসর প্রতীক্ষা করবার পর আর এক শ্বেতাঙ্গকে বরণ ক'রে নিয়েছে।

ততোধিক তিক্ততায় ক্যাপ্টেনের বিপুল বপু নাড়া খেলো। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতন আবার তাঁর শরীরটা ছিটকে সরে গেল পিছনে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "ওদের এমনটিই হয়ে থাকে। বেঁচে থাকার রসদ পাবে কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণা ও বৃতিষ্ণায় নেইলসনের ভেতরটা রি রি করে ওঠে. সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকায়। এতক্ষণ ধরে খুবই আন্তরিকভাবে যে কথাগুলি সে বলছিল, তার প্রতিটি শব্দ সে ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত।

তবু তার সংযম বড় গভীর। নিজেকে সংযত রেখে আপন গভীরতায় ডুব দেয়। আমি কেন এমন ঘৃণা ও বৃতিষ্ণায় মনে মনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছি? নিজের অনুক্ত স্মৃতিই বড় প্রকট হ'য়ে তাকে দংশন করলো। যে আহ্লাদ, যে সুখ রেড একবৎসর ধরে ভোগ করে গেছেন, সারাটা জীবন প্রয়াস চালিয়েও নেইলসন তা স্যালীর কাছ থেকে আদায় করতে পারে নি। ব্যর্থ প্রেম কি সরল মেয়েদের মন ও এমন শক্ত সমর্থ পাথর বানিয়ে দিয়ে যায়? স্যালীর মৃদু মৃদু হাসির আড়ালেও সেই উপেক্ষা এবং প্রতীক্ষা!

এবার আর কথা নয়।

কেবল স্মৃতির ডানায় উড়ে যাওয়া।

পঁচিশ বছর আগেকার কথা। চিন্তাযুক্ত কর্তব্যের জগত থেকে বিদায় নিয়ে নেইলসন নিজের দুর্বল শরীর টানতে টানতে আশ্রয় নিয়েছে মমতা ও সুঘ্রাণভরা এই আশ্চর্য দ্বীপে। বাসনা ছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্‌দের মধ্যে একজন সে হবে। কিন্তু ক্ষীণস্বাস্থ্য ও দুর্বল জীবনীশক্তি সেই বায়নার সঙ্গে তাল মেলাতে রাজি হলো না।

অল্প পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট হয়, ধুকতে থাকে, উত্তেজিত হওয়া বারণ, আনমনা হ'য়ে থাকাটাই শরীরের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। সাবধানে জীবন

যাপন আর দিন গুনে চলা। তবে অনুভূতি খুব প্রখর এবং তাই এই দ্বীপের স্বাভাবিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে।

স্থানীয় এক শংকরজাতি ব্যবসায়ীর ডেরায় আশ্রয় নিয়েছে। বান্ধবহীন এই দ্বীপে লোকটা এসেছে কেবল পয়সা করতে। নেইলসনকে পেয়ে খুশি হলো। এত কম বয়সেই পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি হয়েছে ছেলেটার। আবার সঙ্গে সঙ্গে ধস্‌ও নেমেছে শরীরে, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, খুব আস্তে—প্রায় পাখির স্বরে কথা বলে।

কিন্তু আশ্চর্য, দ্বীপের মহিমায় নেইলসন দ্রুত সুস্থ হ'য়ে উঠলো, জায়গাটার প্রতি মনে তার মায়ার পলিও জমলো।

প্রতিদিন পায়ে পায়ে সে বন-পাহাড়-খাল ইত্যাদি পরিক্রম করে। সূর্যোদয়ের শোভা দেখবার জন্য পূবাকাশের দিকে শেষরাত থেকে উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে থাকে। এখানে থাকতে থাকতেই নেইলসনের উপলব্ধি ঘটে, মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকবে তার কোন বাঁধাধরা ছক নেই। আনন্দের আশ্রয়ে পরমায়ু তার সীমা প্রসারিত করেই চলে।...

ঘুরতে ঘুরতে নেইলসন একদিন উপস্থিত হলো সেই কুঁড়েটার সামনে, খাঁ খাঁ শূন্যতা নিয়ে স্যালী প্রতীক্ষারত।

একটি কুটির, যার চারপাশে ছিল সুন্দর ছবির মতন বাগান, এখন অযত্নে বেড়ে উঠেছে অনেক আগড়ম বাগড়ম আগাছা, তবু সহজ সৌন্দর্যে সর্বদাই গম্ভীর বিষণ্ণ—নেইলসনের মতন অনুভূতিপ্রবণ মানুষের কাছে চমৎকার, আকর্ষণীয়।

সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল এবং তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো স্যালী। দু'জন দু'জনের মুখোমুখি। আকাশ উপচানো ঢালাও রোদ সুন্দরীর সর্বাঙ্গে, কঠিন নীরবতা সত্বেও যেন কি কলোরব সে তার কাপড়ে বেঁধে রেখেছে। এমন তন্বি সুন্দরী যুবতী নেইলসন এর আগে কখনো দেখেনি ; বিশেষত নিষ্ঠুর প্রবাসে এই রকম একটি নারীকে চাক্ষুষ করা অকল্পনীয় প্রাপ্তি। যৌবন যেন কপাট ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে, মাথা থেকে পা অব্দি অঢেল সম্পদ, বাক্যের সাধ্য নেই সবটুকু নিংড়ে

নিতে পারে। আর কী অদ্ভুত ওর চোখ দুটো—বিষণ্ণ গভীরতায় ভূমধ্যসাগর। কানাকা উপজাতির নারী / পুরুষেরা স্বাভাবিক সৌন্দর্যে বলীয়ান, কিন্তু স্যালীর যেন কোন তুলনাই হয় না। বনের মধ্যে এমন ফুল ফুটে থাকতে দেখলে কার না লোভ হয় ?

অথচ, সে একা। ভয়-ডর নেই ?

একজন অপরিচিত শ্বেতাঙ্গকে দেখে স্যালীও সামান্য বিচলিত হয়েছিল। তবে রেডের সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। এর চোখে মমতা আছে, রেডের মতন চুম্বক নেই। আর বড় রুগ্ন! এই শীর্ণতা পোশাকে ঢাকা পড়বার নয়। গাঢ় খয়েরী রঙের ঢোলা প্যান্ট এবং ডাবল ব্রেস্টেড কোট সত্ত্বেও শরীরের জিল জিল ভাব অনুমান করা যায়।

চিন্তাকুল মনে নেইলসন সেদিন ফিরে এসেছিল। ব্যবসায়ী আশ্রয়দাতাকে স্যালী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাতে শুনতে পেলো রেড স্যালীর ট্র্যাজিক উপাখ্যান। ঝাঁঝালো নোনতা স্বাদে বুকের ভেতরটা ভরে যায়।

চক্ষুকর্ণের অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রখর অনুভূতি ও কল্পনার সাহায্যে রেড ও স্যালীকে নিয়ে মনের ক্যানভাসে ছবি আঁকতে থাকলো সে। সেই সব মধুর চালচিত্র, যা সে এই কিছুক্ষণ আগে ক্যাপ্টেনকে শুনিয়েছে।

"আপনার কি মনে হয়, সে আবার ফিরে আসবে ?"

—ব্যাবসায়ী ভদ্রলোককে নেইলসন জিজ্ঞেস করেছিল।

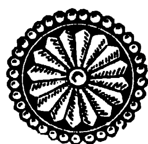
"সে গুড়ে বালি। দু'বছরের মধ্যে যখন এলো না, তখন ইহজীবনে আর মুলাকাৎ হবে না। জাহাজীদের সঙ্গে এত বৎসর কারবার করছি, ওদের স্বভাব আমার নখাগ্রে। বিলকুল ভুলে গেছে ওসব স্যালী ফ্যালীকে। তবে এ কথা ঠিক নেশাটা ফর্সা হ'য়ে যাবার পর রেড নিশ্চয় খুব ক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি ও করেছে। তারপর যাহা বাস্তব, তাহারই পায়ে দণ্ডবৎ। পিছনের স্বপ্ন পিছনেই থাকুক।"

নেইলসনের মাথা থেকে কিন্তু কাহিনীটা বিদায় নিলো না। বরং সেটা পল্লবিত হতে হতে বনজ জগতে স্বাবলম্বীভাবে দাঁড়িয়ে যায়। তার দুর্বল শরীরে অন্তর্জগতের ভূমিকা বিশাল—যেখানে ক্রমশই রেড ও স্যালীর প্রভা।

রেডের কাল্পনিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য তাকে পীড়িত করছিল। অর্থ-নৈতিক প্রতিযোগিতামূলক বহির্বিশ্বের কথা যেমন তেমন, এই উন্মুক্ত প্রাকৃতিক রাজ্যে পুরুষের রূপ ও স্বাস্থ্যের কদর নারীর কাছে সর্বাধিক। নেইলসন জানে. তার কুৎসিৎ রুগ্ন শরীরে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, হয়তো আর কিছুকাল এখানে থাকলে কিছুটা লালিত্য সে পুনরুদ্ধার করতে পারবে। বয়ঃসন্ধি জনিত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে প্রেম ও সুন্দরী সমভাবে তার বুকে অনুরণন তোলে। সে উচ্চাশার তাগিদে এতকাল কোন নারীকে আবেগ দিয়ে ভালোবাসেনি, আবার কোন যুবতীর উষ্ণ সোহাগ ও লাভ করেনি। রেড ও স্যালীর প্রেম কাহিনী। রেড ও স্যালীর প্রেম কাহিনী নতুন দিগন্তের সন্ধান দিলো যেন! এই প্রেম, তার মনে হলো, অপার্থিব এবং সর্বাধিক সৌন্দর্যময়।

আসলে যুবক নেইলসন তখন নিজেই নায়কের ভূমিকা পেতে আগ্রহী। কখনো কখনো মনে হয়, এটা তার বে এক্তিয়ার। কিন্তু উচ্ছ্বাস সমস্ত যুক্তিকে ভাসিয়ে দেয়।

আবার সে স্যালীর কুটিরের কাছে গেল। ঘুরে ফিরে বেশ কয়েক-বার। স্থানীয় লোকদের ভাষা ইতিমধ্যেই তার আয়ত্তে ; সম্ভ্রান্ত ঘরের বিদ্বান সন্তান—ভাষাকে উপজীব্য ক'রে থিসিস্ তৈরি করেছিল। এতদেশীয় ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমা সহজেই তার রপ্ত হলো, মায় স্যামোন ভাষার উপর একখানা বই লেখাতেও হাত দিলো সে এই সময়।



সুতরাং, ভাষাশিক্ষার তোয়াক্কা না করা অজুহাতে স্যালীর সঙ্গে সে আলাপ জমালো। প্রথম প্রথম স্যালী প্রায় কথাই বলতো না, কিয়ৎ দূরে দাঁড়িয়ে সাহেবের মুখের নিখুঁত উচ্চারণ শুনতো। তার কোন বান্ধবী ছিল না, পার্শ্বচর ও ছিল না, একজন বনেদী শ্বেতাঙ্গের নিয়মিত উপস্থিতি খারাপ লাগতো না। গালে হাত দিয়ে সে জনারণ্যের গল্প শুনতো। কখনো কখনো নেইলসনের মুখে কোন মজাদার উক্তি শুনে এক ঝলক হাসি ও হেসে ফেলতো। সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ বিস্ময়ে কথা হারিয়ে যেত নেইলসনের, শরীরের ভেতর একটা আর্তনাদ টের পেতো।

এই স্যালী একদিন নেইলসনকে তার ডেরায় আমন্ত্রণ জানালো।

পুলকিত নেইলসন দেশিয় প্রথায় আপ্যায়িত। স্যালীর হাতে পাকানো চুটায় সে যখন দীর্ঘ টান দিলো, স্যালীর যেন ঘোর লেগে যায়—এ যে ঠিক রেডেরই মতন বুক ভরে ধোঁয়া নিচ্ছে। তারপর নেইলসন যখন ঢক ঢক ক'রে দেশী মদ 'হাভা' খেতে লাগলো, স্যালী আর থাকতে না পেরে তার খুব কাছে এসে বসে। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে থাকায় নেইলসন তার কাঁচা আপেলের মতন স্তন দেখতে পাচ্ছিলো। মসৃণ ত্বক ও খয়েরী নাভিপদ্ম—নেইলসনের নিঃশ্বাসে হলকা। যদি ও তার মনের উপর দিয়ে অনেক তাণ্ডব বয়ে গেছে, যদিও মৌকা পেয়ে এক শয়তান একবার ওকে সাংঘাতিক ভাবে ধর্ষণ করেছে, যদিও রেডের ঔরসে ও একটি মৃত শিশুর জন্ম দিয়েছে, তথাপি স্যালী বুঝি এক আশ্চর্য পবিত্রতার মূর্তি, বুঝি সে তখনো অনাঘ্রাত কুমারী।

নেইলসনের ভাবান্তর খেয়াল করছে না স্যালী; সে আরো সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি তাকে কখনো দেখেছো ?"

"কাকে ?"

"রেড।"

"না।"

"সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় এই নামের কোন লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি।

'না।"

"ও।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার ব্যবধানে সরে গেল স্থালী।

হাহাকারে বুক ফেটে যাচ্ছিলো নেইলসনের।

উপায় নেই।

ভীষণ ছটফট করছে নেইলসন। আর আত্মপ্রবঞ্চনা সম্ভব নয়—স্থালীকে আমি ভালোবাসি। বুকের মধ্যে পুষেরাখা এর চেয়ে বড় পাথর আর হয় না। এ অবস্থায় প্রথম প্রথম সকলেই যেমন করে থাকে, নেইলসন ও তাই করলো; অর্থাৎ সে চেষ্টা করতে লাগলো স্থালীর সংস্পর্শ এড়িয়ে যাবার। কিন্তু সেটা দুনিয়ার অসম্ভবতম কাজের একটি। পরিষ্কার বুঝতে পারে, তার মন, চোখ-পা সব কেবল সেদিক পানে যাই যাই, ছুঁই ছুঁই। তখন সে নিজেকে বোঝাতে লাগলো, আমি যে স্থালীকে ভালোবাসি এটা ওকে কোনদিনই বুঝতে দেবো না। আমি ওর কথা শুনে ও আশ্চর্য হাসি দেখেই তৃপ্ত থাকবো। নিজের মুখে প্রেম জানাবার মতন অবস্থা তো আমার নয়। আর যেন প্রেম একান্ত পরিণতিহীন, তাকে প্রকাশ করে কি হবে? ডাক্তাররা তো বলেই দিয়েছেন, চারদিক থেকে আমার বিপদ ঘনিয়ে আসছে—পরমায়ু আর মাত্র এগারো মাস।

কিন্তু ডাক্তারদের বিধান ব্যর্থ হলো। মৃত্যুকে যে কেবল দুই হাতে সরিয়ে রেখেছে নেইলসন তা নয় মৃত্যুর পদধ্বনিও আর শুনতে পাচ্ছে না। অসাধারণ পরিবেশের প্রভাব মানুষের শরীরের উপর এত ক্রীয়াশীল। সামুদ্রিক বাতাস, প্রচুর অক্সিজেন পরিমিত আহার, বনজ

পথে বিহার, রাত্রে সুনিদ্রা—এসব কি চাট্টিখানেক কথা ! রুগ্ন নেইলনের শরীরে জেল্লা বাড়ে, তার দুই চোখের কোনে যে হতাশা ছিল তা কেটে গিয়ে দুটো ঝকঝকে চাঁদ যেন উকি ঝুঁকি মারে ; এখন অনেক দ্রুত পা চালিয়ে স্যালীর আস্তনায় যায়, অন্ধকারে মিশে যাওয়া বিপজ্জনক সেতুটা পার হয়। একেই নির্ঘাত বলে নবজীবনপ্রাপ্তি, এমনি অলৌকিকভাবে কারুর কারুর ক্ষেত্রে মৃত্যু কাছে এসেও দূরে সরে যায় !

শারীরিক দিক থেকে বর্তমান ক্রমশই নির্বিঘ্ন, প্রতি রাতে যে ঘুসে ঘুসে জ্বর তার স্বপ্নকে অদৃষ্টের পরিহাসের মতনই করুণ ক'রে তুলেছিল তারা আর আসে না। বুকে শ্লেষ্মার প্রাধান্য এখন কমতির দিকে, হাড় মাস-রক্ত ক্রমবর্ধিষ্ণু। গত দু'মাসে একবারও কাশির সঙ্গে টক টকে রক্ত ছিটকে আসেনি। এখন যখন সে উঠে দাঁড়ায়, তাকে একজন সুস্থদেহী যুবক বলেই মনে হয়, যার সামনে অবারিত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল হাতছানি। অসাধারণ মেধাবী নেইলসন নিজের অসুখ সম্পর্কেই পড়াশুনা শুরু ক'রে দিলো এবং তার ধারণা দৃঢ় হলো, কোন রোগই চূড়ান্ত নয়—এক পরিমণ্ডল থেকে অন্যপরিমণ্ডলে বিচরণ মারফৎ মানুষ এই সমস্ত দুষ্ট জীবানুদের জব্দ ক'রে রাখতে পারে। আর মানুষের আয়ু সম্পর্কেও যত্রতত্র ভবিষ্যৎ উচ্চারণ করাটা মূর্খতার সামিল। পাণ্ডিত্যের বোঝা নিয়েও সে কবিতামনস্ক এবং কবিতার উৎসমুখ নিঃসন্দেহে এই প্রকৃতির চেয়েও বড় স্যালী। রেডের আগ্রাসী ভাবনা স্যালীকে যেন বিমনা ক'রে রাখতে না পারে, নেইলসন সচেষ্ট।

নিজের অসাবধানতায় সে একদিন বলে ফেলেছিল, "রেড আর ফিরবেন না।"

সঙ্গে সঙ্গে স্যালী বলেছে, "কেন আসবে না ?"

"অনেক দূরে চলে গেছেন। ফিরে নাও আসতে পারেন।"

"আমি প্রতীক্ষায় থাকবো।"

স্যালীর কঠিন জবাব।

তবু নারীকে কাছে টানবার, নারীর মনকে আবিষ্কার করবার নেশায় নেইলসন একেবারে টান টান।

"তোমার মতন সুন্দরী আমি আর দেখিনি!

—নেইলসনের কথায় স্যালী সামান্য চমকে ওঠে, দৃষ্টি সন্দিগ্ধ।

"মেয়েদের সম্পর্কে আমি অনেক তত্ত্বকথা জানি, কিন্তু আমার জীবনে জ্বলজ্যান্ত নারী বলতে কেবল তুমি-ই।"

—নেইলসনের আকুলতায় বিহ্বল দেখায় স্যালীকে। এই লোকটা সাধারণ নয় ঠিকই, ওর চোখে মমত্ব আছে এবং কোন গোপন চাবিকাঠির সাহায্যে ও ক্রমশই প্রাণবন্ত প্রাঞ্জল হয়ে উঠছে। কিন্তু রেড…রেড …রেড…সেই অপ্রতিরোধ যাদুবাতাবরণ যাবতীয় সহমর্মিতাকে স্তব্ধ করে দেয়।

চিত্তচাঞ্চল্য সত্ত্বেও টুকিটাকি সর্ত মিলিয়ে সে ভবিষ্যতের ছকটা তৈরি করে ফেলে। শব্দের গোঙানি শুনতে শুনতে এখানেই পাকাপোক্ত, সদিচ্ছা প্রণোদিত আদিবাসীদের সহায়তায় নারিকেল ব্যবসা, তার নিজস্ব সবুজবিথির মধ্যে এক রূপসী পথচারিনী, কর্তার বায়বীয় কল্পলোকে যার অক্ষতযোনি নির্ভেজাল আর কি! শরীরের সমস্ত কালো দাগ মনের সাহায্যে ঘষে ঘষে তুলতে হলে কথঞ্চিৎ আধুনিকতার ছোঁয়চও আনতে হবে, যে কারণে একটা পিয়ানো আনিয়ে নেবে সে; বিশ্ববিদ্যালয়ের নিঃশব্দস্মৃতি কিছু খুব সূক্ষ্ম সুরজালে ছড়িয়ে দেবে ঘরে, ঘরের বাইরে, নারিকেল ও দ্রাক্ষাবনে। আর আনাবে প্রচুর বই যে বইয়ের নেশা আর রক্তের ডাক, হেন বিষয় নেই যার প্রতিনিধিত্বমূলক বই তার থাকবে না।

তবু ইত্যকার প্রয়াস সাধ সমস্ত কিছুই অস্বচ্ছ হয়ে যায় একটিমাত্র জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে—স্যালী। সুন্দরী, তোমার প্রোফাইলের ভাবী পুরুষ করে নাও আমাকে, আমাকেই।…নেইলসনের বোধশক্তির অভিজাত মেধা, যা অনেকদিন দৃপ্ত উল্লাসে অহঙ্কারী ছিল, এই আদিবাসিনী পায়ে নিছক নিহিত বিষাদ। বিবিধ গাছ-গাছালি, পাখ-

পাখালি, জালপাই বনে সেই একই শপথ তথা প্রার্থনা—আমি স্যালীকে চাই।

নেইলসন স্যালীকে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে চায়। কেবল ওর শরীর নির্ভর সৌন্দর্য নয়, এমন শান্ত গভীর মানসিকতাকেও সে আকৃষ্ট করতে চায় কেবল নিজেরই দিকে। একটি সুউচ্চ দুর্গম পর্বত শীর্ষ বিজয়ের চেয়েও কঠিন কাজ। এই ধরণের বাসনা, যা সে কিছুকাল আগে কল্পনাও করতে পারতো না, তাকে সর্বোতভাবে গ্রাস ক'রে নিচ্ছে।

নেইলসন স্যালীকে প্রস্তাব দিলো তার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনে।

স্যালী যথারীতি প্রবলভাবে ফিরিয়ে দিলো সেই প্রস্তাব। স্যালীর অস্বীকৃতিতে কোন বিস্ময় ছিল না, বরং নেইলসন এমনটিই আশা করেছিল। এক কথায় ঢলে পড়বে, কোল পেতে দেবে—এমন মেয়ে সে নিশ্চয় নয়। অথবা, বলা চলে, এই মানসিকতার জোরেই স্যালী নেইলসনের কাছে অপ্রতিরোধ আকর্ষনীয়া।

আবার নেইলসন এটাও জানতো, নানাভাবে সঙ্গতিতে-অসঙ্গতিতে চাপ সৃষ্টি করতে পারলে, বিবিধ তরফ থেকে আবেদন অব্যাহত রাখতে পারলে স্যালীর মানসিক প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন আসতে বাধ্য এবং এক একসময় সে রাজি না হ'য়ে পারবে না। পৃথিবীতে কোন রক্তমাংসের যুবতী প্রেমাসক্ত যুবকের ক্লান্তিহীন আবেদন সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করতে পারে?

প্রেমিক নেইলসন চতুর হ'য়ে উঠলো। স্থানীয় অধিবাসীদের অন্তরঙ্গ হবার জন্য সে তার সাহেবিয়ানাটা ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছিল, এবার ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের কায়দায় ওদের সামনে কাঁদনি গাইতে শুরু করলো: স্যালীর এই দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কি বা বয়স! এরই মধ্যে এমন ক'রে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে কেন? স্থানভ্রষ্ট

জাহাজী আবার স্বস্থানে ফিরে গেছে। খুবই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমি সেই লোক, যে এই দ্বীপ ছেড়ে কোনদিন যাবে না, যে আপন স্নেহ ও প্রেম দিয়ে স্যালীর সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ করে দিতে উন্মুখ।

নেটিভদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল।

হু, মানুষের মতন মানুষ বটে, এ দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা আছে, অল্পেতে ধৈর্য হারায় না।

স্যালী যতই সুন্দরী হোক, সে পরিত্যক্তা ও ধর্ষিতা; তাকে যে আবার কোন শাদা চামড়ার লোক বিয়ে করতে চাইছে—এটাই তো ধন্য ধন্য রব পড়ে যাবার মতন ঘটনা! পরে যদি বয়ে যাওয়া দিনস্রোতে আবার তিক্ততা ভেসে আসে, তবু স্যালীর উচিত নয় এই সুযোগ হাতছাড়া করা। আদিবাসিনীদের মধ্যে শাদা মানুষদের প্রতি প্রবৃত্তির ঔচিত্য বিচিত্র,—এরা সচরাচর কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দাবিকে অস্বীকার করে না। নেইলসন তো বলছে স্যালীকে সে বিয়ে করবে —স্যালী তবে বড় চাঁদ কপালী মেয়ে! আর কোন দৃকপাত করা উচিত নয়।

দলে দলে হিতাকাঙ্খীরা এসে স্যালীকে বোঝাতে থাকে: বোকা মেয়ে, এখুনি রাজি হয়ে যা। ছোকরা সত্যি তোর প্রেমে মজেছে। তোর জীবনে একটা স্থিতি আসবে, জীবন পুনর্গঠিত হবে। স্যালীর প্রতিরোধ কঠিন, কিন্তু একেবারে নিরেট নয়। নেইলসনের অতিশয্য এবং নেটিভদের ক্রমাগত চাপ এক সময় তাকে নতিস্বীকার করায়; শান্ত নীরবতার সঙ্গেই সে তার সম্মতি দিলো।

স্থানীয় প্রথায় বিয়ে হয়ে গেল! বসন্তী হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে প্রায় মাতাল নেইলসন প্রথমেই প্রচণ্ড কামের সঙ্গে গ্রহণ করলো স্যালীকে। বিধি-নিষেধের পুঁজি তো ফতুর হয়ে গিয়েছিল। এখন স্যালীকে নগ্ন ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো নেইলসন, জনান্তিকে বললো: আহ্ কী পর্যাপ্ত সম্পদ! এখনো যেন সব কিছুই ঠিক ঠিক রয়েছে।

স্যালীর কোন প্রতিরোধ নেই, আবার কোন সাড়াও নেই,. কেবল হিম গভীর চোখে অন্তর্দৃষ্টি, ঠিক একটি পাথর প্রতিমার মতন তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর বিছিয়ে আছে, যার অবিসংবাদী গভীরতায় একক প্রয়াসে নিজের তৃপ্তি টেনে তুললেও যেন যথার্থ শ্লাঘনীয় সুখ অনুভব করতে পারছে না নেইলসন। একবার, দু'বার,···অনেকরার··· পিরামিডের শীর্ষে উঠেও আকাশের নাগাল পাওয়া যায় না।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিস্ময়ের মায়াজাল আর নেই। বিব্রত নেইলসন দেখলো, তার অকপট অফুরাণ সোহাগ সত্ত্বেও স্যালী এক মুহূর্তের জন্যও রেডকে ভুলতে পারছে না। সব সময়ই অতীতের তির্যক রেখাগুলি তার চোখের উপর খেলা করছে। গাছের দিকে চেয়ে থাকে, সাঁকোর বুকে রেডের পদধ্বনি শুনতে চায়. সামুদ্রিক বাতাসে কান পেতে সেই হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার হাসি কামনা করে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে মেনে নেওয়া চলে যে, রেডকে বিলকুল ভুলে যাওয়া স্যালীর পক্ষে অসম্ভব। এ ব্যাপারে নেইলসনেরও কোন মতদ্বৈত ছিল না ; কিন্তু তাই বলে বাস্তব ও বর্তমানের প্রতি এমন উপেক্ষার কোন অর্থ হয় না! নেইলসনের বুকে বিরক্তি ও অভিমানের বাষ্প জমতে থাকে। স্যালীর সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে পিছিয়ে আসে, তার বুদ্ধির দীপ্তিও যেন অনেক কমে আসে!

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা ছোটখাটো বিপর্যয় ঘটলো।

তাদের শুকনো ঘরে হঠাৎ আগুন লাগলো। বাতাসের সহায়তায় মুহূর্তে দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে থাকে ঘরের চাল, কাঠের খুঁটি, কড়ি—বর্গা। স্যালী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ; আর অভাবিত উৎফুল্লতার সঙ্গে নেইলসন অনুভব করে রেডের একটা বড় স্মৃতি পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। পড়ুক, পুড়ুক···ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে সে ঐ আগুনকে নিভিয়ে দেবার কখনোই চেষ্টা করবে না।···

আগুন নিভে যাবার পর নতুন আবাস নির্মান করলো নেইলসন। আর সেই জায়গায় নয়, সরে এসে, সমুদ্রের অনেকটা নিকটে, এখানে— এই বাংলো ! আধুনিকতার কাছাকাছি, সুমসাম, আকর্ষক।

কিন্তু বিকারের বিভীষিকা দূর হলো কোথায় ? স্যালী আরো কঠিন আরো হিম। নেইলসন তার প্রয়োজন মতন ওর শরীরটাকে গ্রহণ করে, কিন্তু ওর রেডনির্ভর চেতনার বনিয়াদটাকে আর ধ্বংস করতে পারলো না। সময় সময় স্যালীর শরীরটাকে নিয়ে সে যা করে, তা প্রায় এক গুহাবাসী আদিম মানুষের সামিল। তবু তো বরফ আর গললো না। নির্মম নেইলসন শেষে নিজেকে গুটিয়ে নিলো। রাশি রাশি বই আনলো, পিয়ানো এলো। দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই সে ঐ বইয়ের জগতে ডুবে থাকে, কখনো কখনো শিকার নিয়ে ফিরে আসে, পাথর প্রতিমার সামনে রক্তাক্ত সামুদ্রিক হাঁস ছুঁড়ে দেয়। কোন ভাবান্তর নেই। স্যালী রান্না করে রাতে নেইলসনের পাশে শুয়ে দু'চারটে কথাও বলে কিন্তু রেডের ছায়াটা কখনোই তার উপর থেকে সরে যায় না।

এই ভাবেই যৌবন গেল, নেইলসনের কালো চুল সোনালী হয়ে এলো। শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে সে হাঁটে, বাণিজ্যিক তদারকি সারে, আদিবাসীদের সভায় উৎসবে প্রায় রাজার সম্মান আদায় ক'রে নেয়।

আর স্যালীও ক্রমে ক্রমে হারালো তার অসাধারণ সৌন্দর্য। তাল তাল চর্বিতে ঢাকা পড়ে গেল তার কমনীয়তা। কোথায় মিলিয়ে গেল সেই আশ্চর্য হাসি, গায়ের রং-ও রীতিমতন কালো হয়ে এলো। তবু কি স্যালী আজো রেডের প্রতীক্ষায় ?—কে জানে, আর ও নিয়ে চিন্তিত নয় নেইলসন। পারিবারিক জীবনের বিকট ব্যর্থতাকে সে আর এই শেষ বয়সে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করতে চাইছে না।

"তবু তো পিছু পানে তাকাতে হয়। যে দিনগুলি শেষ হয়ে'গেল, তা তো আর ফেরৎ আসবে না।···দেখুন, রেড ও স্যালীর প্রেম ও দুর্ভাগ্যজনিত বিচ্ছেদ কী ভাবে আমার জীবনটাকেও ব্যর্থ করে দিলো। দৈব কী নির্মম! ওঁরা কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু সেই কষ্টেরও একটা সৌন্দর্য আছে। আর আমার বেলায়? আমি কি পেলাম, বলতে পারেন?"

—নেইলসনের স্বরে বুকফাটা হাহাশ্বাস।

চোখমুখ মুহূর্তে থমকে যাবার পর ফ্যাসফেসে গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, "আপনাকে দেখে কিন্তু প্রথমে তা মনে হয়নি।"

আকুলতা বিদ্ধ গলায় নেইলসন বললো, "প্রেমের ব্যর্থতা কিন্তু মৃত্যু বা বিচ্ছেদে নয়। এই যে সারাটা জীবন স্যালী রেডকে তার বুকের মধ্যে পুষে রাখতে পেরেছে, এখানেই তো প্রেমের সার্থকতা আর ব্যর্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত হলাম আমি। সমস্ত ভালোবাসা নিবেদন করেও ঈপ্সিত নারীর মন পেলাম না। গোটা যৌবনকাল একটা পুতুলের সংসারে কাটিয়ে দিলাম।"

কথা বলতে বলতে নেইলসন ঈষৎ পিছনের দিকে হেলে পড়লো। তার গলায় দলাপাকানো যন্ত্রণা কঠোর, নিষ্ঠুর। কিছুক্ষণ সে চক্ষু মুদে স্থির হ'য়ে থাকে।

তারপরই চকিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা অস্বাভাবিক সম্ভাবনা দু'জনের মধ্যে থর থর কাঁপতে থাকে। একটা কালো পর্দা নোংরামি, হ্যাংলামি ইত্যাদি মেখে নাচছে। মাথার ভিতর অদ্ভুত কতগুলি ব্যাপার খেলা করে।

এতক্ষণ যদিও নেইলসন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলছিল, তার দৃষ্টি যথার্থ সজাগ হ'য়ে ওঠেনি, অর্থাৎ বহুক্ষণ যাবৎ সে খেয়ালই করেনি তার গল্প শ্রোতার পাথুরে মূর্তিতেও কোন ভাবান্তর আনতে পেরেছে কিনা।

কিন্তু এই মুহূর্তে তার যাবতীয় তীক্ষ্ণতা সামনে বসে থাকা পাহাড় প্রমাণ মানুষটার দিকে। একটা অতিকায় পাতাবাহারের মতন মুখ, লোনা জলে ঝলসে যাওয়া কাটাকুটি চামড়া, পেটের বহর আকাশচুম্বি হবার বাসনায়, সুন্দর রক্তাভ নোখগুলি ক্ষয়ে ক্ষয়ে জরাজীর্ণ। তবু-তবু এ সব ভণিতা মাত্র, প্রকৃতির রহস্যময় ভণিতা, নচেৎ···। নচেৎ একটা ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলো ওঁর থাক থাক চর্বি, বসিয়ে দাও পেটটা, সোনালী চুলের ফাঁকে ফাঁকে এখনো যে সব লাল চুলের অস্তিত্ব আছে, তাদের একত্রিত ক'রে থুবিয়ে রাখো, টান টান করে দাও মুখ ও কপালের বলিরেখাচর্চিত চামড়া এবং তখন সবিস্ময়ে পরখ করো ওর আয়ত দুই চক্ষুর পরিধি কি মনে হবে, বলো? বলো একটা মস্ত আয়নাকে ভেঙ্গে চূড়মার ক'রে দিয়ে আবার ভাঙ্গা অংশগুলিকে তুলে তুলে এনে পূর্বস্থানে জোড়া লাগালে যেমনটি হবে, ঠিক তেমনটি।

প্রচুর অভিসঙ্কেত সমেত দমবন্ধ নীরবতা।

প্রায় অবাস্তব এক সন্দেহ নেইলসনকে শুষে নিচ্ছে। নিজেকে খুব দুর্বল মনে হচ্ছে তার। বহুকাল বাদে বুকের ভেতর আবার সেই রক্তাক্ত মোচড়। কিসের পূর্বলক্ষণ? জীবনের নিত্য নিয়োজিত অনুষ্ঠান কি শেষ হয়ে এলো?···কিন্তু এর একটা জবাব চাই-ই।··· অসম্ভব, অসম্ভব, তবু তার সেই প্রখর অনুভূতি বহুকাল পর জাগ্রত হ'য়ে পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছে—ইনিই নায়ক!

"ক্যাপ্টেন, আপনার নাম?"—নেইলসনের বেমক্কা জিজ্ঞাসাটা তীরের বেগে ছুটে আসে।

ক্যাপ্টেনের মুখের চামড়া শতধা কুঞ্চনে তুবড়ে যায়, তারপর এক ঝলক তিক্ত হাসি। তাঁকে দেখাচ্ছে বিদ্বেষপরায়ণ, কুৎসিৎ, অশালীন একটা হীনস্বভাব লোকের মতন।

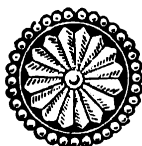
তিনি দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিলেন, "অনেককাল আগে আমার একটা উপাধিসমেত নাম ছিল বটে। কিন্তু এখন আমি সেই নামটা নিজেই স্মরণ করতে পারবো না। গত ত্রিশ বৎসর ধরে একাধিক

জাহাজে, বিভিন্ন বন্দরে, বারে রেঁস্তরায় এবং এই সমস্ত দ্বীপে একটা নামেই আমাকে সকলে সনাক্ত করে থাকে—এবং তা হলো রেড!”

অত্যন্ত বিপর্যয় মূলক বিস্ফোরণ! কী কুৎসিৎ সরীসৃপ হাসি আত্মপ্রসন্নতায় চুইয়ে চুইয়ে নামছে!

বিক্ষোভ বিলোড়িত নেইলসনের দুই চক্ষু দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। ঘৃণায় প্রতিহিংসায় তার দুই হাত নখর হ'য়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু থাবা বসাবার আগেই তাকে থমকাতে হলো, যেহেতু সে দেখলো—

রেড, যিনি ভয়ঙ্কর রকম দানব হ'য়ে উঠেছিলেন, ক্রমশঃ কেমন কুঁকড়ে যাচ্ছেন—তাঁর রক্তাভ দুই চোখ বেয়ে কয়েকফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো চিবুক বেয়ে। প্রাণপণ প্রয়াসে তিনি তাঁর আলোড়নকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন।



বিস্ময়াভূত আরো কিছুটা সময় নীরবে গড়িয়ে গেল।

তার তখনই মুহূর্তকয়েকের জন্য নৈষ্ঠিক পারিবারিক তাগিদে এ ঘরে এসে ঢুকলো একজন বয়স্কা নেটিভ মহিলা। অনেকখানি লম্বা, কিন্তু বড় মাংসল, মাথাভর্তি চুলে রীতিমন পাক ধরেছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নেটিভ মেয়েদের যেমন হয়ে থাকে, বাদামী রং এখন যথেষ্ট কালো, বিশাল দুটো বয়স্ক শিথিল স্তন সামান্য বাঁধনে শিথিল। সময়টা মূল্যবান। সময়টা কি সত্যি এখন মূল্যবান নয়?

মেয়েমানুষটি ফিস ফিস ক'রে কি যেন বললো নেইলসনকে এবং নেইলসনও চাপা স্বরে উত্তর দিলো—নিছক প্রাত্যাহিক পারিবারিক চিত্র। রেডের দিকে নারীর দৃষ্টি নিস্পৃহ, সামান্য ছুঁয়ে গেল মাত্র। সে চলে গেল

নেইলসন ঘন নীরবতার মধ্যে কেঁপে উঠলো, "ক্যাপ্টেন, আপনি যদি আজ আমাদের এখানে থেকে আতিথ্য গ্রহণ করেন, আমি খুব খুশি হবো।"

"তা সম্ভব হবে না," রেড বললেন, "আমাকে চটপট কাজগুলি সেরে জাহাজ ছাড়তে হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাল পত্তর তোলা শেষ হলে কাল খুব ভোরেই জাহাজ ছাড়বো। আমি দুঃখিত।"

"আমি আপনার সঙ্গে একটি ছেলেকে দিয়ে দেবো। সে পথ চিনিয়ে দেবে।"

"তা হলে তো ভালোই হয়।"

রেড চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

নেইলসন একটি স্থানীয় ছেলেকে তাঁর সঙ্গে পাঠালেন।

ছেলেটার পিছু পিছু খুব সতর্কতার সঙ্গে সাঁকোটা পার হতে থাকেন রেড।

"দেখবেন পড়ে যাবেন না যেন"—নেইলসন চিৎকার ক'রে উঠলো।

"জীবনে অমন দৃশ্য দেখতে পাবেন না"—রেড গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন।

সবুজ বনের আড়ালে হারিয়ে গেল দুই মূর্তি।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চিত্রার্পিত নেইলসন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই সেই লোকটা! এমন স্থূল, এমন যান্ত্রিক। অথচ, এই লোকটাই অলক্ষ্যে থেকে তার যৌবনকালকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে তার সংসার, তার সুখ, তার সম্ভাবনা…।

আত্মগ্লানিতে রি রি নেইলসন স্যালীর ডাকে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে।

"লোকটা কিসের জন্য এসেছিল?"—স্যালীর জিজ্ঞাসা।

নিজেকে সংযত রেখে তিক্তস্বরে বললো নেইলসন, "ও একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন।"

"ও।"

"আমার জন্য খবর নিয়ে এসেছিল। আমার দাদা খুব অসুস্থ, মৃতপ্রায়। আমাকে যতশীঘ্র সম্ভব ফিরে যেতে হবে।

স্যালীর ঠাণ্ডা দৃষ্টি নেইলসনের মুখের উপর, "তুমি কি ঐ ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই ফিরে যাচ্ছো?"

নেইলসন জবাব না দিয়ে কেবল দুই কাঁধ ঝাঁকালো।

স্যার ওয়াল্টার স্কট

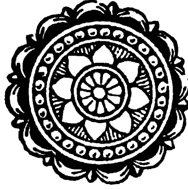
মেরী, কুইন অব স্কটস্

[স্কটল্যাণ্ড]



ভাষান্তর ঃ

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়



ফরাসী রাজের বিধবা উত্তরাধিকারিনী আর স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাধিকারসূত্রে রাণী, মেরী স্টুয়ার্টকে নিঃসন্দেহে তার সমকালের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আর চৌখস মহিলা বলায় কোন বাধা নেই। সত্যিই অপরূপা ছিলেন তিনি - মুখ ছিল অনিন্দ্য সুন্দর, তনু দীর্ঘায়িত আর সুগঠিত। চলন ভঙ্গীতে ফুটে উঠত মনোহরা গতি, অশ্বারোহণ আর নৃত্যেও পটিয়সী। সে যুগের রমনী শ্রেষ্ঠাই ছিলেন মেরী। ফ্রান্সে তার শিক্ষা ছিল অতি সতর্কতায় গড়ে তোলা। বেশ কয়েকটা ভাষায় ছিলেন তিনি পারদর্শিনী, আর শাসনের কাজেও তার এমন দক্ষতা ছিল যে স্বয়ং তার স্বামীও মাঝে মাঝে ওর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। মেরীর সৌন্দর্য বিকশিত হতে চাইতো ওর নিদারুণ অনুকম্পা বোধে আর স্বভাবসুলভ খুশির মধ্যে দিয়ে—মাঝে মাঝে মনে হতো একটু যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন তিনি। স্কটল্যাণ্ডে ফিরে আসার মুখে ওঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি, আর সেটাই ওর রূপলাবণ্যের প্রথম কথা। কিন্তু প্রজাদের কাছে ওঁর একমাত্র খুঁত ছিল ওঁর ক্যাথলিক ধর্ম। ওই ধর্মের আওতাতেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। তবু মোটামুটি দেশের লোক আশা আর আনন্দের দোলায় যেভাবে তাঁর প্রত্যাবর্তন চাইছিলো মেরী নিজেও সে ভাবে বুঝি চাইতে পারেননি। তাদের সে চাওয়া হয়তো ছিলো ফরাসী দেশের আবহাওয়া আর রাজসভার রমরমা অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মেরীর নিজের দেশের ঝড়ো ও ঘোলাটে রাজনৈতিক আবর্ত সম্প্রসারণের নিমিত্তে।

১৬৬১ সালের ১৫ই আগষ্ট। মেরী ফ্রান্স থেকে জাহাজে সুরু করলেন তাঁর যাত্রা। মনে এক বিচিত্র আশঙ্কা ভরা কল্পনা নিয়ে রাণী ওর জাহাজের বুকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের উপকূল ভূমির দিকে নজর মেলে রেখেছিলেন। ফ্রান্সের সীমারেখা ওর দৃষ্টিপথ থেকে আড়ালে সরে

যেতেই বেদনা মাখা গলায় রাণী বলে উঠলেন, 'বিদায়, বিদায় আমার প্রিয় ফ্রান্স, আর জীবনে কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

১৯শে আগষ্ট। তিনি লীথে পৌঁছলেন—কিন্তু তাকে রাজকীয় ভাবে সম্বর্ধনার কোন ব্যবস্থাই কেউ করেনি। রাজধানীতে যে কজন অভিজাত মানুষ ছিলেন, তারাই শুধু ছুটে এলেন নবীনা তরুণী এই রাণীকে তার পূর্ব-পুরুষদের আবাসস্থল হোলিরুড প্রাসাদে এগিয়ে নিয়ে যেতে। রাণী আর তাঁর ট্রেনকে এডিনবার্গে এগিয়ে নিতে ঘোড়া অবশ্য পাঠানো হয়েছিলো—কিন্তু হায়! সেগুলো জরাজীর্ণ শীর্ণকায় কিছু টাট্টু ঘোড়া মাত্র। আসনগুলিও তথৈবচ!

বেচারি মেরী! ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠল ফ্রান্সের চমৎকার ঘোড়া আর তার চটকদার উপকরণের দৃশ্য। আর কি অপূর্ব ফ্রান্সের রাজসভার জাঁক জমক। নিজের অজান্তেই মেরীর দুচোখ জলে ভরে উঠল।

ততোক্ষণে প্রজারা জমায়েত হয়েছে। তারা তাদের রাণীকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল। প্রায় শ'দুয়েক এডিনবার্গবাসী মানুষ তাদের রাণীকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যেই মেরীর জানালার নিচে দাঁড়িয়ে সারারাত ধরে বাজিয়ে চলল তিন তারের বেহালা। তাতে না ছিল ছন্দ, না সুর। বেচারি মেরী সারারাতই ঘুমুতে পারলেন না। তবুও প্রজাদের ধন্যবাদ জানাতে হল।

দেশে পৌঁছনোর পরমুহূর্তেই মেরী তার প্রজাদের ধর্মীয় মনোভাবের সামান্য কিছু উদাহরণ পেয়েছিলেন। নিজের গির্জায় কিন্তু উপাসনার আদেশ দিয়ে ছিলেন মেরী—ব্যবস্থাপনায় ছিলেন এক পোপের যাজক। কিন্তু প্রজাদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ জেগে উঠল—শেষ পর্যন্ত সেন্ট এ্যাণ্ড্রুজের প্রধান যাজক মেরীর সম্পর্কিত এক ভাই, হস্তক্ষেপ না করলে বেচারি ওই যাজক বোধ হয় নিজের আসনেই মারা পরতেন।

মেরী ওঁর রাজত্বের প্রথম দিকে খুব দূরদর্শিতার প্রমাণ রেখেছিলেন। ওঁর মাধুর্য আর অনুকম্পায় তিনি সাধারণ মানুষকে একেবারে বশ

করে ফেলেছিলেন। আবার রাজসভায় রাজকার্য চালানোর সময়ও মেরী রাখলেন চমৎকার প্রাজ্ঞের পরিচয়। কূটনীতিকরা এতে চমৎকার প্রসংশাও করলেন মেরীর। নিজের ধর্মের বিপরীত হওয়ায় প্রজাদের ধর্মীয় কোন কাজে মেরী চট করে হাত দিতে চাইতেন না। আর এরকম কোন ব্যাপারে সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুজের যাজকের পরামর্শ নিতেও ভুলতেন না। মেরীর এ কৌশল খুব কাজে লাগলো—প্রজারা তাকে ভালবাসতে সুরু করল।

ঠিক এমন বুদ্ধি আর কৌশলেই মেরী সুসম্পর্ক রাখতে চাইলেন ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে। অবশ্য ইংলণ্ডের রাণীর কাছে নিজের সিংহাসন বিকিয়ে না দিয়েই—মেরী তার মুকুট এলিজাবেথকে দান করতেও রাজী হন নি। এছাড়াও ইংলণ্ডের সিংহাসনের উপর থেকে তিনি তার দাবীও ছাড়েন নি—কারণ এলিজাবেথ তার কোন উত্তরাধিকারী না রেখে যদি মারা যান সেক্ষেত্রে মেরীই হবেন উত্তরাধিকারিণী। তবে মেরী বললেন, 'এলিজাবেথ জীবিতা থাকাকালীন আমার কোন দাবী নেই।'

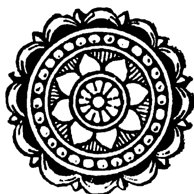
এলিজাবেথ সব শুনে চুপ করেই ছিলেন, তবে সন্তুষ্ট হন নি। আর এর পর থেকে আপাত বন্ধুত্বেরও অভাব হয়নি তুজন রাণীর মধ্যে। মাঝে মাঝেই তুজনের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান আর শুভেচ্ছা বিনিময়ের ও উপহার পাঠানোয় বিরতি ঘটেনি।

কিন্তু এসব ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষের কাছে মেরীর ধর্মমত এমনই ঘৃণার বস্তু হয়ে উঠল যে কোন ভাবেই তারা মেরীকে সহ্য করতে রাজী হল না। এঁরা হলেন সংস্কার বাদী কিছু মানুষ—এঁরা গির্জার মধ্যেও প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়তেন এর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করেও। তারা মেরীর নামও মুখে আনতেন না। জন নক্স নামে একজন তার বক্তৃতার মধ্যে মেরীর বিরুদ্ধে এমন প্রচার চালালেন যে মেরী তাকে ডেকে ভর্ৎসনা করতে বাধ্য হন। সংস্কার পন্থীরা যে এমন ক্রুদ্ধ হন

তার কারণও যে ছিলো না তা নয়, তারা মেরীকে বিশ্বাস করতে পারেনি। এটা স্বাভাবিক।

মেরী বলেছিলেন, 'পার্লামেণ্ট ১৫৬০ সালে যে ধর্মীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করেছে আমি কখনও তা মেনে নেবো না বা গির্জার জমিও বাজেয়াপ্ত করবো না।'

মেরী ভাবতেন সব ব্যাপারটাই সাময়িক, প্রয়োজন মত সুযোগ এলে সব কিছুই বদল করে নেওয়া সম্ভবপর। মেরীর ভাই, অবশ্য, যিনি ওই সময় তার প্রধান পরামর্শদাতা আর শ্রেষ্ঠ বন্ধু হিসেবে ছিলেন। তিনিই মেরীর হয়ে প্রোটেস্টাণ্ট পাদ্রীদের ওপর তার প্রভাব খাটিয়েছিলেন।



রাণী মেরীর রাজত্বকালে প্রথম ঝামেলা এলো ওর ভাইয়ের প্রতি অতিরিক্ত টান আর আগ্রহের ফলেই। মেরী তাকে আর্ল অব মার করেছিলেন। তবে আসল উদ্দেশ্য ছিল ভাইকে এই উপাধির বদলে আর্ল অব মোরে করে তোলা—আর তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের ওই জমিদারীর সব কিছুই ওঁর হাতে তুলে দেওয়া।

এই বিচিত্র লেনদেনের ব্যাপারটায় অবশ্য আর একজনের আঘাত না লেগে পারতো না, তিনি হলেন আর্ল অব হাণ্টলি। যিনি উত্তরাঞ্চলের একজন শক্তিমান জমিদার। মোরের জমিদারীর বিরাট অংশ সহ তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। আর্ল অব হাণ্টলি নিদারুণ সাহসী আর উত্তরে তাঁর প্রভাবও যথেষ্ট। ক্যাথলিক ধর্মে আসক্ত ভূস্বামীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

আর্ল অব মার অপর দিকে তার এই শত্রুর দর্প চূর্ণ করার ফিকির

খুঁজতেন। মেরীও হাণ্টলির শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আর বেশ ভীত ছিলেন। শেষ অবধি কুইন মেরী হাণ্টলিকে বশ্যতা স্বীকার করানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সসৈন্যে উত্তর স্কটল্যাণ্ডে তার অভিযান পরিচালনা করার ব্যবস্থা করলেন।

তরুণী রাণীর সৈন্য সংখ্যা তেমন ছিলনা। ওঁর ওই ছোট্ট সৈন্যদল নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। মাঝে মাঝে মাঠের মাঝখানে তাঁবু খাটিয়ে চলল বিশ্রাম। দৃশ্যগুলো মেরীর সাহসিকতা বাড়িয়ে তুলতে চাইল স্বভাবতই।

পারিপার্শ্বিকতা এমনই ছিল যে মেরী মুগ্ধ হয়ে বলেই ফেললেন, 'আঃ, আমি যদি পুরুষ হতাম।'

আসলে উম্মুক্ত মাঠের মাঝখানে রাত কাটানোর বিচিত্র অনুভূতি মেরীকে অদ্ভুত এক আবেশে ঘিরে রেখেছিল।

হাণ্টলিও চুপচাপ বসেছিলেন না। বিরাট এক সৈন্যদল গঠন করে তিনিও এগিয়ে চললেন এবার ক্যুইনের দিকে। মেরীর ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করার চেয়ে তার পার্শ্বদদের আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিল হাণ্টলির। তবে মেরীর ভাই, যিনি ইতিমধ্যে মারের বদলে আর্ল অব মোরে পদবী নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন দুর্দান্ত এক সৈনিক। মোরে তার বিশ্বস্ত কিছু লোকজন নিয়ে ফেয়ার হিলে হাজির হলেন—তিনি উত্তরের ওই উপজাতীয়দের তার সুশিক্ষিত সৈনিকদের সামনা সামনি হতে দিতে চাননি। পরবর্ত্তী ঘটনাতেই তার বিবেচনা শক্তির যুক্তি বোঝা যাবে।

হাণ্টলি এগিয়ে এসে ওর দোস্ত আর পরশীদের সামনে দাঁড়ালেন। কোন বাধা এলো না। বরং তারা এলোমেলো হয়ে মোরের প্রধান বাহিনীর দিকে পালাতে চাইলো। তাদের তাড়া করে চলল গর্ডনরা। তারা তাদের বর্শা ছুঁড়ে ফেলে তরবারি নিয়ে ওই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিশ্চিত জয়ের দিকে এগিয়ে চললো। ঠিক ওই সময়েই ওরা মোরের সুশিক্ষিত দৃঢ়চেতা বর্শাধারী সৈন্যদের সম্মুখীন হল। গর্ডনরা প্রচণ্ডভাবে

আঘাত আসায় শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলতে চাইলো। তারা এলোমেলো হয়ে এগিয়ে যেতেই উপজাতীয়দের সামনে পড়ে গেল। আর এটাই দারুণ সুবিধা এনে দিল মোরেকে। এতেই মোরের জয় সম্পূর্ণ হল। বিশাল দেহী হাণ্টলি প্রচুর অস্ত্রসজ্জিত থাকায় পালাতে গিয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে ঘোড়ার পায়ের প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হলেন।

হাণ্টলির জমিদারী দখল করলেন মোরে। মেরীও নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আবার এলেন।

এ পর্যন্ত মেরীর রাজত্ব ভালোই চলেছিল, কিন্তু এবার সামনে এসে দাঁড়াল একটা মারাত্মক সমস্যা। ওঁর কোন সন্তান না থাকায় প্রজাদের ইচ্ছা ছিল মেরী আবার বিয়ে করেন। রাণী এলিজাবেথ অবশ্য এর আগে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন তিনি বিয়ে করবেন না— অতএব স্কটল্যাণ্ডের মেরীই ছিলেন ইংলণ্ডের পরবর্তী, উত্তরাধিকারিনী। এটা অত্যন্ত যুক্তি পূর্ণ আর স্বাভাবিক যে মেরী রানী এলিজাবেথের পরামর্শ চাইবেন এরকম কোন ব্যাপারে। কারণ তারই স্থলাভিষিক্ত তিনি বা তাঁর সন্তানরা একদিন হয়তো হবেন।

এলিজাবেথ নিঃসন্দেহে সিংহাসনে আরোহণকারিনীদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ছিলেন, তা সত্বেও ওঁর নিজের আত্মীয়া মেরীর প্রতি ওর ব্যবহার আগা গোড়াই বেশ হিংসা আর ছলনা মাখা ছিল। এটা এলিজাবেথের সাধারণ চরিত্রের সঙ্গে মোটেও খাপ খায় না। এলিজাবেথের কাছে মেরী বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ চাইতেই তিনি একটার পর একটা যোগ্য মানুষের সন্ধান দিলেন। কিন্তু কাজে লাগানোর পূর্বক্ষণেই একটা বাধাও সৃষ্টি করতে লাগলেন! সব ব্যাপারটার মধ্যেই এলিজাবেথ একটা অত্যন্ত নোংরা কৌশল খাটাতে চাইছিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপারটা অন্যদিকে মোড় ঘুরলো। কুইন মেরী হঠাৎই পরিচিত হলেন এক তরুণ অভিজাতের সঙ্গে। তরুণটি ওর

পরিবার আর এমন কি এলিজাবেথের পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে খুবই কাছের। তার নাম হেনরি স্টুয়ার্ট, আর্ল অব লেনক্সের পুত্র লর্ড ডার্নলে।

তরুণ লর্ড ডার্নলেকে দেখে মেরী মুগ্ধ হলেন। শুধু এই নয়, মেরী সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন লর্ড ডার্নলের পিতা খুব অভিজাত হওয়ায় এই বিয়ে নিশ্চয়ই রাণী এলিজাবেথও খুশি মনে মেনে নেবেন।

এলিজাবেথকে মনে হল যেন তিনি বেশ খুশি মনেই প্রস্তাবটা শুনলেন। তাঁর আদেশেই তরুণ ডার্নলে আর তার পিতা লেনস্ককে স্কটল্যাণ্ডের রাজসভায় উপস্থিত হতে হল। এলিজাবেথ কিন্তু মনে মনে ভেবে রাখলেন বিয়ে হওয়ার উপক্রম হলে তিনি ঠিক সময়েই বাধা দেবেন, ওরা তারই প্রজা এই অজুহাত দেখিয়ে তাদের ফিরে আসতে বলে। এ আদেশ ওরা অগ্রাহ্য করতে পারবে না কারণ তাদের সমস্ত সম্পত্তি, জমি সবই ইংল্যাণ্ডে।

তরুণ ডার্নলে সত্যিই সুপুরুষ আর সুদর্শন। বাইরের রূপ আর চটকের অভাব ওর নেই। তবে অন্তরে ওর দৈন্য প্রচুর—বিচার বুদ্ধি, জ্ঞান, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কোনটাই তার ছিল না। একটা অদ্ভুত চরিত্র, আর অত্যন্ত ভাবপ্রবনতাই তাকে পেয়ে বসত। এই তরুণের যদি সাধারণ কিছু বুদ্ধিবৃত্তি আর কৃতজ্ঞতা বোধ থাকতো তাহলে মেরীর রাজত্ব সম্বন্ধে নতুন কাহিনীই হয়তো জন্ম নিত। কিন্তু মেরী ডার্নলেকে অন্য চোখেই দেখলেন। প্রথম থেকেই তার প্রেমে মশগুল হতে চাইলেন। দুর্ভাগ্যেরই কথা মেরী গোড়া থেকেই দুর্ভাগ্যবশতঃ ডার্নলের দিকে একরকম ঝুঁকে পড়লেন। ডার্নলের দিকে ঝুঁকে মেরী চাইছিলেন এলিজাবেথের কৌশল ব্যর্থ করে দিতে। আশ্চর্যেরই কথা, দুই রাণীর বাইরের আচরণে যতোই সৌজন্য আর আন্তরিকতার প্রকাশ থাকুক না কেন, দুজনের অন্তরের আচরণের মধ্যেই বিরাজ করছিল অতি মাত্রায় ঘৃণা আর ভয়।

মেরীর প্রেম আর সুবিধাদানের ফসল কুড়োলেন কিন্তু ডার্নলে। নিজের অবস্থা আরও দৃঢ় করে তোলার জন্যেই ইতিমধ্যে তিনি এমন একজন নীচ মানুষের বন্ধুত্ব লাভ করলেন, যার শোনা যায় মেরীর মনের উপর বেশ কিছু প্রভাব ছিল। লোকটি ছিল ইতালীয়, নাম ডেভিড রিৎসিও। রিৎসিও প্রথমে ছিল সামান্য একজন শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ —মেরীর পরিবারের সে ছিল পরিচারক। শেষ পর্যন্ত সে ফ্রান্সের সেক্রেটারীর বিশ্বস্ত পদ লাভ করেছিল। ভাগ্য একেই বলে। রিৎসিও'র সঙ্গীতে অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও ছিল, আর এর ফলে যখন তখন মেরীর সান্নিধ্যে আসায় ওর কোন বাধা ছিল না, কারণ মেরীও সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। ফলে রিৎসিও ক্রমে ক্রমে মেরীর মনের ওপর বেশ প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। অবশ্য মেরীরও প্রয়োজন ছিল একজন কাছাকাছি থাকা বিশ্বস্ত অনুচরের—যে ব্যবসাপত্র আর নানা ভাষায় দক্ষ হবে, যার মাধ্যমে মেরী বিদেশী সব রাষ্ট্রের সঙ্গে আর বিশেষ করে ফ্রান্সে তার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে পারবেন। স্কটল্যাণ্ডে এরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া নেহাতই কঠিন ছিল সন্দেহ নেই, শুধু মেরী একজন ক্যাথলিককে নিয়োগ করলে অবশ্য কথা ছিল না। তাতে ওঁর প্রোটেস্টাণ্ট শত্রুদেরই ক্রোধ জাগ্রত হত যা রিৎসিওকে নিয়োগ করলে হতে চাইতো না।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু এরকম একজন অজ্ঞাত আর ক্যাথলিককে আর নীচু তলার মানুষকে মন্ত্রীত্বের উচ্চতম আসনে বসানোতে—আর তার চেয়েও বড় কথা রাণীর পক্ষে তাকে দেওয়া পারিবারিক সুবিধাও অনেকে ভাল চোখে দেখেনি। এমন একজন বিদেশী, তার ওপর রিৎসিও সব সময়েই বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাব বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালাতে চাওয়ায় আর রাণীর বিশেষ নেক নজরে থাকার ফলে স্কটল্যাণ্ডের অভিজাত বংশীয় মানুষেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যেও খুঁব মুখরোচক নোঙরা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে ব্যাপারটা।

ডার্নলের মনে মনে একটাই চিন্তা। যে কোন ভাবেই হোক রাণীর কাছে নিজের প্রয়োজন আর প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে।

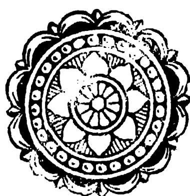
পথ এর একটাই ছিল—রিৎসিওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলা। রিৎসিও এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যতো রকমে সম্ভব ডার্নলের মনোরঞ্জন করতে সুরু করে দিল। ডার্নলের মনোস্কামনা পূরণের জন্যে সব কাজই সে করতে প্রস্তুত হল।

রাণীও মনে মনে নিজেকে বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে তুললেন। ডার্নলেকে তাকে বিয়ে করতেই হবে। কোন বাধাই তিনি মানবেন না।

মেরী তার ঘনিষ্ঠদের কাছে মনোভাব প্রকাশ করে বললেন, 'কোন বাধা আমি মানি না। এ বিয়ে হবেই, এই আমার ইচ্ছা। আর এটা হবে যত শীঘ্র সম্ভব।'

মেরী চুপ করে ছিলেন না। ইতিমধ্যেই তিনি প্রজাদের কাছে ডার্নলের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য প্রজাদের সমর্থন আদায় করা। সে কাজে তিনি সফলও হলেন। প্রজাদের বেশির ভাগ মানুষই রাণীর বিয়ে সমর্থন করলো।

রাণী এবার প্রকাশ্যে তার বিয়ের দিন ঘোষণা করলেন।



২৯শে জুলাই ১৫৬৫ সালের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। মেরী তার প্রেমাস্পদ সুদর্শন লর্ড ডার্নলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন এডিনবার্গের এক গির্জার অভ্যন্তরে।

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের কানে যখন বার্তা পৌঁছল কুইন মেরী সত্যিই এবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন, তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠলেন

ইংলণ্ডেশ্বরী, 'অসম্ভব, এ হাতে পারে না। এ বিয়ে বন্ধ করতেই হবে।'

এলিজাবেথ চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। কিন্তু এবার তিনি ব্যর্থ। তীব্র ঘৃণায় আর হিংসায় ছটফট করতে লাগলেন এলিজাবেথ। নেমে এলেন অতি সাধারণ হিংসুক এক নারীর পর্যায়ে এলিজাবেথ। আসলে ডার্নলের চেয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করলে ইংলণ্ডের পক্ষে এর ফল বেশি মারাত্মক হতো না।

আরও একজন অসন্তোষের আগুনে পুড়ে জ্বলতে লাগলেন। তিনি আর্ল অব মোরে। সবচেয়ে শক্তিমান তিনিই, যিনি মেরীর বিয়ে খুশি মনে মেনে নিতে পারলেন না। এর কারণ একটাই—ডার্নলে আর তিনি পরস্পরের ব্যক্তিগত শত্রু। এ ছাড়াও তিনি লর্ডস অব কংগ্রেগে-শানের প্রধান—যারা এই ডার্নলের প্রোটেস্টান্টদের বিপদও দেখতে পেলেন।

মোরে আর সহযোগীরা এবার ঠিক করলেন অস্ত্রের মুখেই এর সমুচিত জবাব দেবেন। তাঁরা প্রচুর অস্ত্র আর সৈন্য জোগাড় করলেন।

কিন্তু মেরীও এমন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এমন জরুরী পরিস্থিতিতে প্রথমেই তিনি বললেন, 'আমার প্রজাদের আমি পাশে চাই। তারা কি এসময়ে এগিয়ে আসবে না?'

মেরীর আবেদনে হাজারে হাজারে মানুষ ওর সমর্থনের জন্যে এগিয়ে এল। মেরীর জনপ্রিয়তা প্রমাণ হল। ডার্নলে বর্ম পরিধান করে রাণীর পাশে তাদের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। মেরী ঘোড়ায় চড়ে চললেন, দুপাশে ঝোলানো গুলি ভরা পিস্তল।

মোরে প্রমাদ গুনলেন। এমনটি তিনি আশা করেন নি। বিপদ বুঝেই মোরে সসৈন্যে পালাতে চাইলেন রাজকীয় সেনাবাহিনীর সামনে না দাঁড়িয়ে। মোরের সেনাবাহিনী ঘুর পথে এডিনবার্গে গিয়ে কিছু সহযোগী খোঁজার আশা করল। কিন্তু ফল দাঁড়াল উল্টো—এডিন-

বার্গের মানুষ ক্ষেপে গেল। তারা আক্রমণ করতে চাইল। এমন কি এডিনবার্গ দুর্গ থেকে গোলা ছোঁড়ার ভয়ও দেখানো হল। ভয় পেয়ে মোরের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল—নেতারাও পালালেন ইংলণ্ডের দিকে। ইতিহাসে এ ঘটনা বিখ্যাত হয়ে রইল 'পলায়িতের আক্রমণ' বলে।

মেরী এইভাবেই তার অবাধ্য প্রজাদের মন জয় করলেন। তবে দুর্ভাগ্য মেরীর তিনি অচিরেই বুঝতে পারলেন আরও ভয়ঙ্কর এক শত্রু তার সামনে। সেই মারাত্মক শত্রু তার মূর্খ আর আবেগপ্রবণ সেই স্বামী ডার্নলে—যাঁকে ভালবেসেই স্বামীত্বে বরণ করেছেন স্বয়ং তিনিই। কিন্তু আর যে কিছুই করার নেই। মেরীর প্রেমের ফুল এই ভাবেই শুকিয়ে গেল।

একগুঁয়ে এই তরুণের স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার সত্যিই লজ্জাজনক। সে ব্যবহার যে কোন রমনীর প্রতি ঘৃণ্য। ডার্নলের অন্য বদগুণ সে অতিরিক্ত মদ্যপিয়াসী, সুরাই তার জীবন। শুধু তাই নয়, অন্য বহু কদর্য অভ্যাসেরও সে দাস।

ইতিমধ্যেই বহু ক্ষমতাও এসেছে ডার্নলের হাতে—হয়তো সে ক্ষমতার অযোগ্য। বয়সও ওর বেশ কম, মাত্র উনিশ বছর। বয়স অনুপাতে ক্ষমতা ওর বেশিই হবে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হয়নি ডার্নলে। সে মেরীর কাছে অনবরত জানাতো সে স্কটল্যাণ্ডের অধীশ্বরের যোগ্য মর্যাদা চায়—এর একমাত্র অর্থ, স্ত্রীর সঙ্গে সিংহাসনে সমঅধিকার আর মর্যাদা। এটা না পাওয়া পর্যন্ত তাকে কেউ রাজা বলে মানতে চাইবে না। যদিও তার নাম রাজা হিসেবে উচ্চারিত। আসলে ডার্নলে রাণীর স্বামী মাত্র! ডার্নলের কাছে এ চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠতে চাইলো।

বিয়ের সুত্রে স্কটল্যাণ্ডের অধীশ্বরের মর্যাদা পেয়েছিলেন কেবলমাত্র মেরীর প্রথম স্বামী, ফ্রান্সিস। ডার্নলেও সেই মর্যাদা পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু মেরী স্বামীকে চিনতে ভুল করেন নি। তিনি তাই বললেন, 'ওঁকে ওর প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছি, আর নয়। চরম অকৃতজ্ঞ সে—এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না।'

ক্রোধে জ্বলে উঠল ডার্নলে, 'আচ্ছা আমিও দেখে নেবো। প্রতিশোধ কি করে নিতে হয় আমি জানি।'

ডার্নলের সমস্ত রাগ এবার গিয়ে পড়ল মেরীর ইতালীয় সেই সেক্রেটারী রিৎসিওর উপর। ছেলেমানুষের মতোই ডার্নলে তার ইচ্ছায় বাধা পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। অথচ এই রিৎসিওই একদিন ডার্নলের ঘনিষ্টতম বন্ধু আর পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে ডার্নলে ভাবলো, 'যতো নষ্টের মূল ওই রিৎসিও—সেই মেরীকে এই কাজে বাধা দিচ্ছে।'

রিৎসিওকে তাই ডার্নলে মনে মনে ভাবতে স্থরু করল ওর প্রচণ্ড শত্রু হিসেবে। ওর জন্যেই ডার্নলের আশা পূরণ হচ্ছে না। বেচারি ওই ভিন দেশী রিৎসিওর উপর ডার্নলের ঘৃণা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পেঁাছল যে ডার্নলে একদিন সোজাস্থজি বলেই ফেলল, 'নরকের ওই কীটকে আমি তরবারির আঘাতে খতম করব। হ্যাঁ, নিজের হাতে খতম করব।'

রিৎসিও সত্যিই হতভাগ্য। বেচারির মেরী ছাড়া আর কোন বন্ধু ছিল না। ফলে ডার্নলের পক্ষে হারিয়ার জোগাড় করা কঠিন হল না। উঁচু মহলের কেউ কেউ এই প্রতিশোধ নেওয়ার কাজে ডার্নলের সঙ্গে হাত মেলালো।

ডার্নলের প্রধান সহযোগী হয়ে উঠলেন এই কার্য পরিকল্পনায় আর্ল অব মর্টন, জেমস ডগলাস। তিনি ছিলেন নাবালক আর্ল অব অ্যাঙ্গামের কাকা। অতএব ডগলাস জমিদারীর সমস্ত কিছুর ক্ষমতা তারই হাতে ছিল। মস্ত অভিজাত আর প্রচুর সমর-অভিজ্ঞ মানুষ বলে তার স্থনাম থাকলেও ডগলাস নোঙরা চরিত্রের মানুষই ছিলেন। লোকটি ছিলেন অতি নীচ আর কূট-কৌশলী। যেহেতু জমিদারী

তারই হাতে, তাই তার পক্ষে আইন মেনে চলা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। এই কারণেই ডগলাস গোপনে ডার্নলের ওই নিষ্ঠুর আর বেআইনী ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। সঙ্গে যোগ দিলেন আর এক অভিজাত, লর্ড রুথভেন। রোগগ্রস্ত এই লোকটিও অস্ত্র ধারণে উৎসাহী ছিলেন। অন্যান্য আরও লোক জোগাড় করতেও অসুবিধা হল না।

যে সব লর্ডেরা এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিলেন তাদের শর্ত ছিল, এর পরিবর্তে মোরের জন্যে ক্ষমা লাভের সুযোগ করে দিতে হবে। মোরের সেই পলায়িতের আক্রমণের জন্যে। শেষ অবধি সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হয়ে গেল সমস্ত পরিকল্পনা জানিয়ে সকলকে নির্দিষ্ট রাতে এডিনবার্গে হাজির হতে বলা হল।

কুইন মেরী তার পিতা পঞ্চম জেমসের মতই রাষ্ট্রীয় জাঁকজমকের বদলে ছোট ছোট অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন। এইসব অনুষ্ঠান যখনই হতো মেরী নিমন্ত্রণ করতেন তার খুব ঘনিষ্টদেরই, আর এর ফলে রিৎসিও প্রায়ই এইসব অনুষ্ঠানে হাজির থাকতো। ১৫৬৬ সালের ৯ই মার্চ, এই রকম এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন মেরী ওঁর শয়নকক্ষের পাশের ছোট কামরায়। নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। কামরায় ঢোকার দরজা শুধু শোবার ঘর দিয়েই। রিৎসিও যথারীতি হাজির ছিল।

সন্ধ্যা সাতটা! প্রাসাদের সমস্ত দরজাই মর্টন প্রায় শ'দুয়েক লোক সহ ঘিরে রাখলেন। এবার ডার্নলে এগিয়ে এল বাছাই করা কিছু দলের লোক নিয়ে। সে গোপনে একটা সিঁড়ি দিয়ে রাণীর কামরায় এসে ঢুকল।

ডার্নলে প্রথম কামরায় ঢুকল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে নির্নিমেষে সে তাকাতে চাইল হতভাগ্য রিৎসিওর দিকে। এরপরেই ঢুকলেন নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে লর্ড রুথভেন। একটা বিচিত্র দৃশ্য! রুগ্ন রুথভেনকে বীভৎস, ভয়ঙ্কর একটা প্রেতের মতই মনে হচ্ছিল।

একে একে অন্যরাও কামরায় এসে ঢোকে। চারদিকে শুধু অস্ত্রধারী মানুষ—জিঘাংসায় তারা যেন উদগ্রীব।

রাণী তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল।

'কি···কি চাই আপনাদের এখানে?' রাণী কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

কিন্তু জবাবের প্রয়োজন ছিলনা হতভাগ্য রিৎসিওর। আগন্তুকদের চোখে হত্যার নেশা সে অনুভব করেই মেরীর গাউনের পিছনে আশ্রয় নিতে চাইল। কাতর ভাবেই রিৎসিও বলে উঠল, 'আমাকে রক্ষা করুন, ওরা···ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়।'

কিন্তু হত্যাকারীদের তখন খুনের নেশা পেয়ে বসেছিল। তারা ঘরের টেবিল ছুঁড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রিৎসিওর উপর। ডার্নলে মেরী আর রিৎসওকে টেনে আনতে চাইল। ওদের উদ্দেশ্য ছিল, রিৎসিওকে মেরীর সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও হত্যা করা। কিন্তু হত্যার নেশায় সকলে তখন উন্মত্ত—সেই জিঘাংসাই ওদের সঙ্গে সঙ্গে হত্যায় প্ররোচিত করল।

জর্জ ডগলাস, যিনি আর্ল অব মর্টনের সম্পর্কে ভাই, তিনিই প্রথম স্নুরু করলেন কাজটা। ডার্নলের কোমরবন্ধে ঝোলানো ছোরাটা ছিনিয়ে নিয়ে তিনি প্রাণপণে আঘাত করলেন হতভাগ্য রিৎসিওকে।

পরপর এবার আঘাত নেমে এল। কাতর আর্তনাদ করে উঠল রিৎসিও—দেহে তার পরপর অনেকগুলি মারাত্মক আঘাত। রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় সকলে তাকে শয়নকক্ষের মধ্য দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল অন্য কামরায়। হত্যাকারীরা এবার উন্মত্ত উল্লাসে রিৎসিওর রক্তাপ্লুত দেহটা টেনে ফেলে দিল সিঁড়ির মাথায়। ইতিমধ্যেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে রিৎসিওর—শরীরে তার কম করেও ছাপান্নটি মারাত্মক ক্ষত চিহ্ন।

স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়েছিলেন মেরী। চোখের জলে তিনি কাতর

আবেদন জানতে চাইছিলেন নরপশুদের কাছে রিৎসিওর প্রাণভিক্ষা চেয়ে, 'ওকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও···!'

কিন্তু হত্যাকারীরা তখন হত্যার নেশায় উন্মাদ। রিৎসিও ইতিমধ্যে নিহত।

রিৎসিও নিহত, একথা উপলব্ধি করেই মেরী তার অশ্রু মুছে ফেললেন। কঠিন দৃষ্টি মেলে এবার তিনি তাকালেন হত্যাকারীদের দিকে, 'প্রতিশোধ চাই। এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়াই হবে আমার কাজ।'

কিন্তু ডার্নলে?

ডার্নলের প্রতিশোধ স্পৃহা ততোক্ষণে মিটে গেছে। রিৎসিও মৃত অনুভব করেই নিদারুণ ভয়ে কুঁকরে গেল ডার্নলে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনার জন্যে তার কাঁপুনি সুরু হয়ে গেল।

দুর্বল মনসম্পন্ন স্বামীকে অনুশোচনা আর ভয়ের মাঝখানে দেখেই মেরী তৎক্ষণাৎ তাকে তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে মনস্থ করে ফেললেন! যে সহযোগীরা ঐ ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। ডার্নলে আর মেরী এবার গোপনে সবার অলক্ষ্যে হোলিরুড প্রাসাদ ত্যাগ করে ডানবারে পালিয়ে গেলেন। ডার্নলে বাধা দিতে পারলো না। সে তখন সম্পূর্ণভাবেই মেরীর অনুগত।

ডানবারে উপস্থিত হওয়ার পরেই মেরী একটা ঘোষণাপত্র জারি করলেন। এর ফলে বহু বিশ্বস্ত অনুচর সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন মেরী।

এবার ষড়যন্ত্রকারীদেরই ভয় পাওয়ার পালা। নিজের জয় নিশ্চিত করার জন্যে মেরী আর্ল অব মোরেকে ক্ষমা করলেন আর তাকে নিজের পাশে টেনে আনতে সমর্থ হলেন। মর্টন, রুথভেন আর তাদের সহযোগী সেই নির্মম হত্যাকারীরা সকলেই সদলে স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে ইংল্যাণ্ড পালালেন।

কোন স্কট প্রজাই গোপন সমর্থন না পেলে একাজ করতে

পারতো না। এলিজাবেথের গোপন সমর্থনেই একাজ সংঘটিত হতে পারল।

মেরী ইতিমধ্যে মা হতে চলেছিলেন। ১৫৬৬ সালের ১৯ শে জুন জন্ম হল তার সন্তান পরবর্তী ষষ্ঠ জেমসের।

মেরী এরপর এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্কটল্যাণ্ডের পরবর্তী অধীশ্বরের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। তার এর পরের কাজ হল তার মহত্ব প্রমাণ করা। মনকে প্রস্তুত করে নিয়ে তিনি রিৎসিওর হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রায় সকলকেই ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। শুধু অতি নীচু স্তরের দুজনকেই ফাঁসি দেওয়া হল। প্রধান ষড়যন্ত্রকারী সেই লর্ড রুথভেন অবশ্য এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডে মারা গেছেন।

ঠিক এই বিচিত্র মুহূর্তে আর একজন রঙ্গমঞ্চে উদয় হলেন। লোকটির নাম জেমস হেপবার্ণ অর্থাৎ আর্ল অব বথওয়েল। মধ্যবয়স্ক লোকটির শয়তানীতে অবশ্য জুড়ি ছিল না। প্রোটেস্টাণ্টদের ব্যাপারে তিনি অবশ্য রাণীর পক্ষই নিয়েছিলেন। লোক তাকে রাণীর পক্ষের লোক বলেই জানতো। হেপবার্ণের এক শক্তিমান পরিবারভুক্ত ছিলেন বথওয়েল। পূর্ব লোথিয়ান আর বারউইকসায়ারে তার বেশ প্রভাব ছিল। এ জায়গায় দক্ষ সৈনিকের অভাব ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রে বথওয়েল ছিলেন একেবারে বন্য, লম্পট আর দারুণ উচ্চাভিলাষী।

কৌশলী বথওয়েল মেরীর পক্ষে এমন প্রচার চালিয়েছিলেন যে মেরীও কিছুটা প্রভাবিত না হয়ে পারলেন না। তিনি বথওয়েলকে রাজসভায় ভাল রকম ক্ষমতাও দিয়ে ফেললেন। এতে কিন্তু সংস্কার-বাদীরা বলেই ফেলল, 'রাণী এমন ভীষণ চরিত্রের মানুষকে সুবিধে দিয়ে ভাল করলেন না।'

কিন্তু বেচারি মেরী। এত চেষ্টাতেও পারিবারিক জীবনে সুখ পেলেন না। ডার্নলে আর রাণীর মধ্যে দূরত্ব আর মতবিরোধ শুধু

বেড়েই চলতে চাইল। ডার্নলে মাঝে মাঝেই মেরীকে জানাতে লাগল সে রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। ডার্নলে কৌশলে মাঝে মাঝেই স্ত্রীর মনকে নিজের দিকে আনতে চাইত—আবার সে রকম কোন দুর্বলতা স্ত্রীর মনে জেগে উঠতে দেখলেই সে স্বমূর্তি ধরতে চাইতো।

কিন্তু মেরী বুঝতে পেরেই একদিন স্বগতোক্তি করলেন, 'ও অনেক দূরে চলে গেছে আর ফেরানো সম্ভব নয়।'

মেরীর এই মনোভাবের সুযোগ নিতে শুরু করল কিছু সুযোগসন্ধানী কুচক্রী অভিজাত মানুষ। এরাই ঘিরে রেখেছিল মেরীকে। সময়ে অসময়ে তারাই চাইতো মেরীর মনকে তার স্বামী সম্পর্কে বিষিয়ে তুলতে। তারা মেরীকে বোঝাতে চাইতো স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদই ঐ কুগ্রহ ডার্নলের হাত থেকে বাঁচার পথ।

এ ধরণের প্রস্তাব প্রথমে মেরীর কানে তুললেন বথওয়েল, 'আপনার উচিত স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হওয়া।'

কিন্তু মেরী বারবার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। স্বামীর প্রতি হয়তো তখনও তার সামান্য প্রেম অবশিষ্ট ছিল।

কিন্তু কুচক্রী বথওয়েল সেখানেই থামলেন না। আরও জঘন্য মারাত্মক এক ষড়যন্ত্রের জন্ম হল এবার—ডার্নলেকে হত্যা করতে হবে। বথওয়েল দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন ডার্নলে নিহত হলে মেরী ওই রকম স্বামীর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে তাকেই বরণ করে নেবে। বথওয়েল পরিকল্পনা নিয়ে কথা বললেন আর্ল অব মর্টনের সঙ্গে। এমন কি তাকে নেপথ্যে জানালেন, 'বিশ্বাস করুন, এতে মেরীরও সম্মতি আছে।'

মর্টন সহজে গা'য়ে মাখলেন না প্রস্তাবটা—কারণ এ পরিকল্পনা কেবল মারাত্মকই তাই নয়, এর জেরও সুদূর প্রসারী হবে হয়তো। তাই তিনি সোজা বলে বসলেন, 'আমি রাণীর নিজের হাতে লেখা চাই।' শয়তান বথওয়েল রাজি হয়ে গেলেন, 'তাই আনবো।'

অবশ্য শয়তান বথওয়েল কোন কালেই তা পারেননি আনতে। ওর বিরুদ্ধে ওই জঘন্য ষড়যন্ত্র চলার সময় ডার্নলে গ্লাসগোতে দারুণ

অসুস্থ হয়ে পড়লেন—জানা গেল তার রোগ বসন্ত। রাণী তার খাস চিকিৎসককে ডার্নলের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও স্থির থাকতে পারলেন না তিনি—কয়েকদিন পরে নিজেও গ্লাসগোতে স্বামীর কাছে রওনা হলেন।

অসুস্থ স্বামীর কাছে আসতেই দুর্বল হয়ে পড়লেন মেরী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুরণো ভালবাসা আবার যেন নতুন করে জেগে উঠল। দুজনের মধ্যে আবার মিটমাট হয়ে গেল। দুজনেই একসঙ্গে ১৫৬৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী এডিনবার্গে ফিরে এলেন। ডার্নলে রইলেন শহরের প্রাচীরের বাইরে এক ধর্মীয় প্রাসাদে, যার নাম কার্ক অব ফিল্ড। রাণী তার শিশুপুত্র যুবরাজকে নিয়ে অবশ্য হোলিরুড প্রাসাদেই রইলেন।

স্বামীকে ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মেরীর, শিশু যুবরাজকে আলাদা রেখে রোগের ছোঁয়া থেকে বাঁচানো। কিন্তু মেরী স্বামীকে ভুলতে পারেন নি—বার বার তিনি ছুটে গেলেন ডার্নলের কাছে। মেরী আর ডার্নলের প্রেম যেন নবরূপে জেগে উঠতে চাইলো। ডার্নলেকে প্রাণ দিয়ে সেবা করতে লাগলেন মেরী—স্বামীকে যেভাবেই হোক সেবা করে সুস্থ করে তুলবেন তিনি।

ডার্নলে আর মেরীর এ ধরনের প্রেম আর ভালবাসা ওদের বিবাহিত জীবনে আগে কেউ দেখেনি। ডার্নেলের জীবন বিপন্ন হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সে প্রেম যেন বাঁধ ভাঙা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

এল এবার সেই ভয়ঙ্কর রাত। ডার্নলে আর তার এক পরিচারকই এবার একাকী কক্ষে। রাণী আগেই বিদায় নিয়েছেন—অন্য আর কেউ কোথাও নেই।

১৫৬৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারীর এক কলঙ্কিত রাত—কার্ক অব ফিল্ডে এসে পৌঁছল আর্ল অব বথওয়েলের কিছু সহযোগী। আত্মীয় আর ভাড়াটে কিছু গুণ্ডা। সকলের কাছে লুকনো ছিল বেশ কিছু বারুদ। গুণ্ডার দল গোপনে সবখোল চাবির সাহায্যে বাড়িতে ঢুকে

পড়ল। তারপর অতি সতর্ক ভঙ্গীতে তারা এসে ঢুকল বাড়ির গুদাম ঘরে। সেখানে প্রতিটি খোপে তারা ঢেলে দিল সব বারুদ—বিশেষ করে ডার্নলের নিজস্ব কামরার ঠিক নিচেই যেখানে রাখা ছিল হতভাগ্য ডার্নলের শয্যা।

রাত বারোটা। এর একটু পরেই গোপনে ছদ্মবেশে এসে পৌঁছলেন শয়তান বথওয়েল—উদ্দেশ্য স্বচক্ষে ওই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পরিকল্পনার শেষ দৃশ্য উপভোগ করা। বথওয়েলের দুজন অতি বিশ্বস্ত খুনে গুণ্ডা এবার ভিতরে ঢুকে বারুদে আগুন লাগানোর বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলল। তারা একখণ্ড ধীরে জ্বলা বারুদ-মাখানো কাঠির এক প্রান্তে আগুন লাগিয়ে অন্য প্রান্ত বারুদে ঢুকিয়ে দিল। তারপর তারা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগল ফলাফল দেখার জন্যে। এদিকে বথওয়েল প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠলেন—তিনি প্রায় জোর করেই ভিতরে ঢুকে দেখতে চান কেউ আগুন নিভিয়ে ফেলেছে কি না। অতিকষ্টে তাকে ঠেকানো হল। তার একজন ভাড়াটে গুণ্ডা শেষ পর্যন্ত জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে জানাল আগুন জ্বলছে।

একটু পরেই ঘটল ভয়ঙ্কর সেই বিস্ফোরণ—বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আঘাতে কার্ক অব ফিল্ড বাড়িটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সারা শহরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলল। ডার্নলের দেহ পাওয়া গেল পাশের এক ফলের বাগানে। যে শয্যায় সে নিদ্রিত ছিল তার জন্যেই ওতে আগুন লাগেনি—আর তার ফলেই অনেকের ধারণা হয়ে গেল বাড়িটা ধ্বংস করার আগে ডার্নলে আর তার অনুচরকে আগেই গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। তারপর তাদের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয়। তবে এটা ভুল। এটা পরিষ্কার ভাবেই প্রমানিত হয়ে গেল যে হত্যার পরিকল্পনাতে শুধু বারুদই ব্যবহার করা হয়েছিল—এমনই শক্তিশালী সেই বারুদ যে অন্য কোন আলাদা পদ্ধতির দরকার ছিল না।

ডার্নলের ঐ বীভৎস, হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড সারা এডিনবার্গে এমন দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল যে ভাষায় তা বর্ণনা করা অসম্ভব। শুধু তাই

নয়, সারা স্কটল্যাণ্ডই যেন তোলপাড় হতে চাইলো। সারা দেশের মানুষ আঙুল তুলে বলতে চাইলো, 'বথওয়েলই দোষী! বথওয়েল খুনী!' কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতেও মেরীর সাহচর্য পেয়ে চললেন শয়তান বথওয়েল। দেশের মানুষ দারুণ ঘৃণায় মেরীকেও নিন্দা করতে ছাড়লো না।

হতভাগ্য ডার্নলের পিতা লেনক্সও বথওয়েলকেই তার পুত্রের হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করলেন। কিন্তু বথওয়েলকে অভিযুক্ত করতে তেমন সমর্থন আদৌ পেলেন না। সব ব্যাপারটাই এমন কৌশলে তাড়াতাড়ি শেষ করা হল যে আইনকে কলা দেখাতে অসুবিধা হল না। আর্ল অব লেনক্স অভিযোগ করলেন অভিযোগের ব্যবস্থা করার জন্যে তাকে উপযুক্ত সময় দেওয়া হয়নি—কারণ এরকম ক্ষমতাবান অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু লেনক্সকে আর সময় বাড়ানো হলো না!

স্কটল্যাণ্ডের আইন অনুযায়ী কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বন্ধু, ভাড়াটে লোকজন, আত্মীয়স্বজন সুদ্ধ আদালতে হাজির হতে পারে। মাঝে মাঝে এদের সংখ্যা এমন বেশিও হয় যে বিচারক আর অভিযোগকারীও ভয় পেয়ে যায় কোন ব্যবস্থা নিতে। ফলে বিচার ব্যাপারটাই প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। বথওয়েল নিজের অপরাধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন—তাই ওই ব্যবস্থা নিতেই তিনি প্রস্তুত হলেন সর্বশক্তি নিয়ে! তিনি এডিনবার্গে হাজির হলেন পাঁচ হাজার সাগরেদ নিয়ে। তাদের দুশ জন বাছাই গুণ্ডা বথওয়েলের পাশে পাশে থেকে আদালতের দরজা পাহারা দিতে সুরু করে দিল সে ঘরে ঢুকতেই। সন্দেহ ছিল না এরকম বিসদৃশ অবস্থায় কখনও সুবিচার পাওয়া অসম্ভব।

লেনক্স অবস্থা আঁচ করে নিয়েই নিজে এলেন না। তার একজন প্রতিনিধি এসে ওই দিনের কাজের ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। কোন অভিযোগই কেউ জানালো না—আর নির্দোষিতারও প্রমাণ তাই প্রয়োজন হল না—ফলে যা হওয়ার তাই হল। কিছু অভিজাত আর

উঁচু মহলের মানুষ নিয়ে গঠিত জুরীরা বথওয়েলকে ডার্নলের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জড়িত নন বলেই রায় দিল। অথচ সারা দুনিয়াই আঙুল তুলে জানাতে চাইলো সেই দোষী।

সারা দেশের মানুষের মন কিন্তু এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর আদালতে ঐ বিচারের প্রহসনে দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু শয়তান বথওয়েল জনসাধারণের মনের ভাব আগ্রহ্য করে ডার্নলের শূন্য জায়গা দখলের জন্যে নানা কৌশল কাজে লাগাতে চাইলেন।

কৌশলী বথওয়েল এবার বেশ কিছু অভিজাতদের বিরাট এক নিমন্ত্রণের মাধ্যমে একত্রিত করলেন। উদ্দেশ্য মহৎ ছিল তাঁর। অভিজাতদের দিয়ে বথওয়েল একটা একরারনামা লিখিয়ে নিলেন এই বলে যে বথওয়েল ডার্নলের খুনের ব্যাপারে আদৌ জড়িত নন, তিনি নির্দোষ। এখানেই থামলেন না বথওয়েল, তিনি রাণীর উদ্দেশ্যে এক আবেদন লিখিয়ে নিলেন, তিনিই তাঁর স্বামী হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি।

এদিকে, স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে উপযুক্ত আর নামী মানুষ মোরে ঘটমান এই সমস্ত কিছুরই বাইরে ছিলেন। তিনি বথওয়েলের ওই বিচিত্র বিচারের প্রহসনের তিন দিন আগে রাণীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন ফ্রান্সে বেড়াতে যাবেন বলে। এসব ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত রয়ে গেলেন।

ঘটনা গড়িয়ে চলল।

আর্ল অব বথওয়েল এবার অভিজাতবর্গের মত আদায় করে নিয়ে তার ভবিষ্যত কৌশল কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন।

মেরী ইতিমধ্যে ছিলেন স্টার্লিং শহরে। সেখান থেকে তিনি এবার এডিনবার্গে ফিরে আসার ব্যবস্থা করলেন।

মেরী সদলে এসে পৌছলেন কারমণ্ড সেতুর মুখে। শয়তান বথওয়েল মেরীর অনুকম্পা আর মার্জনা লাভের কৌশল নিতে আচমকা হাজির

হলেন ওই সেতুর সামনে প্রায় এক হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে। বথওয়েল স্বয়ং মেরী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার ঘোড়ার বলগা চেপে ধরলেন। তারপর মেরী বাধা দেবের আগেই যেন প্রায় জোর করেই তাকে নিয়ে তুললেন তার নিজের আস্তানা ডানবারের দুর্ভেদ্য দুর্গে।

মেরীর তখনকার আচরণ হল বড়ো অদ্ভুত। শুধু একবার সমস্ত কিছু যেন মুখ তুলে জরিপ করে নিলেন তিনি। কোন বাধাও দিলেন না বা কোন প্রশ্নও তুললেন না।

একজন নারী বা রাণী হিসেবে যে রকম আচরণ তার কাছে আশা করা গিয়েছিল সেই ক্রোধ বা লজ্জার কোন প্রকাশ ঘটল না মেরীর আচরণে। যেন এটা তাঁর কাছে ভবিতব্য বলেই মনে হল।

বথওয়েল মেরীকে নিয়ে দশদিন ডানবারের দুর্গে কাটালেন। দশদিন পরে আবার তাদের দেখা গেল এডিনবার্গে। অদ্ভুত একদৃশ্যই ফুটে উঠল জনসাধারণের সামনে। বথওয়েল অতি যত্নে রাণীর অশ্বের বলগা ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন দুর্গের দিকে।

দু'জনের মন দেওয়া নেওয়ার পালা যেন শেষ। সত্যিই প্রেম বুঝি কোন বাধা মানে না। সে চলে বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতোই।

কৌশলী আর্ল অব বথওয়েল মেরীর সামনে নতজানু হয়েছিলেন, 'বিশ্বাস করুন আপনার স্বামীর হত্যাকাণ্ডে আমি কখনও জড়িত নই।'

বিচিত্র এ পৃথিবী। মেরী দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বথওয়েলের নিবেদিত প্রেম অস্বীকার করতে পারলেন না মেরী—দুহাত ধরে তুললেন বথওয়েলের। বথওয়েল প্রেম নিবেদন করলেন। দুর্বল মেরী ফাঁদে পড়ে গেলেন।

মেরী জানতেন বথওয়েল বিবাহিত। তাই তিনি বললেন, 'কিন্তু তোমার স্ত্রী—।'

'তাকে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি হতে হবে,' বথওয়েল জবাব দিলেন।

বথওয়েলের স্ত্রী ছিলেন আর্ল অব হাণ্টলির বোন। বথওয়েল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন। তুজনের বিচ্ছেদ ঘটে গেল অচিরেই।

১২ই মে। রাণী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন তিনি বথওয়েলকে তার স্বামী ডার্নলের হত্যার অপরাধ থেকে মার্জনা করছেন। তিনি আরও জানালেন, প্রথমে অসন্তুষ্ট থাকলেও তিনি তাকে শুধু ক্ষমা প্রদর্শনই করছেন না তাকে আরও সম্মান প্রদর্শন করছেন।

মেরী কথা রাখলেন। অচিরেই তিনি বথওয়েলকে করে দিলেন ডিউক অব অর্কনে।

কিন্তু এখানেই শেষ হলো না—জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ করতে চললেন তিনি—রাণী মেরী।

১৫ই মে তারিখে অমার্জনীয় সেই অপরাধ করলেন মেরী—আর করলেন তাঁর ক্ষণস্থায়ী জীবনের মহা ভুল।

এর আগেই বথওয়েল মেরীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, 'আমি তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাই, মেরী। তুমি রাজি আছো ?'

মেরীর অস্বীকারের আর পথ ছিলো না। তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, রাজি আছি।'

১৫ই তারিখে মেরী প্রকাশ্যে বিয়ে করলেন তৃতীয় বারের জন্যে, প্রাক্তন স্বামীর রক্তে রঞ্জিত যার হাত, সেই শয়তান আর্ল অব বথওয়েলকেই।

উচ্চাকাঙ্খী ক্রুর, অত্যাচারী বথওয়েলের কৌশল সফল হল। মেরী এলেন তার হাতের মুঠোয়।

কিন্তু মেরীর বুঝে নিতে দেরি হয় না এই অন্যায় অসুখী বিয়ের মধ্য দিয়ে কি মারাত্মক ভুলই তিনি করেছেন। তৃতীয় স্বামী হিসেবে বথওয়েল ডার্নলের অস্থির চরিত্রের চেয়ে ঢের বেশি শয়তান আর ক্রুর। বথওয়েল চাইছিলেন নাবালক যুবরাজকে নিজের কব্জায় রাখতে। কিন্তু রাণী ওই একটি ব্যাপারে কিছুতেই রাজি হলেন না, 'না, কখনই তা হতে দেবো না,' মেরী চিৎকার করে জানিয়েছিলেন।

ক্রুদ্ধ বথওয়েল আশা ভঙ্গ হওয়ায় কুৎসিত কদর্য ভাষায় অকথ্য গালিগালাজ দিয়ে চললেন মেরীকে।

মেরীর আর সহ্য হলো না। কাতর কণ্ঠে তিনি একসময় বলে উঠলেন, 'আর আমি বাঁচতে চাই না। কেউ একটা ছুরি দিতে পারো! আমি আত্মহত্যা করতে চাই—।'

শয়তান বথওয়েলের হাত থেকে বাঁচার জন্তে মেরী আত্মহত্যাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন।

কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের প্রজারা ব্যাপারটা সহজে মেনে নিল না। তাদের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলো। মর্টন, মেটল্যাণ্ড আর অন্যান্য কয়েকজন, যাঁরা একসময় ডার্নলের হত্যার কাজে লিপ্ত ছিল, তারাই অভিজাতদের দল তৈরী করে ডার্নলের খুনের প্রতিশোধ নিয়ে শয়তান বথওয়েলকে তার নতুন পদ আর ক্ষমতা থেকে সরাতে বদ্ধপরিকর হল। প্রচুর অস্ত্রসস্ত্র জোগাড় করে তারা আচমকা লর্ড বর্থউইকের দুর্গ আক্রমণ করে বসল। ওই দুর্গেই মেরী আর বথওয়েল নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

মেরী আর তার স্বামী এমন কিছু আশাই করতে পারেন নি। এখন বাঁচার একমাত্র পথ গোপনে দুর্গ থেকে পালানো।

মেরী আর বথওয়েল বাধ্য হয়ে সেই পথই নিলেন। মেরীকে সাজতে হল এক ছোকরা পরিচারক। ছদ্মবেশ গ্রহণ ছাড়া পথ ছিল না।

গোপনে দুর্গের খিড়কির এক পথ বেয়ে দুজন পালালেন ডানবার দুর্গে।

লর্ডের দল এবার খবর পেয়ে তাদের ডানবারের দিকেই তাড়া করলেন। মেরী আর বথওয়েল ইতিমধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের বাধা দিতে এগিয়ে এলেন। দুদলে মুখোমুখি হল পিংকির যুদ্ধ ক্ষেত্রের কাছে কারবেরি হিলে। সে দিনটি ছিল ১৫ই জুন ১৫৬৭।

মেরী বোধহয় বুদ্ধিমতীর কাজই করতেন যদি তিনি ওইভাবে

আচমকা আক্রমণ না করতে চাইতেন। কারণ তার অধীনস্থ হ্যামিলটন বিশাল সৈন্যদল নিয়ে মেরীর সাহায্যে এগিয়ে আসছিলেন—তিনি এসে যোগ দিলে মেরীর পরাজয়ের কোনই সম্ভাবনা ছিলো না।

কিন্তু মেরী চিরকালই অগ্রনী থেকেই সুযোগ আদয় করাই শিখে ছিলেন। এক্ষেত্রেও তিনি তাই করতে চাইলেন—শত্রুপক্ষকে আচমকা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে ঘায়েল করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু একটা ভয়ানক সম্ভাবনার কথা মেরী একটুও উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি—তাহলে তার নিজের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে একটা অসন্তোষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে চাইছিল। আর সে অসন্তোষ তাঁরই বিরুদ্ধে।

হঠাৎই তার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে চাইল—এটা পরিষ্কার প্রতিভাত হয়ে গেল মেরীর সেনারা তাঁর বা বথওথেলের হয়ে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। মেরী হতবাক, স্তব্ধ হয়ে গেলেন–করনীয় কাজ শুধু একটাই। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো।

কিন্তু সে পথও প্রায় বন্ধ। মেরী বথওয়েলকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে বললেন। বথওয়েলেরও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে নিতে দেরি হলো না। তিনি তার অশ্বপৃষ্টে দ্রুত বেগেই পালালেন ডানবারের দিকে। সেখানেও নিরাপত্তা নেই বুঝতে পেরে তিনি জাহাজে চেপে সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়লেন। উদ্দেশ্য স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে দূরে পালানো।

মেরীর আর পালানোর পথ ছিলো না। সম্মান প্রদর্শন আর দয়ার্দ্র ব্যবহার করা হবে এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে মেরী আত্মসমর্পণ করলেন লেয়ার্ড অব গ্রেঞ্জের কাছে। তিনি মেরীকে বিরোধী সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে নিয়ে গেলেন। মেরী সেখানে হাজির হতেই অন্যান্য অভিজাত লর্ডেরা সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্য দিয়ে তাকে সম্মান জানালেন। কিন্তু সাধারণ সৈন্যিকেরা মেরীকে লক্ষ্য করে অশ্লীল ভঙ্গী করে কিছু বলাবলি সুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমনই দাঁড়াল

যে গ্রেঞ্জ তরোয়াল খুলে সৈন্যবাহিনী দলকে ভীতি প্রদর্শন করার পরেই তারা শান্ত হল।

এবার অভিজাত লর্ডের দল সভায় মিলিত হলেন। তারা সকলেই এক মত হয়ে প্রস্তাব নিলেন রাজধানীতে ফিরতে হবে। মেরীকে সেনাদলের সাহায্যে ঘিরে নিয়ে সকলে রাজধানীতে ফিরে চললেন।

হতভাগ্য মেরী। স্কটল্যাণ্ডের প্রচণ্ড ক্ষমতা শালিনী রাণীই আজ দুনিয়ায় বুঝি সবচেয়ে অসুখী। বিজয়ী লর্ড আর অভিজাতরা চরম উল্লাসে তাদের বন্দিনীকে নিয়ে এগিয়ে চলেছিল এডিনবার্গের রাজপথ ধরে। মেরীর কপালে জুটল শুধু নিরবিচ্ছিন্ন অপমান আর কলঙ্ক। সবচেয়ে বেশি অপমানিত ব্যবহার এল নীচু শ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে। এল কেবলই অসম্মান আর লাঞ্ছনা।

তারা মেরীকে অভ্যর্থনা জানালো বিশাল এক নিশান প্রদর্শন করে। এই উদ্দেশ্যেই তারা এটা তৈরী করেছিল। বিশাল ওই নিশানে আঁকা হয় ফলের বাগানে নিহত হয়ে পড়ে থাকা ডার্নলের প্রতিচ্ছবি—আর তার উপরে বড় বড় হরফে লেখা 'হে ঈশ্বর। আমাকে সুবিচার দাও!' নিশানের অপর দিকে আঁকা নাবালক যুবরাজের নতজানু হয়ে বসে থাকা ছবি, দুটি হাত জোর করে রাখা—সে যেন ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করছে তার পিতার হত্যাকারীদের শাস্তিবিধান করার জন্যে।

বিশাল জনাকীর্ণ রাজপথ বেয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাণীকে। উদ্বেল হাওয়ায় উড়তে চাইছে তার অবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ, পোশাক অগোছালো। সমস্ত পোশাকে ছড়িয়ে গেছে ধূলিকণা।

বিচিত্র এক দৃশ্য। দুঃখে, অপমানে, লাঞ্ছনার পরিপ্রেক্ষিতে আর ক্লান্তির স্পর্শে ভেঙে পড়েছেন স্কটল্যাণ্ডের অধীশ্বরী—আর ঠিক তেমনই এক বিচিত্র মুহূর্তে তার চোখের সামনে তুলে ধরা হল সেই হৃদয় বিদারক নিশানকে। আর সেই সঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলতে চাইলো

লক্ষ লক্ষ মানুষ, 'ডার্নলের হত্যাকারীর সাহায্য কারিনীর বিচার কর, বিচার চাই।'

কিন্তু মেরীর চরম ওই অবমাননা বেশিক্ষণ চলেনি। তাঁর চরম দুঃখে মনুষ্যত্ব বোধ ছিল এমন কিছু অভিজাতের হৃদয় কিছুটা ব্যথিত হল। তাদেরই অনুগ্রহে ঠিক করা হল মেরীকে শহরের বুক থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নেওয়া হবে।

ঠিক এই কারণেই রাণীকে ছদ্মবেশে শক্তিশালী একদল সেনার পাহারায় হোলিরুড প্রাসাদ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল লকলেভেন দুর্গে। সেই দুর্গ ছিল এক হ্রদে ঘেরা নির্জন এক দ্বীপে। রাণীকে সেখানে বন্দীনী হিসেবে রাখার ব্যবস্থা হল।

এবার আসল উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগলেন বিদ্রোহীরা—সেই লর্ডেরা। সকলে এবার এক গোপন সভায় মিলিত হলেন। উদ্দেশ্য জাতির শাসনের কাজে কিভাবে কাজে নামা সম্ভব। এবার প্রথম কাজ শয়তান পলাতক বথওয়েলকে কব্জা করা।

বথওয়েলকে তাড়া করে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে একজন অভিজাত, কার্কালডি অব গ্রেঞ্জ ছুটো জাহাজে লোকজন নিয়ে অনুসরণ করলেন পলাতক বথওয়েলকে।

বথওয়েল ইতিমধ্যে পৌঁছেছেন লেরউইক বন্দরের গোলক ধাঁধায়। গ্রেঞ্জ তাকে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন। বথওয়েল ওই বন্দরের এক মুখে ঢুকতেই গ্রেঞ্জ দুর্ভাগ্যবশত অন্য মুখে ঢুকেছিলেন। বিপদ বুঝে বথওয়েল অতি কষ্টে বন্দর ছেড়ে পালালেন। গ্রেঞ্জের সত্যিই দুর্ভাগ্য—নাহলে তার জাহাজ একটা ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাবে কেন।

ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা থেকে গ্রেঞ্জের জাহাজ চূর্ণ হয়ে গেল। লোকজন অবশ্য অতি কষ্টে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচালো। কিন্তু বথওয়েল ততোক্ষণে নাগালের বাইরে।

কিন্তু শয়তান বথওয়েলের জন্যে বিধাতাপুরুষ আরো ভয়ঙ্কর মৃত্যু ব্যবস্থা করে রেখেছিলে। উচ্চাকাঙ্খী বথওয়েল প্রাণ রাখার তাগিদে

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন গ্রহণ করতে জলদস্যুর জীবন সত্যিই করুণ পরিণতি!

উত্তর সাগরের বুকে ডাকাতি করতে সুরু করলেন স্কটল্যাণ্ডের রাণীর স্বামী।

কিন্তু দস্যুজীবন সুখকর হলো না বথওয়েলের। ডেনিশ কিছু যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে একদিন বথওয়েলের বাধল সংঘর্ষ। বথওয়েলকে ডেনিশ সৈন্যরা বন্দী করে নিয়ে নিক্ষেপ করল ম্যালমের দুর্ভেদ্য দুর্গের ভয়ঙ্কর কারাকক্ষে।

১৫[illegible]৬ সালের শেষদিকে ভয়ানক কারাজীবন শেষ হয়ে গেল লোভী শয়তান বথওয়েলের। বন্দী অবস্থাতেই তার হল শোচনীয় মৃত্যু।

কিন্তু মেরী? আর বথওয়েলের প্রতি তাঁর বাঁধ ভাঙা বিচিত্র প্রেম?

ইতিমধ্যে অভাগিনী মেরী তার তৃতীয় স্বামী শয়তান বথওয়েলের ঘৃণ্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সুরু করেছিলেন পুরোপুরিই।

সত্যিই বিচিত্র এ পৃথিবী আর তার চেয়েও বিচিত্র প্রেম। নাহলে মেরীর বথওয়েলের প্রতি ওই প্রেমের অন্য কোন ব্যাখ্যা মেলে না। স্বামীর হত্যাকারী ওই বথওয়েলকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন মেরী দেশের মানুষের কলঙ্ক আরোপ সত্বেও।

সত্যিই দুর্ভাগ্য মেরীর—অপরাধী তার ভালবাসা আর প্রেমের।

নির্দয় পদ্ধতিতেই স্কটল্যাণ্ডের রাণীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল একটা অতি ক্ষুদ্র টাওয়ারে, একটা ছোট্ট দ্বীপের বুকে।

স্কটল্যাণ্ডের বিলাস প্রিয় রাণী মেরী অশ্রু সজল চোখে শুধু অনুভূতির শিকার হলেন। ক্ষুদ্র ওই টাওয়ারে তার চলাফেরার স্থানটুকুও ছিল না —মাত্র পঞ্চাশগজ পদচারনার জায়গাও তাকে দেওয়া হল না।

মেরীর বন্দী হওয়ার খবর পৌঁছেছিল ইতিমধ্যে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের কানেও।

মনে মনে খুশি হলেও আতঙ্কিত হলেন এলিজাবেথ। সে আতঙ্ক সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে।

এলিজাবেথ এই ভেবে আতঙ্কিত হলেন যে প্রজারা এভাবে শক্তিশালী হয়ে শাসকের বিরুদ্ধে সুগঠিত হলে সে বিপদ ইংলণ্ডেও কালো ছায়া বিস্তার করতে পারে। এলিজাবেথ যথাসাধ্য তাঁর প্রভাব বিস্তার করে মেরীকে সাহায্য করতে চেষ্টা চালালেন—কিন্তু সবই বৃথা। বিদ্রোহীরা কোন ভাবেই নরম হলো না।

গোপন সভা বসল বিদ্রোহী সভার লর্ডদের। একদল প্রস্তাব রাখলেন মেরীকে তার প্রাক্তন স্বামী ডার্নলের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে তাকে প্রাণ দণ্ড দেওয়া হোক।

কিন্তু অন্যদল কিছু নরম মনোভাবই গ্রহণ করলেন। তারা বললেন, 'না, প্রাণদণ্ড দেওয়া ঠিক হবে না।' তারা ঠিক করলেন মেরীকে তার নাবালক পুত্রের অনুকূলে মুকুট ত্যাগ করতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে তার নাবালকত্ব চলার সময় আর্ল অব মোরেকে করতে হবে তার অভিভাবক রিজেণ্ট।

ঐ উদ্দেশ্যে এক দলিল তৈরী করা হল। সেই দলিল এবার পাঠানো হলো লকলেভেন দুর্গে রাণী মেরীর কাছে তার সই আদায়ের জন্যে। এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিদ্রোহী লর্ডদের মধ্যে সবচেয়ে নির্মম আর পাশবিক লর্ড লিণ্ডসে। লর্ড লিণ্ডসে রওয়ানা হলেন মেরীর সই আদায় করার জন্যে।

মেরীর জীবনে অবমাননার শেষ স্পর্শটুকুই বোধ হয় বাকি ছিল। শয়তান লর্ড লিণ্ডসে নিদারুণ নির্মমতায় মেরীর সামনে মেলে ধরলেন সেই দলিল, 'সই কর।'

মেরী ইতস্ততঃ করতে চাইলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর লিণ্ডসে সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতের লোহার দাস্তানা দিয়ে চেপে ধরলেন অসহায় মেরীর হাত। 'এই মুহূর্তে সই কর, নচেৎ···!' ক্রুর হাসি ফুটে উঠল লিণ্ডসের চোখে।

লাঞ্ছিত, অসহায়, মেরী সই দিতে বাধ্য হলেন।

ইতিহাসের পট পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল এবার। কিন্তু মেরীর এই করুণ পরিণতির আর দুঃখময় বেদনাদীর্ণ সময়ে একজনের দিকে তিনি সহানুভূতি আর সাহায্যের জন্যে তাকাতে পারতেন—সে হল তার ভাই মোরে। হয়তো মেরী আজ অপরাধিনী—আর তার সেই অপরাধের প্রথম কথা হল প্রেম, গভীর প্রেম—তবু মেরী তার ভাইয়ের ভালবাসা, ক্ষমা আর সাহায্যের দাবী অনায়াসেই করতে পারেন। ভাইকে তার না দেবার কিছু ছিল না—দু'হাত ভরেই তিনি তাকে উপঢৌকেন আর অনেক কিছু দিয়েছিলেন, আর বহুবার করেছিলেন ক্ষমা।

কিন্তু মোরে প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী—আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা রক্তের সম্বন্ধ গ্রাহ্য করতে চায় না, চায় না কৃতজ্ঞতা বোধকে প্রশ্রয় দিতে। মোরেও তাই সেই ভালবাসার সম্পর্ক আর কৃতজ্ঞতা বোধকে পদদলিত করলেন যখন তিনি লকলেভেন দুর্গে বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সে সাক্ষাৎ মেরীর মনে কোন আনন্দ মুর্চ্ছনা বয়ে আনল না—বরং বয়ে আনল গভীর বিষাদের ছায়া।

মোরে দুর্গে প্রবেশ করে কদর্য ভাষায় মেরীকে আক্রমণ করলেন। তিনি মেরীকে তার সমস্ত কৃতকর্মের জন্যে তীব্র ভাষায় দায়ী করতে চাইলেন। অসহায় মেরী দুঃখে শোকে হতাশায় কান্নায় শুধু ভেঙে পড়লেন। ভাইয়ের কৃতঘ্নতা তার হৃদয় চূর্ণ করে দিল।

মোরে হাত মেলালেন বিদ্রোহী লর্ডদের সঙ্গে। তিনি অতি আগ্রহের সঙ্গে নাবালক রাজপুত্রের অভিভাবক রিজেন্টের কাজ গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন আর তার বোনের সঙ্গে হৃদয় আর রক্তের সমস্ত সম্পর্ক সেচ্ছায় ছিঁড়ে ফেললেন। মোরে হয়ে উঠলেন শাসক গোষ্ঠিরই একজন। সেই গোষ্ঠির পরিচিতি হল 'রাজন্যবর্গের লর্ডেরা'। আর অন্য কিছু অভিজাত যাঁদের হৃদয়ে মেরীর জন্যে তখনও কিছু অনুকম্পা বোধ অবশিষ্ট ছিল—তারা বলতে চাইল, 'বথওয়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন মেরীকে মুক্তি দেওয়াই উচিত।' এঁদের পরিচিতি হল 'রাণীর দল' বলেই।

লকলেভেন দুর্গে মেরীর কারাবাসের দুঃখময় দিনগুলি যেন বেদনায় মূর্ত হয়ে উঠতে চাইল। এটা হয়ে উঠল দুর্গের অধ্যক্ষ লেয়ার্ড অব লকলেভেনের নিষ্ঠুর, নির্মম আচরণে। যাঁর নাম, স্যর উইলিয়াম ডগলাস।

কিন্তু অন্ধকারের নিচেই ফুটে ওঠে আলো। অধ্যক্ষের ছোটভাই জর্জ, মেরীর দুঃখময় দিনগুলিতে হয়ে উঠল একমাত্র আশার আলো। মেরীর দুর্দশা আর হয়তো রূপ লাবণ্যের আকর্ষণ রিজেন্টের স্বার্থ আর নিজের আপনার জনকেও সে ভুলতে চাইলো।

জর্জ গোপনে একটা পরিকল্পনা তৈরী করলো দুর্গ থেকে মেরীকে মুক্তি দান করে তার পালানোর ব্যবস্থা করে।

কিন্তু ভাগ্য সহায় না থাকলে কিছুই করার থাকে না। আচমকাই একদিন জর্জের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে গেল অন্যান্যদের সামনে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে জর্জকে দ্বীপ থেকে নির্বাসন দেওয়া হল।

কিন্তু হাল ছাড়েনি তরুণ জর্জ। মেরীর প্রতি তার অনুরক্ত প্রেমই তাকে মেরীর মুক্তির ষড়যন্ত্রে আবার নিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলো। ছোট্ট ডগলাস নামে এক আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছিল জর্জ। পনেরো বছরের ছোট্ট ডগলাস দুর্গেই ছিল। জর্জের হয়ে মেরীর মুক্তির পরিকল্পনা করে চলল সে।

১৫৬৮ সালের ২রা মে তারিখে ছোট্ট ডগলাস সবাই যখন আহারে ব্যস্ত সেই মুহূর্তে দুর্গের চাবি চুরি করতে সক্ষম হল।

দিনটি ছিল রবিবার।

ছোট্ট ডগলাস সত্যিই করল অসাধ্য সাধন। দুর্গের সকলে বিশ্রামে রত হতেই ডগলাস মেরী আর তার পরিচারিকাকে গোপনে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল। তারপর দুর্গের প্রধান তোরণে তালা বন্ধ করে দিল—যাতে কেউ ওদের অনুসরণ না করতে পারে।

দুর্গের বাইরে হ্রদের বুকে ডগলাস লুকিয়ে রেখেছিল ছোট্ট একখানা

নৌকো। মেরী আর তার সেই পরিচারিকা তাতে উঠতেই ডগলাস তাদের তীরে পৌঁছে দিল। ইতিমধ্যে দুর্গের চাবির তোড়া ডগলাস হ্রদের বুকেই ছুঁড়ে ফেলে দিল।

উত্তেজনাপূর্ণ এই বিচিত্র অভিযান এসে গেল এবার অন্তিম লগ্নে। প্রায় তীরে পৌঁছনোর পূর্ব মুহূর্তেই ছোট্ট ডগলাস দুর্গের এক বিশেষ জানালা লক্ষ্য করে জানালো এক আলোক সংকেত হ্রদের অপর প্রান্তে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই—নিজেদের দলের কাউকে জানানো 'সব নিরাপদ !'

এর আগে জর্জ অন্য জায়গাতেও পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে রেখেছিল !

ঠিক এই কারণেই সাহায্য করার জন্যে হ্রদের তীরে হাজির ছিলেন সসৈন্যে লর্ড সিটন আর লর্ড হ্যামিলটন—যাঁরা দুজনেই মেরীর অনুগত।

কৃতজ্ঞ চিত্তে আশায় বুক বেঁধে মেরী নেমে দাঁড়ালেন ছোট্ট সেই নৌকো থেকে অনুগত লর্ড সিটন তার হ্যামিলটনকে মেরী তার কৃতজ্ঞতা জানালেন। আর দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন ছোট্ট ডগলাসকে—যার চরম সাহসিকতাই মেরীকে আবার মুক্তির স্বাদ এনে দেয়।

মেরী এবার সদলে রওয়ানা হলেন পশ্চিম লোথিয়ানের নিড্রে দুর্গে। পরের দিনেই তিনি রওয়ানা হলেন হ্যামিলটনের দিকে।

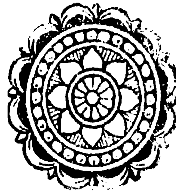
মেরীর মুক্তির সংবাদ বিদ্যুতের মতই ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশের সব অঞ্চলে আর সেই সংবাদ বয়ে আনল এক অনাস্বাদিত স্বাদ। 'রাণী মুক্ত' আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে এই বাণী। দারুণ এক আগ্রহ জাগলো চারদিকে।

জনসাধারণের মনে আবার জেগে উঠল মেরীর নম্রতা, সৌন্দর্য আর অনুকম্পার দৃষ্টান্তের ছবি—তাদের স্মৃতিতে জেগে উঠল রাণীর চরম লাঞ্ছনা আর দুর্দাশার করুণ দৃশ্য। মনে মনে তারা দেখতে পেল তার ভুলের দৃষ্টান্তগুলোও—কিন্তু মেরীর চরম শাস্তির কথাও পাশাপাশি মনে

রাখলো তারা। তাদের চোখে ভেসে ওঠে নির্জন প্রকোষ্টে মেরী বন্দীত্বের দৃশ্য।

পরের শনিবারের মধ্যেই মেরীর পাশে এসে দাঁড়ালেন নয়জন আর্ল, নজন বিশপ। আঠারোজন লর্ড আর বহু অভিজাত মানুষ। তারা মনে প্রাণে চাইলেন রাণীকে রক্ষা করে আবার তাকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ায় ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এ সত্ত্বেও বিধাতাপুরুষ বুঝি আড়ালে মুখ ফিরিয়ে হেসেছিলেন। কারণ এ সবই ছিল সাময়িক মাত্র।



রাণীর উদ্দেশ্য এবার অন্য রকমই স্থির ছিল। রাণী ভেবেছিলেন ডাম্বারটনের দুর্ভেদ্য নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্রয়ই তার উপযুক্ত। আর এরপর তাঁর একান্ত অনুগত আর্ল অব আরগাইল সসৈন্যে শত্রু বাহিনীকে আচমকা আক্রমণে চূর্ণ করে ফেলবেন।

প্রথমেই আক্রমণ করতে হবে রিজেণ্ট মোরের বাহিনীকে। রিজেণ্ট মোরে অনেক নিচুদরের এক বাহিনীর সঙ্গে তখন অবস্থান করছিলেন গ্লাসগোয়।

১৫৬৮ সালের ১৩ই মে। মোরে এসে পৌঁছলেন ল্যাঙসাইড গ্রামে। গ্রামের চারদিকেই তার সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু রাণীর বাহিনীও প্রায় কাছেই অবস্থান করছে সংবাদ পেলেন মোরে। মেরীর অনুগত হ্যামিলটন আর অন্যান্য কয়েকজন লর্ডের বাহিনী বীরবিক্রমে আক্রমণ করল মোরের সেনাবাহিনীকে। 'যে ভাবে যেমন করেই হোক মোরের সেনাদলকে চূর্ণ করতেই হবে,' মেরী বলে পাঠালেন।

শৌর্যের সঙ্গেই লড়াই করে চললো মেরীর সেনাবাহিনী। জীবনপন

এই লড়াইয়ে প্রতিটি সৈনিকই সামিল হতে চাইলো। প্রায় মুখোমুখি হাতাহাতি সংগ্রাম—বর্শার ফলক আলোয় ঝলসে উঠতে চাইলো ক্ষণে ক্ষণে। প্রতিটি সৈনিকের কাছে এ লড়াই হয়ে উঠলো তার বাঁচার লড়াই। শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু!

কিন্তু মোরের সেনাধ্যক্ষ মর্টনও কৌশলে কম যান না। আচমকা তাঁর বাহিনী পিছন থেকে আক্রমণ করে বসল হ্যামিলটনের সেনাদলকে।

ওই আচমকা আক্রমণেই যুদ্ধের ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে গেল। প্রচণ্ড আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মেরীর সুশিক্ষিত বাহিনী।

কুইন মেরী সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করলেন ক্রুকণ্টেন নামের এক দুর্গের অলিন্দ থেকে। সেখানেই তিনি নিয়েছিলেন তাঁর সাময়িক আশ্রয়।

দু'চোখে তাঁর ফুটে উঠল ভবিষ্যতের এক বেদনাদীর্ণ আলেখ্য। ভয়ঙ্কর এই পরাজয়ের দৃশ্য তিনি দেখলেন যে স্থান থেকে, সেটি ছিল পেইসলের চার মাইল দূরে।

মেরীর স্মৃতিতে জেগে উঠল অতীতের কিছু আনন্দময় দৃশ্য।

এখানেই, ঠিক এখানেই তার দ্বিতীয় স্বামী ডার্নলের সঙ্গে কিছু সুখময় দিন কাটিয়েছিলেন! আজ এই ক্ষণে জেগে উঠল তার বেদনাদীর্ন ছবি!

আর ঠিক সেই জায়গাতেই আজ মেরী প্রত্যক্ষ করলেন তার শেষ প্রচেষ্টার এক করুণ পরিনতির ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

পরাজয়। 'আর কোন আশা নেই,' বিষাদে ভেঙে পড়লেন মেরী।

'এখন পালানো ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই,' একান্তে আক্ষেপ করলেন স্কটল্যাণ্ডেশ্বরী মেরী।

একান্তে তার সহায় একমাত্র লর্ড হেরিস আর মাত্র কয়েকজন অতি বিশ্বস্ত অনুগত অনুচর। শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই ঘোড়ার পিঠে গোপনে দুর্গ ত্যাগ করলেন মেরী আবার অজানার পথে।

দীর্ঘ ষাট মাইল পথ অতিক্রম করলেন মেরী। এবার এসে পৌঁছলেন ক্লান্ত শরীরে গ্যালোওয়ের এক গির্জার সামনে, যার নাম ডানড্রেনানের উপাসনা মন্দির।

অবসন্ন, ক্লান্ত শরীরে এবার পিছনে একবার দৃষ্টি মেলে ধরলেন মেরী।

'কি দিয়েছে আমাকে স্কটল্যাণ্ড? এখানে সামান্য একটু আশ্রয়ও আজ আমার নেই,' স্বগতোক্তি করলেন মেরী।

মেরীর সামনে মাত্র দুটি সম্ভাবনাই উন্মুক্ত ছিল ওই বিষাদময় মুহূর্তে —'ফ্রান্স না ইংল্যাণ্ডে, কোথায় তিনি পালাবেন?'

ফ্রান্সে প্রবেশ করলে অবশ্যই সম্বর্ধনার কোন অভাব হতো না— ফরাসী জনসাধারণ তাকে সাদরে বরণ করে নিতো সন্দেহ ছিল না। নিরাপত্তারও কোন অভাব থাকার কথা ছিলো না।

কিন্তু ইংল্যাণ্ড? ইংল্যাণ্ড তো আরও কাছের দেশ।

মেরীর মনে খেলে গেলো, 'ইংলণ্ডও আমার কাছে ভালো আশ্রয়। এও তো নিরাপদ।'

ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ আর তাঁর নিজের মধ্যে যে মতবিরোধ আর রেষারেষির রেশ ছিল সেটুকু ভুলে গেলেন মেরী। মনে পড়ল এলিজাবেথের লেখা কিছু প্রশস্তির কথা—স্মৃতিপথে জেগে উঠল সম্পর্কিত সেই বোনের পাঠানো কিছু অভিনন্দন বাণী।

একবারের জন্যেও স্কটল্যাণ্ডের রাণী, ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যে সামান্যতম বিপদের গন্ধ গেলেন না। তার মনে হলো না এতে কোন ঝুঁকি আছে।

মেরী তাই শেষ অবধি দ্বিতীয় ওই পথই বেছে নিলেন। তিনি ঠিক করলেন তার বোন এলিজাবেথের রাজত্বেই আশ্রয় নেবেন।

কিন্তু তার অনুগত, বিশ্বস্ত আর বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন অনুচরেরা একথায় কেঁপে উঠলেন। তারা বারবার অনুরোধ করলেন, 'এ কাজ করবেন না মহারাণী।'

নতজানু হয়ে কয়েকজন অনুচর কাতর আবেদন করলেন, 'মহারাণী, একাজে বিরত হোন। এতে প্রচণ্ড ঝুঁকি। আমরা নতজানু হয়েই প্রার্থনা জানাচ্ছি।'

কিন্তু নিয়তির হাত বড় দীর্ঘ।

মেরী তাদের জানালেন, 'তোমরা বৃথাই ভয় পাচ্ছো। এতে বিপদের কোন কারণই নেই। ইংল্যাণ্ড আমার কাছে ফ্রান্সের মতোই নিরাপদ।'

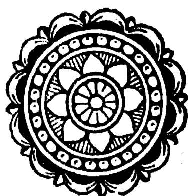
মেরী সকলের তীব্র অনিচ্ছা আর বিরোধিতা অগ্রাহ্য করেই সেই নিয়তিরূপী নৌকায় উঠলেন।

সেই নৌকাই তাকে পৌঁছে দিল এবার স্কটল্যাণ্ডের সীমার বাইরে ইংল্যাণ্ডের সীমানার অভ্যন্তরে। হাতের তীর ছোঁড়া হয়ে গেল।

মেরী এবার তার বিবেচনা অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করলেন এক ইংরেজ ডেপুটি-রক্ষী লোথার নামে এক ভদ্রলোকেরই কাছে।

লোথার এ অঘটনে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এ তিনি আশাই করতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গেই লোথার সংবাদ পাঠালেন রাণী এলিজাবেথকে!

কিন্তু মেরীকে কোন অসম্মান দেখান নি লোথার। মেরীর প্রাপ্য মর্যাদায় তাঁকে সমাদর করেই লোথার আশ্রয় দিলেন কার্লাইল দুর্গে।



মেরীর ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ শান্ত ভাবেই শুনলেন রাণী এলিজাবেথ। একটা বিচিত্র হাসিই তার মুখে গেল। ক্রুর হাসি।

শাসন কার্যের বহু ক্ষেত্রে অসামান্য প্রতিভা আর সুবিচারের প্রমাণ রাখলেও এক্ষেত্রে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ কিন্তু চরম নীচতা আর এক

বিচিত্র মানসিকতারই প্রমাণ রাখলেন। মেরীর প্রতি তার গোপন এক হিংসারই পরিণতি একাজ সন্দেহ ছিল না।

এলিজাবেথের গোপন আদেশে সংবাদ পাওয়া মাত্রই একদল ইংরাজ রক্ষী মেরীকে পাহারা দিতে সুরু করে দিল। নজরবন্দী হলেন মেরী।

এলিজাবেথ সম্ভবতঃ এটাই ভেবেছিলেন মেরীকে সীমান্তের কাছাকাছি থাকার সুবিধা দিলে তিনি হয়তো স্কটল্যাণ্ডের সাহায্য পেতে পারেন। এলিজাবেথ কিছুতেই সেটা হতে দিতে চাইলেন না। এলিজাবেথের হুকুমে হতভাগ্য মেরীকে ইয়র্কসায়ারের দুর্ভেদ্য বোল্টন দুর্গে সরিয়ে নিয়ে কড়া পাহারায় রাখা হল।

কিন্তু এলিজাবেথ এ কাজ করার জন্যে খুঁজছিলেন একটা অজুহাত। এধরনের হীন, নীচ আচরণের একটা কারণ দুনিয়াকে অবশ্যই জানাতে হবে। মনে মনে ক্রুর হাসলেন এলিজাবেথ 'কারণ তৈরী করতে বেশি সময় দরকার হবে না।'

সত্যিই তাই করলেন রাণী এলিজাবেথ।

রাণীর বিশেষ সংবাদ বাহকেরা মেরীকে জানালো তাদের মহারাণী বিশেষ কোন কারণেই রাণী মেরীকে দর্শন দান করতে পারছেন না বা উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনেও সমর্থ হচ্ছেন না।

মেরী স্তব্ধ হয়ে গেলেন ওই নির্দয় ব্যবহারে। আকুল হয়ে তিনি শুধু জানতে চাইলেন, 'কি সে কারণ, আমায় বলুন আপনারা।'

রাণী এলিজাবেথের প্রতিনিধিরা জবাবে জানালো, 'আপনি অপরাধিনী বলেই দুনিয়া জানে। দুনিয়ার চোখে অপনি নির্দোষ প্রমাণিত না হলে আর ওই কলঙ্ক থেকে আপনি মুক্ত না জানলে মহারাণী আপনাকে গ্রহণ করতে অক্ষম।'

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মেরীর, 'আমি এই মুহূর্তেই আমার নির্দোষিতার প্রমাণ হাজির করতে প্রস্তুত ঃ এলিজাবেথ যা চায়।'

কিন্তু মেরী জানতেন না সবটাই এলিজাবেথের এক নোঙরা কৌশল মাত্র।

মেরীর বক্তব্য যথা সময়েই পৌঁছে গেল এলিজাবেথের কাছে। এলিজাবেথ এবার মেরীকে জানালেন তিনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন স্কটল্যাণ্ডের রাণী আর বিরোধী পক্ষের বক্তব্য শুনতে। এক্ষেত্রে তিনি মধ্যস্থতার এক ভূমিকাই নেবেন। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেরী আর তার বিরোধী পক্ষের মধ্যে কলহ যার ফলে তার বহিষ্কার সেটাই তিনি শুনতে চান।

এলিজাবেথ ভাব প্রকাশ করতে চাইলেন যেন সত্যিই তিনি মেরীর জন্যে চিন্তিত।

মেরী বৃথাই প্রমাণ করতে চাইলেন যে এলিজাবেথের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আর তার প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই তিনি একাজ করতে চান। আর চান তার অনুকম্পা লাভ করতে।

কিন্তু তখনও মেরীর আত্মসন্মান বোধ এতোটুকুও ম্লান হয়নি।

মেরী দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালেন, 'আমার বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কখনও ইংল্যাণ্ডের রাণীকে বিচারকের আসনে বসতে দেবো না।'

কিন্তু এলিজাবেথ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে ভাবেই হোক যে সুযোগ তার হাতে এসেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তার উপযুক্ত ব্যবহার তিনি করবেনই।

এলিজাবেথ একান্তে বললেন, 'মেরী যে সুযোগ এনে দিয়েছে স্বইচ্ছায় ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করে, আমি বিচারকের ভূমিকাই পালন করবো।'

মেরীর তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও একক ভাবেই রাণী এলিজাবেথ দুটি বিরোধী পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্যে, আর উভয়পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখার জন্যে কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত করলেন। এলিজাবেথ মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন মেরীকে মুঠোয় পেয়েছেন বলে। তার বহুদিনের মনোবাসনা এবার পূর্ণ।

মেরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করার জন্য স্বয়ং ওই কমিশনারদের সামনে হাজির হলেন যিনি, তিনি আর কেউ নন—রিজেণ্ট মোরে।

১৫৬৮ সালের অক্টোবর মাসে কমিশন বৈঠকে বসলেন। বৈঠক বসল ইয়র্ক শহরের এক প্রাসাদে।

কিন্তু মোরে কি সামান্য অনুশোচনায় ভুগছিলেন?

হয়তো তাই। না হলে মোরেকে অতি প্ররোচনা দিয়েই মেরীর বিরুদ্ধে তার স্বামী হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ আর বিবাহ সংক্রান্ত কলঙ্কের অভিযোগ দাখিল করতে বাধ্য করা হলো কেন?

কিন্তু এলিজাবেথ চুপ করে ছিলেন না। তার ষড়যন্ত্রের হাতও ছিল দীর্ঘ। মেরীর বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য তাই প্রয়োজন ছিল যোগ্য প্রমাণ। শেষ অবধি তাই উপস্থিত করা হল কতকগুলি চিঠি। জানানো হল চিঠিগুলি পাওয়া গেছে বথওয়েলের জনৈক পরিচারকের কাছ থেকে।

বিচিত্র কয়েকখানা চিঠি। চিঠিগুলি আসল হলে অবশ্যই প্রমাণ হয় মেরী অপরাধিনী, তিনি অবশ্যই তাহলে হতভাগ্য তরুণ ডার্নলের হত্যার ষড়যন্ত্রে বথওয়েলের সহযোগী। ডার্নলে তখনও জীবিত ছিল—আর মেরী তাঁর জ্ঞাতসারেই তাহলে স্বামীর হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দিয়েছিলেন।

কিন্তু মেরীর সমর্থনকারীরা তীব্র কণ্ঠে জানালেন 'এ চিঠি জাল, সব মিথ্যা, সাজানো। এ এক বিরাট ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।'

দীর্ঘ পাঁচ মাস ব্যাপী চলল বিচিত্র ওই শুনানী আর অনুসন্ধান। শেষ পর্যন্ত রাণী এলিজাবেথ উভয়পক্ষকে জানিয়ে দিলেন, এক দিকে তিনি আর্ল অব মোরের অভিযোগ অস্বীকার করার কোন কারণ যেমন দেখতে পাচ্ছেন না, আর সেটা অবিশ্বাসও করতে চাইছেন না, ঠিক তেমনই তাঁর মতে স্কটল্যাণ্ডের রাণীর বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগেরও যোগ্য প্রমাণ পাচ্ছেন না।

অতএব, এলিজাবেথ জানালেন, সমস্ত ব্যাপারটাই তিনি পর্যালোচনা করে স্কটল্যাণ্ডবাসীদের হাতেই ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক। এটা অবশ্যই তাদের ঘরোয়া ব্যাপার।

বিচিত্র ব্যবহার ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের !

মেরীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ হয়নি, অতএব নিরপেক্ষ বিচারে স্কটল্যাণ্ডের রাণীর মুক্তি অবশ্যই সুবিচার হিসেবেই গণ্য হতো।

কিন্তু ক্রুর রাণী এলিজাবেথের মতলব ছিল অতি জঘন্য, নীচতা মাখা।

তিনি মেরীকে মুক্তিদান করলেন না। তার ষড়যন্ত্র এবার মোড় নিলো অন্য আর এক পথে।

গোপনে আর্ল অব মোরেকে প্রচুর অর্থ ঋণ দিয়ে এলিজাবেথ তাকে পাঠিয়ে দিলেন স্কটল্যাণ্ডে।

উদ্দেশ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর অন্য, মেরীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।

সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অসহায় মেরীকে নতুন করে বন্দী করে রাখলেন কুখ্যাত টাওয়ার অব লণ্ডনের নির্জন প্রকোষ্ঠে।

একান্তে ঘনিষ্ঠদের কাছে এলিজাবেথ মনের ওই কদর্য ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, 'ওকে মরতে হবে, ওকে বাঁচতে দেবো না।'

হতভাগিনী মেরী। এলিজাবেথের কদর্য ইচ্ছার প্রকাশ তাঁর কাছে অজানা রইলো না আর। মৃত্যুকে বরণ করতেই যেন তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন সেই মুহূর্ত থেকেই।

১৫৬৮ সালের এক বেদনাদীর্ন কুয়াশা মাখা দিনে মেরীর প্রকোষ্ঠের সামনে এসে দাঁড়ালো ভয়ঙ্কর আকৃতির একজন ঘাতক।

নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নির্ভীক চিত্তে মেরী।

'আমি প্রস্তুত।'

টাওয়ার অব লণ্ডনের বধ্যভূমিতে ঘাতকের তরবারীর নিষ্ঠুর আঘাতে নিভে গেল মেরীর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ক্ষণস্থায়ী জীবন।

ইতিহাস শুধু কলঙ্কিত হয়ে রইলো এলিজাবেথের ঘৃণ্য আদেশে।

প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত শুধু করে গেলেন স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরী। বাঁধ ভাঙা প্রেমই নিভিয়ে দিল তার জীবনদীপ।